সংস্কৃতি কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

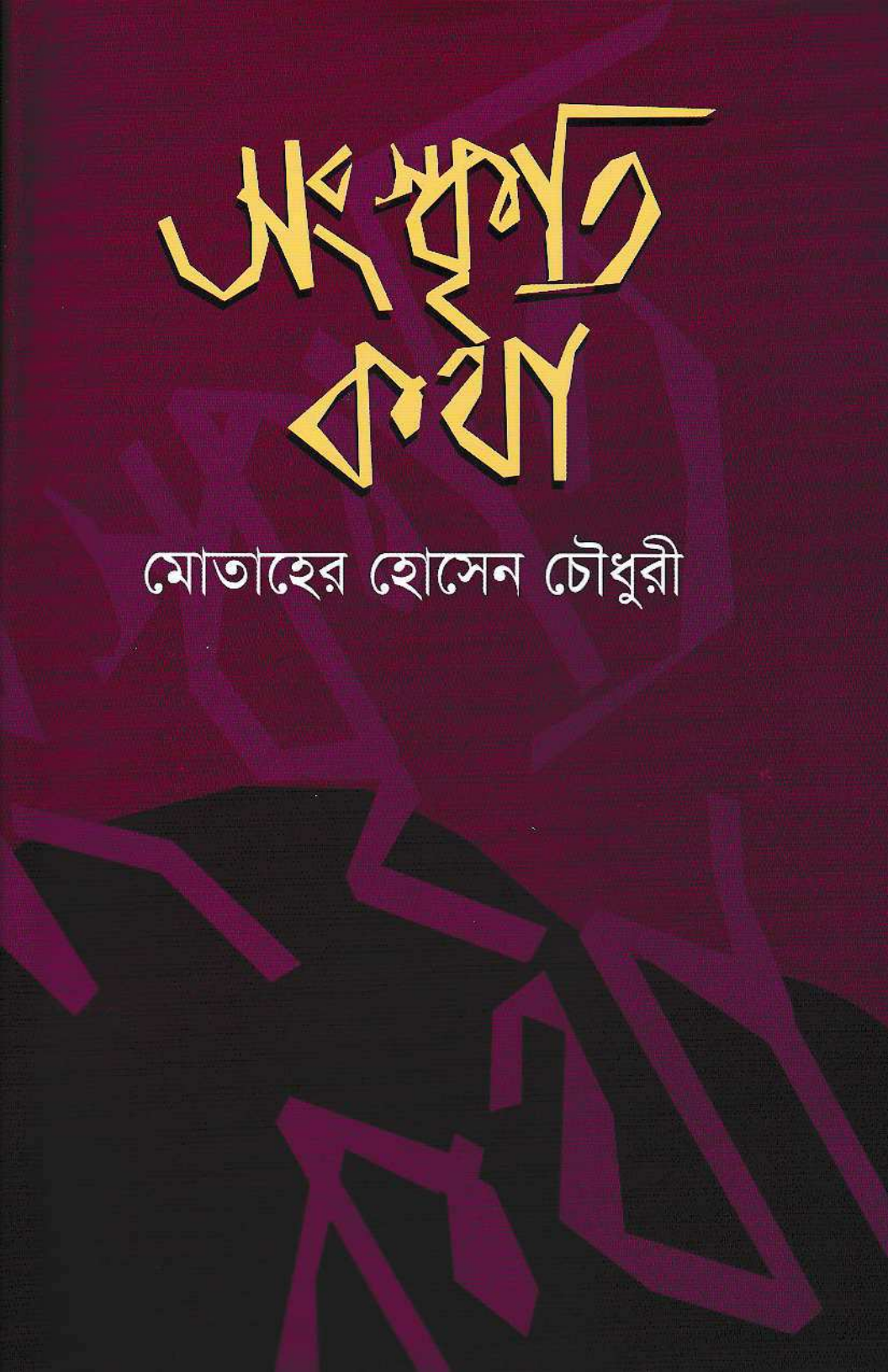

সংস্কৃতি-কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

ভূমিকা
সৈয়দ আবুল মকসুদ

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

চতুর্থ মুদ্রণ : কার্তিক ১৪২২, অক্টোবর ২০১৫
প্রথম মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৫, বইমেলা ২০০৯

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯৪০-১১২৬৭২ মুদ্রক : আবির কম্পিউটার, ০১৭১০-৫৪৬৩০১, মুদ্রণ : নিউ এস. আর প্রিন্টার্স
বিদেশে প্রাপ্তিস্থান, লন্ডনে : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন, আমেরিকায় : বুক ভিউ ভারত : দে'জ পাবলিশিং, নয়া উদ্যোগ (কলকাতা) কানাডায় : এটিএন মেগা স্টোর, ভ্যানফোর্থ এভিনিউ টরেন্টো।
ঘরে বসে বই কিনতে ভিজিট করুন hhttp://rokomari.com/nobojug
অথবা ফোনে : ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
বা বই 24.com, 01763665577 ও www.Porua.com.bd

ISBN-984-8401-51-2

প্রচ্ছদ : সুখেন দাস

সূ চি প ত্র

ভূমিকা	৫
সংস্কৃতি-কথা	১৭
অহমিকা সৌন্দর্য-চেতনা – রবীন্দ্রনাথ	২৯
ব্যর্থতা জিন্দাবাদ	৩৯
মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার	৪৭
রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী	৫৬
মেরুদণ্ড	৬৭
ব্যক্তি ও রাষ্ট্র	৭৪
সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা	৭৯
নবযুগ	৯১
আমাদের দৈন্য	৯৪
মনুষ্যত্ব	১০৪
জীবন ও বৃক্ষ	১১০
স্বাধীনতা ; জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা	১১২
একটি নিবেদন	১১৯
সম্মান ও আত্ম-সম্মান	১২৩
একখানি চিঠি	১৩১
কাজী নজরুল ইসলাম	১৩৫
লাইব্রেরী	১৩৮
বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ	১৪৮
নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস	১৫৩
রবীন্দ্রনাথ	১৫৮
রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা	১৬২
শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ	১৬৯
রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস	১৭৯
বাংলা কাব্যে দুঃখবাদ	১৯২
আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরনাপন্থী	১৯৫
মধ্যশিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা	২০১
প্রাথমিক বাংলা গদ্য ও তাহার স্রষ্টাগণ	২০৫
বর্ষা-পঞ্জী	২১৩

পণ্ডিতেরা সংস্কৃতির বিভিন্নতা নিয়ে বড়াই করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক ও অবিভাজ্য। আগুন জ্বালানো আসল কথা; কোন কাঠে আগুন জ্বললো সেদিকে না তাকালেও চলে। তবু যে আমরা তাকাই তার কারণ অহংপ্রীতি। আমার আনা কাঠে, না অপরের আনা কাঠে আগুন জ্বললো, খামাখা তা ভেবে আমরা সারা হই এবং নিজেকে সঙ্কুচিত করতে থাকি। সঙ্কোচন যে পীড়ন সে কথা ভুলে যাই, বরং তা নিয়েই এক প্রকার গর্ব অনুভব করি। এই সঙ্কোচনের অপর নাম মানসিক ছুঁৎমার্গ আর মানসিক ছুঁৎমার্গ যে মানসিক মৃত্যু এ কথা সহজেই স্বীকার্য।

পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রীতির যোগে যে চিত্তের সমৃদ্ধি তাতেই সংস্কৃতির উৎপত্তি। সুতরাং এখানে সেখানে এক-আধটু রংয়ের পার্থক্য থাকলেও আসল জিনিসটা এক। পরিবেষ্টন : আধার ; প্রেম : তৈল ; চিত্ত : সল্‌তে ; আর সমৃদ্ধি বা সংস্কৃতি : আলোক। অতএব কি নামীয় আধারে আলো জ্বললো, এ নিয়ে যাঁরা তর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের তার্কিক বলা গেলেও প্রেমিক বলা যায় না—আলোর ক্ষুধা বা আলোর প্রীতি তাঁদের জীবনে বড় হয়ে উঠে নি ব'লে।

নামের তারতম্যে আধারের যে বিভিন্নতা, electric light-এর আমদানীতে তা-ও লুপ্ত হতে চলেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ অপ্রতিহত আর বিজ্ঞান যে নির্বিশেষ এ সহজ সত্য। জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ব'লে জীবনের অমৃতময় ফল সংস্কৃতিও নির্বিশেষ বা সাধারণ হতে চলেছে। অতএব তাকে 'স্বাগতম' বলে অভ্যর্থনা করা উচিত।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) জীবদ্দশায় পরিচিত মণ্ডলে এবং সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর কোনো প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল না। দেশের সাহিত্য-সমাজে তাঁর অসামান্য দাপট ছিল না, অনন্যসাধারণ মেধাবীও তিনি ছিলেন না কিন্তু অধিকারী ছিলেন তিনি আকাশের মতো উদার এক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণের। তাঁর মতো নির্মল হৃদয়ের অধিকারী মানুষ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আর একজনও ছিলেন বলে জানা যায় না।

সাহিত্যজীবনের নানা পর্যায়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরী একাধিক নামে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, যেমন–মোতাহের হোসেন বি. এ, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি. এ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী এম. এ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি। শেষ জীবনে শুধু মোতাহের হোসেন চৌধুরীই লিখতেন। চাকরি-বাকরিসংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে তিনি তাঁর পিতৃদত্ত নাম সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখতেন।

মোতাহের হোসেনের মাতামহ মৌলবী আশরাফ উদ্দিন আহমদের বাসভবন ছিল কুমিল্লা শহরের 'দারোগা-বাড়ি'। তাঁর মা ফাতেমা বেগম কাঞ্চনপুর স্বামীর বাড়িতে না থেকে কুমিল্লায় পিতৃগৃহেই থাকতেন। এই 'দারোগা-বাড়ি'তেই ১৯০৩ সালে মোতাহের হোসেনের জন্ম। তাঁর জন্ম-তারিখ এখন পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর নিজের হাতে লেখা পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে আমি উদ্ধার করতে পেয়েছি তাঁর জন্ম-তারিখ : ১ এপ্রিল ১৯০৩।

মোতাহের হোসেন কুমিল্লা শহরের ইউসুফ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ এবং বি. এ পাশ করেন। ১৯২৯ সালে বি. এ পাশ করে তিনি ইউসুফ হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। যৌবনে তাঁর খেলাধূলায় আগ্রহ ছিল। এক সময় গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কুমিল্লা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বহুদিন তিনি সভাপতি ছিলেন।

দীর্ঘ বিরতির পর মোতাহের হোসেন ১৯৪২ সালে বহিরাগত-প্রার্থীরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ পাশ করেন। এম. এ পাশ করে তিনি ইউসুফ হাই স্কুলে যোগ না দিয়ে কিছুদিন ঠিকাদারি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন :

> আমি মিলিটারি কন্ট্রাক্টারের খাতায় নাম লেখানোর দরুন পাদ্রি ওয়াট্‌সন সাহেব যা বলেছিলেন তা এখানে মনে পড়েছে। তিনি বলেছিলেন : কবিত্বের প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কন্ট্রাক্টার, বিশেষ করে মিলিটারি কন্ট্রাক্টার হওয়া অপরাধ, মহা অপরাধ।

নিজের প্রতিভাকে মরতে দেওয়া আর নিজের আত্মাকে মরতে দেওয়া এক কথা। তুমি নিজেকে মরতে দিতে পার, কিন্তু নিজের আত্মাকে মরতে দিতে পার না। যে পেশা গ্রহণ করলে তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সৌন্দর্য-বোধ ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা, তুমি সে-পেশা গ্রহণ করেছ শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি চাই তুমি না খেয়ে মর তথাপি তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখ, কেননা সূক্ষ্ম অনুভূতিরই অপর নাম আত্মা।...

['সংস্কৃতি-কথা' : *সংস্কৃতি-কথা*, পৃ. ১১]

যা হোক, অবিলম্বে তিনি কন্ট্রাক্টারি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে খণ্ডকালীন প্রভাষকের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪৬-এর নভেম্বরে একই কলেজে ভারপ্রাপ্ত প্রভাষক (Officiating Lecturer) পদে নিযুক্ত হন। '৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে একই পদে বদলি হন। সেকালে ওই পদটি ছিল নন-গেজেটেড। চাকরি-জীবনে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ক্ষমাহীন অবহেলা। অনেক দেনদরবার করে তিনি লেকচারার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আর কোনো পদোন্নতি ঘটেনি তাঁর জীবনে। তবে ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কারণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসা সম্ভব হয়নি। তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের অভিমত, তিনি ছিলেন একজন অসামান্য শিক্ষক।

যে-সাহিত্যিকগোষ্ঠীর একজন সদস্য ছিলেন মোতাহের হোসেন সেটির অন্যতম নেতা ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। যৌবনেই প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত সাহিত্য-সংগঠন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর সংস্পর্শে আসেন তিনি। রুচির ব্যাপারে মোতাহের হোসেন ছিলেন অধিকতর সূক্ষ্ম, কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের সাজুয্য ছিল। মোতাহের হোসেনের মৃত্যুর পর কাজী আবদুল ওদুদ 'মোতাহের হোসেন চৌধুরী' শীর্ষক এক লেখায় বলেন :

পূর্ববঙ্গে তিনি সুপরিচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি তেমন পরিচিত নন। ১৩৬১ সালের 'সংকল্পে' তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, বিশেষ করে উক্ত পত্রের শেষ দুই সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর সংস্কৃতি-কথা আর অহমিকা-সৌন্দর্যচেতনা-রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক ও পাঠক-সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি যে ঘটেনি তা যথার্থ। কিন্তু বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন সত্যকার সাহিত্যিক। একালের বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হবে – এই আশা আমরা পোষণ করি। কুমিল্লা শহরের বিখ্যাত দারোগাবাড়িতে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। সেটি ছিল তাঁর মাতুলালয়। তাঁর পিতৃপুরুষের নিবাস-ভূমি ছিল নোয়াখালি। নব-যৌবনেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বভাবত ছিলেন কবিপ্রাণ। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিপত্তি লাভ হয় প্রাবন্ধিকরূপেই।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ঢাকা শহরের রমনা অঞ্চলে দেখা দেয় সুবিখ্যাত মুসলিম সাহিত্য-সমাজ তার বুদ্ধির মুক্তি আদর্শ নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানটি একালের বাংলার মুসলমানদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, কেননা, এটি সেদিনেই যে বহু শিক্ষিত মুসলমানের উপরে উদার মানবিক প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই নয়, নানা ঘটনার

ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একালের পূর্ববঙ্গও দেখা যাচ্ছে এর সমর্থিত উদার মানবিকতার দিকেই পা বাড়িয়েছে। আর তাই স্বাভাবিক। ইসলাম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল দুঃস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকারদাতা রূপে। দার্শনিক-দল আর সুফী সাধক-দল উদার মানবিক সাধনার জন্যই জগতে সমাদৃত হয়েছিলেন। তাই মুসলমান আবার যদি জাগতে চায় তবে উদার মানবিক রূপেই সে যে জাগবে এই প্রত্যাশিত। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রায় বারো বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এর দশম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। এর বহু বার্ষিক অধিবেশনেই মোতাহের হোসেন যোগদান করেছিলেন আর সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠক করে উদার মানবিক গৌরব বাড়িয়েছিলেন।

সাহিত্য সাধনায় অমনোযোগী তিনি কখনো হননি। তবু তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি নয়। এর একটি কারণ চিন্তায় ও রচনায় শিথিলতার প্রশ্রয় তিনি দিতে চাইতেন না। কিন্তু হয়ত তার চাইতেও বড় কারণ–যে সমাজে তাঁর জন্ম হয়েছিল উদার মানবিক চিন্তাধারার প্রতি সে সমাজের সুস্পষ্ট বিতৃষ্ণা। তিনি বিশেষ ভদ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, অপ্রিয় বাদবিতণ্ডা যথাসম্ভব এড়াতেই তিনি চাইতেন।

কিন্তু পরিমাণে অল্প হলেও তাঁর রচনা যে বিশিষ্ট হয়েছে এতেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা সার্থক হয়েছে। সাধারণত সব দেশেরই প্রচলিত সাহিত্যে শিথিল চিন্তা, ভাববিলাসিতা, এসবের স্থান অনেকখানি। কিন্তু, সত্যকার সাহিত্য এসব থেকে ভিন্ন ধরনের বস্তু, কেননা, অকৃত্রিম দুঃখ-বেদনা ও আনন্দ-বোধ থেকেই তার উদ্ভব, ভাববিলাসিতা থেকে নয়। মোতাহের হোসেনের রচনা সত্যকার সাহিত্যিক মর্যাদালাভ করেছে। যে সমাজে ও কালে তাঁর জন্ম তার অসম্পূর্ণতা অযৌক্তিকতা আর বিকৃতি সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ চেতনার স্বাক্ষর তাতে রয়েছে।

[*জাগরণ*, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৫৬]

চট্টগ্রামের সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলমের সঙ্গে মোতাহের হোসেনের পরিচয় হয় অনেকখানি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর সূত্রেই। পরে তাঁরা দু'জন ছিলেন একই শহরের অধিবাসী। এ প্রসঙ্গে 'মোতাহের হোসেন সম্পর্কে' শীর্ষক এক লেখায় তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন এ ভাবে :

> সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী একটা নাম হয়েই আমার নিকট ছিলেন। ঢাকার 'শিখা' 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একটা সংস্থা গড়ে তুলেছিল। ওর নায়ক ছিলেন দুই অধ্যাপক – কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন। ১৯২৯ সালে আমার কনিষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত দিদারুল আলম কয়েক দিনের জন্য ঢাকা যায়। এই সুযোগে সে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করে এবং 'শিখা' গ্রুপের অনেকের সহিত তার আলাপ-পরিচয় হয়। সম্ভবত দিদারের মুখেই আমি সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্বন্ধে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি আমাদের চিন্তারাজ্যের একজন অগ্রনায়ক। তার কবিত্ব খ্যাতিও তখন সুপ্রতিষ্ঠিত।
>
> আমার জীবনে এরূপ ঘটেছে যে অপরিচিত যিনি আমার চিন্তায় আমার মনের কাছাকাছি এসে পড়েছেন হঠাৎ একদিন আমি একান্ত অত্যাশিকভাবে তাঁর একখানি পত্র পেয়ে গেছি এবং ওতেই হয়েছে পরিচয়ের সূত্রপাত। এই পরিচয় ক্রমেই প্রসার লাভ করেছে।
>
> ... ...
>
> দ্বিতীয় ঘটে কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে। হঠাৎ তিনি আমাকে এক পত্র লিখেন

এবং পত্রালাপের মাধ্যমে তিনি আমাকে ঢাকায় যেতে আমন্ত্রণ জানান। আমি ১৯৩৭ এর ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকায় গিয়ে দু'দিন তার সঙ্গে থাকি। ক্রমে আমরা পরস্পরের 'বন্ধুবর' হয়ে উঠি। এখনও তাই চলছে।

ঢাকার দেখাতে কাজী আবদুল ওদুদ বিশেষ করে দুজনের কথা বলেছিলেন। একজন খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন। তবে বলেছিলেন : উনি বিশেষ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। অপর জন সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তাঁর সম্বন্ধে – তাঁর মনন-শক্তি সম্বন্ধে – কাজী সাহেব বিশেষ আশা প্রকাশ করেছিলেন।

মোতাহের হোসেন এবং আবুল ফজল একই সাহিত্যচক্রের সদস্য ছিলেন তাই নয় তাঁরা একই চাকরিতে এবং একই শহরে বসবাস করেন বহু বছর। পরস্পরকে তাঁরা জানতেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে। উভয়েই ছিলেন যুক্তিবাদী। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর সঙ্গে তাঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 'মোতাহের হোসেন চৌধুরী স্মরণে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন :

মোতাহেরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ত্রিশ বছর আগে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' এক বার্ষিক অধিবেশনে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোতাহের কুমিল্লা থেকে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। বলেছি, মোতাহের যুক্তিবাদী ছিলেন; ইংরেজিতে যাকে Rationalism বলে, তিনি ছিলেন তার ভক্ত ও অনুসারী। তখনকার দিনে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' বুদ্ধির মুক্তি তথা যুক্তিবাদ প্রচারে অগ্রণী হন। তাই সহজেই সাহিত্য-সমাজের কর্মীদের সাথে মোতাহেরের একটা আত্মিকসংযোগ স্থাপিত হয়। 'সাহিত্য-সমাজ' উঠে গেছে বহুকাল, কিন্তু এই যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। কালক্রমে এই যোগাযোগ আরো অনেকের মতো আমার সঙ্গেও গভীর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরেও এই সৌহার্দ্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি, তাতে আঁচড় লাগেনি এতটুকু।

দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আমি সহকর্মী হিসেবে পাই। কাজেই একেবারে নিকট থেকে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে দেখবার, জানবার ও বুঝবার সুযোগ আমার হয়েছে। হৃদয়ের ঔদার্যে, চরিত্র মাধুর্যে ও বন্ধুবাৎসল্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। জীবন-বোধ ও রুচিজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর জীবন। রসগ্রহণে ও মূল্যবিচারে তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখেছি অসাধারণ। অসাধারণ জীবনবোধ ও মার্জিত রুচি তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় সহজেই লক্ষ্যগোচর। তাঁকে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের যে দিকটি সমৃদ্ধ হতে পারত, এতদিন যে-স্থান তিনি পূর্ণ করছিলেন, সেই শূন্যস্থান পূরণ করার দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের নেই। মননসাহিত্য বলতে যা বুঝায়, একমাত্র মোতাহের হোসেনই আমাদের মধ্যে তার চর্চা করতেন।...

[*মাহেনও*, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩]

সাহিত্যসাধক ও ব্যক্তি-মোতাহের হোসেন সম্পর্কেও আবুল ফজলের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিবেচনায় :

এ কথা সত্য, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী আমাদের সাহিত্যাকাশের চন্দ্র-সূর্য ছিলেন না। চন্দ্র-সূর্য আজ আছেই বা কোথায়? আমাদের সাহিত্যে এখনও নক্ষত্রের যুগ। সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর এক পাশে, নীরবে, অনেকখানি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে এই ক্ষুদ্র অথচ

উজ্জ্বল নক্ষত্রটি এক স্নিগ্ধ আলো বিকীরণ করছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। যাঁরা তাঁকে জানতেন, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা এই আলোর সন্ধান রাখতেন এবং এর মূল্য তাঁরা ভালোভাবেই বুঝতেন। তিনি ছিলেন অনেকখানি কস্তুরী-মৃগের মতো, আপনার সৌরভে আপনি ছিলেন মুগ্ধ। তাই প্রচারের মোহ তাঁর মধ্যে কোনোদিন দেখা যায়নি। এই সৌরভের স্বাদও একমাত্র আত্মীয় বান্ধব ও অন্তরঙ্গজনেরাই পেতেন। আজকের দিনে মন ও চরিত্রের এই সৌরভ ও মাধুর্য যে কত দুর্লভ, তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজিতে যাকে 'লিবারেল' বলে, তিনি ছিলেন তাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন আজ লিবারেলের কোনো স্থান নেই, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আজ লিবারেলরা হৃতশক্তি ও হতমান। নিজের চোখের সামনে মোতাহের হোসেন এই ওলট-পালট, সাহিত্য-শিল্পের মূল্য বিচারের মানদণ্ডে এই দ্রুত ওঠা-নামা দেখেছেন। কিন্তু সত্যিকার লিবারেলের মতো তিনি এক দিনের তরেও একে ধিক্কার দেননি, হননি এর প্রতি অসহিষ্ণু অথচ মুহূর্তের জন্যও নিজে যুক্তিবাদী লিবারেল জীবনদর্শন ত্যাগ করেননি আশু জনপ্রিয়তা বা হাততালির মোহে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর রচনার শিল্প-সৌন্দর্য ও মানসপ্রসার, কাজী আবদুল ওদুদের যুক্তিবাদ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ক্লাইভ বেল প্রমুখ ইংরেজ লেখকদের সংস্কৃতিবোধ ও মানবিকতার তিনি অনুরক্ত, ভক্ত ও রসগ্রাহী ছিলেন। এঁদের রচনা তাঁর বিশেষ প্রিয় ও উপভোগের বস্তু ছিলো। এঁদের রচনার উদার পরিবেশেই তাঁর মন ও চরিত্র গ'ড়ে উঠেছিল বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁর নিজের রচনাও এই পরিবেশেরই সাক্ষাৎ ফল।

আমরা যারা শিক্ষকতা করি, তাদের পক্ষে মনমেজাজ শান্ত ও সুস্থ রাখা একরকম অসম্ভব বল্লেই চলে। রোজ এত বিচিত্র মানবের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, মোকাবেলা করতে হয় মানব চরিত্রের হরেক রকম বিরুদ্ধতা ও জটিলতার সঙ্গে। তদুপরি দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠানগত অব্যবস্থার জন্য শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে একরকম শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মতো। এই অবস্থা ও পরিবেশে কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের মন-মেজাজ তিরিক্ষে ক'রে ছাড়ে। ক্রমে ক্রমে এই তিরিক্ষে মেজাজ অনেকের প্রায় স্বভাবগত হয়ে পড়ে। আশ্চর্য, কি এক অদ্ভুত ক্ষমতা বলে মোতাহের হোসেন এই অনিবার্য পরিণাম থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কথা ও ব্যবহারে রুক্ষতা ও কঠোরতা ছিল না, তাঁকে কোনোদিন ধৈর্য হারাতে দেখা যায়নি। তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারের বিনম্র মাধুর্য ও আলাপ-আলোচনায় সরস পরিহাস-প্রিয়তা শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গেও এই ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনোদিন। এই স্বভাব-মাধুর্যের ফলে তিনি হতে পেরেছিলেন অজাত-শত্রু। আজকের দিনে এ-ও এক অসাধ্য সাধন ও নেহাৎ ভাগ্যের কথা। আমার বিশ্বাস, যে-লিবারেল ভাবধারার তিনি উত্তরাধিকারী, নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী এবং পরিশীলনকারী ছিলেন এ-ও তারই প্রতিদান।

মোতাহের হোসেন সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর বৃহৎ আয়ত চক্ষু দু'টির প্রসন্ন উজ্জ্বলতা আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের অকৃপণ মাধুর্য তাঁর চেহারা ও চোখ দু'টিতে প্রতিফলিত হ'ত। এ কারণে তাঁকে একবার দেখলেও ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। Liberalism-এর চর্চা ও তার ভাবাদর্শ তাঁর জীবনকে সুসংহত, মধুর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে, পরিমিত পরিধিতে আমাদের এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র মোতাহের হোসেনই ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ...তাঁকে যতো নিকট থেকে দেখা যেতো এবং যতো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা ঘটতো ততোই তাঁর মনের প্রসার, চরিত্রের অসাধারণত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বেশি করে ফুটে উঠতো।...'

[*মাহেনও*, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩]

কুমিল্লা শহরের অধিবাসী জগন্নাথ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ মোতাহের হোসেনকে জানতেন ঘনিষ্ঠভাবে। চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে ছিল সমধর্মিতা : উভয়েই ছিলেন প্রগতিশীল। তিনি 'মোতাহের-স্মৃতি' শীর্ষক এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

"ইস্, আপনি যে বড়ো কোঁচানো ধুতি পরে এসেছেন, আপনি তো তা হলে আর প্রগতিশীল হতে পারলেন না," কথাটা বলে মৃদু মৃদু হাসছিলেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। রমজানের শেষে ঈদের দিনে কুমিল্লায় ওঁর ঘরে বসে আনারস-দিয়ে-রান্না-করা মুরগির ঝোল খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। বাইরে সফেদা গাছটার ঘন পাতার আড়ালে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দু'জন। আপন মনের আনন্দেই আবার বলতে লাগলেন, "লেফট্ রাইট্ করতে পারলেন না কোনদিন, ছকে পড়তে পারলেন না, আপনার আর উন্নতির আশা নেই, আর উন্নতি যদি হয়ও প্রগতি নৈব নৈব চ।"

আমি জানতাম এ সব কথার জবাবের কোনো প্রয়োজন নেই। এ শুধু ওঁর তীব্র স্বাতন্ত্র্যবাদী-রুচিবৈচিত্র্যে-শ্রদ্ধাবান মনের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি। এই মনের পরিচয়ই পেয়ে এসেছি ওঁর জীবনের প্রতিটি কথায় ও কাজে।

.....শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন বিষয়-চেতনা, স্থানকাল-চেতনা বিকাশ লাভ করছে, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে, সমাজের ভারসাম্য যখন আর স্থির ও অব্যাহত থাকছে না তখন এই বাঁকের মুখে একটি আলো তুলে ধরা দরকার – যে আলো পথ ভোলাবার আলো নয়, পথ দেখাবার দীপ্ত দীপশিখা। যে জীবনের তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ রূপকার, তার রূপান্তরের ধারা তিনি মানসচক্ষে দেখেছিলেন, আর পরিণতিতে কি হতে পারে তা কল্পনা করবার দুঃসাহসও তাঁর ছিল। তার শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত মন, তাঁর সর্বগোঁড়ামিবর্জিত যুক্তিবাদ, বিচিত্রপথগামী হৃদয়ানুভূতি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ আজকের জীবন-পরিবেশে দুর্মর শক্তিরূপে কাজ করবে।

সর্বত্র নিজের হৃদয়কে প্রসারিত করে দিয়ে, পৃথিবীর প্রতিটি সৌন্দর্যের উৎসমূলে আকণ্ঠ পান করে তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন। সংস্কৃতিবান লোক আপন আত্মিক নির্জনতায় নিঃসঙ্গ। বাইরের এই জগতের স্থূলতায় নয়, আপন ধ্যান-কল্পনায় যে সৌন্দর্যলোক, যে রূপজগৎ তিনি সৃষ্টি করেন – তিনি সেই জগতেরই অধিবাসী, এই জন্যে মোতাহের হোসেন বলতেন – রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ। আচারধর্ম তাঁদের জন্যে নয়। ধর্মসংস্কার বা ধর্মীয় আচার সাধারণ মানুষের জন্যে প্রতিদিনের জীবনকে বিকৃত করে রাখার উপায়মাত্র। কিন্তু সংস্কৃতিই যার ধর্ম সে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে চায় না। আত্মার অভিব্যক্তিতেই তার আনন্দ, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জড়তায় আত্মনিমগ্ন মানুষের জন্যেই আচারধর্মের প্রয়োজন। যে-ধর্ম বৈরাগ্যের কথা বলে সেই ধর্মের জীবনবিমুখতা ও ভীরুতার প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিতৃষ্ণা। সমাজ কামকে অবরুদ্ধ করতে গিয়ে প্রেমকে হত্যা করে, অবরুদ্ধ কাম গোপন পথে আশ্রয় নেয় ও বিকৃত জটিলতার সৃষ্টি করে। কামকে জয় করার একমাত্র পথ প্রেম দিয়ে তাকে সংযত করা।

বৈচিত্র্যপন্থী মনের কাছে মতবাদের গোঁড়ামী ও ধর্মীয় গোঁড়ামী একই পর্যায়ে পড়ে। ভিন্ন রুচির প্রতি আস্থা, ভিন্ন মতবাদ সহ্য করা তো একেবারে গোড়ার কথা। কিন্তু শুধু এই নয়। ভিন্ন মত ও পথের যেখানে যা কিছু শোভন ও সুন্দর তা থেকে উপকরণ নিয়ে, সর্বলোকের, সর্বমানবের হৃদয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে আত্মধর্ম সৃজন, এটাই হচ্ছে

কালচারের গোড়ার কথা। এই সর্বত্রপ্রসারী হৃদয়াবেগের জন্যে এই ধর্ম আত্মকেন্দ্রিক নয়। তাই এটা আত্মধর্ম নয়, আত্মার ধর্ম বলাও যেতে পারে, মোতাহের হোসেন এই ধর্মেই দীক্ষিত ছিলেন। বিভিন্ন শিল্প আত্মার পরিমার্জিত রূপেরই প্রকাশ।

সংস্কৃতিবান লোকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনা তাই জীবনের সর্বপ্রকার স্থূলতার পরিপন্থী। যে জীবন-পরিবেশে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন সে-গৃহে লোকের ভিড় ছিল কিন্তু সঙ্গী ছিল না। সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়ার মত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তাঁর ছিল, তাই তিনি আপন পরিবেশের উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন। সংস্কৃতিবান মানুষ সমাজের কল্যাণকামী, আবার নিজের জীবনে সোনাফলানোতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। মানবসংস্কৃতি এক ও অখণ্ড – এ বিশ্বাস তাঁর আছে বলেই তিনি সর্বপথচারী – আপন আত্মার নির্জনতার অধিবাসী হয়েও তিনি জানেন জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র হারালে, সামঞ্জস্য হারালে ইতিহাস তাঁকে কখনও ক্ষমা করবে না।

[*সমকাল*, আশ্বিন ১৩৬৫]

মানুষ হিসেবে মোতাহের হোসেন ছিলেন সকল রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুবান্ধবদের প্রীত করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিবেককে কখনোই বিসর্জন দেননি। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শওকত ওসমান একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

হাজার কুৎসিত পরিবেশেও নিজের মহত্ব গৌরবকে তিনি ম্লান হতে দিতেন না। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু কোনদিন ঈষৎতম নোংরা কথা মুখ দিয়ে বেরোতো না। তদানীন্তন এক গোলাম-নামধারী লাট সাহেব [গোলাম মোহাম্মদ, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল] সবেমাত্র স্বর্গীয় হয়েছেন, বেতার মারফত খবর এসেছে। এক বাড়িতে তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এখানে প্রায় সকলেই লাট সাহেবকে ঘেন্না করত, কাজেই চিরাচরিত আবহাওয়া : মরেছে তো কি হয়েছে? মোতাহের সাহেব বেশ চুপচাপ। তখন সকলে মৃত লোকটাকে ছেড়ে জ্যান্ত চৌধুরীকে ঘিরে ধরলেন, "আপনার কি মত?"

তিনি ম্লান কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আফটার অল এ ম্যান ইজ ডেড।"

['সাক্ষী নীরবতা', *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, পৃ. ১১৭-১১৮]

রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মোতাহের হোসেন ছিলেন অকপট ও স্বচ্ছ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মোতাহের হোসেন অন্য সকলকে কোনো ভাবাদর্শে ভেসে যেতে দেখে তাদের সুরে সুর মেলাতে অভ্যস্ত ছিলেন না – উচ্চকণ্ঠে কাউকে বিরোধিতা করাও তাঁর স্বভাবে ছিল না। নিজের মনের কথাটিই শুধু তিনি সবিনয়ে নিবেদন করতে পারতেন। দৃঢ় কিন্তু উগ্রতাবর্জিত, সাহসী কিন্তু প্রগল্‌ভ নন, তাই তাঁর বক্তব্যের আবেদন অসামান্য ও দীর্ঘস্থায়ী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনেক সমসাময়িক লেখক ও বুদ্ধিজীবীর মতো তিনি উল্লাসে বিস্ফোরিত হননি, এবং এই অনিবার্য ঘটনাটিতে তিনি স্বস্তিবোধ করেছিলেন শুধু এই বিশ্বাস ও বিবেচনায় যে তাতে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমিত হবে। দুটি রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দু'টোতেই সংখ্যালঘুরা নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারবে। এই বিশ্বাস ছিল একজন সরল সাধু ও ভালো মানুষের বিশ্বাস – রাজনীতির সুচতুর মতলবী বিশ্বাস নয়।

তাঁর এই বিশ্বাসে কোনো ফাঁকি ছিল না, তবে এক ধরনের সান্ত্বনা ছিল, কারণ তাঁর এই বোধও অবিচল ছিল যে, রাষ্ট্র পরিচালনা করেন রাজনীতিকেরা চিন্তাবিদরা নন এবং সরল-সজ্জন মানুষেরা প্রায়ই রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারেন না, সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যাদের দ্বারা পরিচালিত হবে তারা যে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এই রাষ্ট্রটিকে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবেন এ ব্যাপারেও তাঁর গভীর সংশয় ছিল। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ন'টি বছর তিনি সেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে রাষ্ট্রনেতাদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভাষা-আন্দোলন, '৫৪-তে মুসলিম লীগের পরাজয়, যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ষড়যন্ত্রের নীরব ও অসহায় দর্শক ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ বছরগুলোয় এমন সকল রাষ্ট্রীয় অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেছেন তিনি যার প্রতিবাদ করার পরিবর্তে আক্ষরিক অর্থেই নির্বাক হয়ে যান তিনি এবং লেখক হিসেবে অবলম্বন করেন এক ধরনের নীরবতা। '৪৭-পরবর্তীকালেও তিনি দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন নৃত্য, সমগ্র উপমহাদেশেই – তাঁর দেশেও, অন্য দেশেও।

শোষিত বঞ্চিতদের কল্যাণের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে যে-সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে তার প্রতি স্বভাবতই আস্থা থাকার কথা মানবতাবাদী মোতাহের হোসেন চৌধুরীর, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের লোমহর্ষক ঘটনাবলি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় আমলাতন্ত্রের অকল্পনীয় শোষণ-পীড়ন। আমলা-রাজনীতিকদের অসহিষ্ণুতা ও উগ্র কর্মকাণ্ডের কাছে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শই ম্রীয়মান হতে দেখেছেন তিনি। যে-ব্যবস্থা ব্যক্তির মেধা-প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যে-ব্যবস্থায় ব্যক্তি তবে মনের ভাবটি কোনোরকম সংকোচ না করে প্রকাশ করতে অক্ষম, সে-ব্যবস্থার নাম সমাজবাদই হোক অথবা সাম্যবাদই হোক তার নামে জিন্দাবাদ দেয়া মোতাহের হোসেনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিপ্লবে নয় ব্যক্তির উচ্চতর বিকাশে বিশ্বাস করতেন বলে 'লালযুগে'র সকল ব্যাপারে তাঁর সায় ছিল না। তবে যিনি মানবতাবাদী এবং সংস্কৃতির উচ্চতর বিকাশের সম্ভাবনায় আস্থাশীল তিনি সমাজবাদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিতে পারেন না, সাময়িকভাবে শুধু তার সমালোচনা করতে পারেন। তিনিও তাই করেছেন।

অতঃপর গণতন্ত্রের যে-রূপ তিনি তাঁর রাষ্ট্র পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে এই ব্যবস্থার প্রতিও যদি তাঁর বিশ্বাসে ফাটল ধরে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শেষ বছরগুলোয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন এমন প্রায় সকলেরই অভিমত যে তিনি নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। শারীরিক সমস্যা ছিল, বহুমূত্রে ক্ষয় হয়ে এসেছিল জীবনীশক্তি, কিন্তু যে-মনের শক্তি ছিল তাঁর অমূল্য সম্পদ সেই মনের জোরও তাঁর প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। পাকিস্তানের প্রথম দশকটি চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাঁর চোখের সামনেই, সকল মূল্যবোধের

ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে, স্বপ্নের রাষ্ট্রটি একটি বোঝার মতো ব্যক্তির মাথার উপর চেপে ব'সে তার বিকাশের সকল দরোজা রুদ্ধ করে দেয় – এ সব কারণে মোতাহের হোসেন মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবশালী অংশটি সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগের পরিবর্তে শাসকদের তোয়াজ করে তাদের আনুকূল্য অর্জনের আশায় ঢাকা ও করাচি-লাহোরে ছুটছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে, অনেকটা নির্লজ্জের মতো। চট্টগ্রাম বন্দর-নগরীতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন তিনি। নির্জনতা তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু সমধর্মীদের সাহচর্য ছিল যাঁর একান্তভাবে কাম্য, সেই মানুষটিকে নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে অনেকটা অক্টোপাশের মতো। গোঁড়ামি ও ক্ষতিকর সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানের যে-উন্নতি অগ্রগতির স্বপ্ন তাঁরা – মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সদস্যরা – দেখছিলেন বিশের দশক থেকে তা পঞ্চাশের প্রথমার্ধে এসে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর প্রায় সকল সহযাত্রী শাসকসম্প্রদায় ও সর্বোপরি সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার যে-পথ বেছে নেন তা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোনো ধরনের সরকারী আনুকূল্য তিনি পাননি তা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজের কাছ থেকেও তিনি উপযুক্ত সম্মান অর্জনে ব্যর্থ হন।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, সম্ভবত ম্যাট্রিক পাশ করার আগেই, মোতাহের হোসেনের পদ্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। এবং বি. এ পাশ করার আগেই লেখক হিসেবে তিনি অনেকখানি খ্যাতি অর্জন করেন। *'মোসলেম ভারত'* পত্রিকার ভাদ্র ১৩২৮-এ তাঁর 'সহজিয়ার গান' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২০-এর দশকে তিনি প্রচুর গান ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর গানে সুরারোপ করেছেন সেকালের খ্যাতিমান শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু। তিনিও ছিলেন কুমিল্লা শহরের অধিবাসী। তবে মোতাহের হোসেনের জীবনের গতি একটি সঠিক দিকে মোড় নেয় মধ্য-বিশে, ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এই প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানটির নেতা আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও অন্যদের সংস্পর্শে এসে তিনি মননশীল প্রবন্ধ লেখায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এই ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধি অর্জন করেন। সাহিত্য-সমাজ-এর প্রত্যেকটি অধিবেশনেই তিনি যোগ দেন। ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৪-এ অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সমাজের তিনটি অধিবেশনে তিনি উপস্থাপন করেন তিনটি প্রবন্ধ : আমাদের দৈন্য, আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী এবং মুসলমান সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা।

শুধু ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নয় সেকালে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরের প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তখন কুমিল্লায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। ওই শহরের দুই সহোদর – অজয় ভট্টাচার্য্য ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পূর্ব্বাশা' সুনাম অর্জন করেছিল। মোতাহের হোসেন বহুপ্রজ ছিলেন না, তাই তাঁর রচনাবলীর পরিমাণ সীমিত।

আমার সাধ্যমতো সর্বত্র অনুসন্ধান চালিয়ে এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা অবগত হয়েছি তাতে জানা যায় 'সংস্কৃতি-কথা' নামে কোনো প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা মোতাহের হোসেনের ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও গুণগ্রাহীগণ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—*সংস্কৃতি কথা* নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেন মূলত 'তাঁর স্মৃতি রক্ষার' উদ্দেশ্যে। কিন্তু মোতাহের হোসেন নিজে চেয়েছিলেন যে-সকল নামে গ্রন্থ প্রকাশ করতে তা এ রকম :

১. সভ্যতা
২. কবিতার কথা
৩. আমাদের দৈন্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ
৪. সম্মান, আত্ম-সম্মান ও অন্যান্য প্রবন্ধ
৫. সুখের কথা

এ সকল গদ্যগ্রন্থ ছাড়া কবিতার বই প্রকাশের ইচ্ছেও তাঁর ছিল কিন্তু নিয়তি তাঁর সকল ইচ্ছে পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তাঁর সকল ইচ্ছেই অপূর্ণ থেকে যায়।

মোতাহের হোসেনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি গ্রন্থ : *সংস্কৃতি-কথা* (১৩৬০), *সভ্যতা* (ক্লাইভ বেল-এর অবলম্বনে, ১৩৭২) এবং *সুখ* (বারট্র্যান্ড রাসেল-এর অবলম্বনে, ১৩৭৫)। পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং অপ্রকাশিত লেখা দিয়ে আর একটি বইও হতে পারত সে-উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। তা ছাড়া তাঁর কবিতা ও গানের একটি সংকলন হওয়া উচিত ছিল, তাও হয়নি।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মরণোত্তরকালে প্রকাশিত মোতাহের হোসেনের তিনটি বইই যত্নসহকারে সম্পাদিত হয়ে বেরোয়নি। অনেক অসংগতি তাতে লক্ষ্য করা যাবে। যেমন – 'দুঃখবাদ' প্রবন্ধটি 'সংস্কৃতি-কথা'য় স্থান পায়। *সংস্কৃতি-কথা*-র দশ বছর পরে প্রকাশিত এই লেখাটি *'সুখ'*-এও সংকলিত হয়। *সুখ*-এর ভূমিকায় সানাউল হক লিখেছিলেন :

> এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'দুঃখবাদ' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি-কথা'য় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রবন্ধটি আইনত এই পুস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই পুস্তকটিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্যে প্রবন্ধটিকে এখানে স্থান করে দিতে হলো।

তাঁর এই বক্তব্য যথার্থই ছিল। এরপরে বিষয়টির ওখানেই সমাপ্তি ঘটতে পারত, কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে *সংস্কৃতি-কথা*-র পরবর্তী-মুদ্রণগুলোতেও প্রবন্ধটি রয়েই গেছে। দুটি গ্রন্থে একই প্রবন্ধ থাকার কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে ও-তিনটি প্রবন্ধ – 'বিরক্তি ও উত্তেজনা', 'অসূয়া' এবং 'সুখের উপায়' – *সুখ*-এর অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা আমরা তা-ই করেছি।

সংস্কৃতি-কথা-র 'একখানি চিঠি' এবং 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত 'মুসলিম সাহিত্য-সাধনার কয়েকটি দিক' প্রবন্ধটি মূলত এক-ই তবে শেষেরটিই পূর্ণাঙ্গ লেখা প্রথমটি নয়। এজন্যেই 'মুসলিম সাহিত্য-সাধনার কয়েকটি দিক' সংকলিত হলো। দুটি লেখারই প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ প্রায়-অভিন্ন। তার পরবর্তী অংশটুকুর কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে: বর্জন ও সংযোজন করা হয়েছে।

'রিনেসাঁস, গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী' বস্তুত 'নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস' লেখাটিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ। প্রথম লেখাটি গৃহীত হওয়ার পর দ্বিতীয়টি গ্রহণের কোনো যুক্তি ছিল না; মোতাহের হোসেনের জীবদ্দশায় এ বই বেরোলে তা হতো না, তবু দু'টি লেখাই যথাপূর্ব থাকল। 'মেরুদণ্ড' প্রবন্ধটির প্রথম শিরোনাম ছিল 'দুটি দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা'। কোনো কোনো লেখা পত্রিকায় প্রকাশের পর মোতাহের হোসেন কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেন, এখানে যথাসম্ভব লেখক কর্তৃক সংশোধিত পাঠই গৃহীত হলো। মোতাহার হোসেনের পাণ্ডুলিপি ও কাগজপত্র দেখার সুযোগ আমার হয়েছে বলেই তাঁর লেখার সর্বশেষ সংশোধিত রূপটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নানা সময় কোনো কোনো লেখক মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। যা পরবর্তী গবেষকদের বিপদে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। 'তোমারে আজি আমি কি দিব উপহার' গানটি মাসিক *মোহাম্মদী*-র চৈত্র ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *মোহাম্মদী*-র ৩১৭ পৃষ্ঠার একেবারে নিচে এই ছোটো লেখাটি মুদ্রিত হয়। এর আগের লেখাটি 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার রেছালত' শীর্ষক একটি তিন পৃষ্ঠার গদ্যরচনা। ওই লেখাটির শেষে তারকা-চিহ্ন দিয়ে পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় বলা হয়েছে "শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর 'রেছালাতুত তাওহীদ' হইতে অনূদিত।" একজন লেখক এই পাদটীকাটিই এই রোম্যান্টিক গানটির পাদটীকা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। এই কাজটি সৃষ্টি করতে পারে পাঠকের মনে মহাবিভ্রান্তি। এমনটি মোতাহের হোসেন সম্পর্কে অতীতে আরো ঘটেছে। সেকালে মোতাহের হোসেন বি.এ নামে আর একজন গদ্যলেখক ছিলেন। তাঁর দু'একটি লেখাও অনেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বলে উল্লেখ করছেন।

সংস্কৃতি-কথা ও *সুখ*-এর নানা প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবির যে-সব কবিতা ও গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার অধিকাংশই নির্ভুল নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের প্রায় প্রত্যেকটির উদ্ধৃতি তিনি স্মৃতি থেকে দিয়ে থাকবেন, তাই ও-গুলোতে রয়েছে ভুল : শব্দের, বানানের, যতিচিহ্নের অথবা পংক্তি-বিন্যাসের। সেগুলো যথাসম্ভব সংশোধন করে দেয়া হলো। তা সত্ত্বেও পংক্তিবিন্যাস ও অন্য কিছু ত্রুটি রয়ে গেল।

মোতাহের হোসেন যখন ১৯২০-এর দশকে লেখালেখি শুরু করেন তখন তিনি তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকের মতো অবলম্বন করেন চলতিরীতি। 'শিখা-গোষ্ঠী'র প্রাণবিশেষ আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ গ্রহণ করেন প্রধানত চলতি-রীতিকেই। মোতাহের হোসেনেরও দু'একটি প্রবন্ধই সাধুভাষায় রচিত, তবে তাঁর গানের ও কবিতার রচনারীতি আধুনিক নয়: তিরিশের কবিদের নয়–রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাবই তাতে বেশি। গদ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব মোতাহের হোসেনে প্রচুর যদিও তিনি নিজে একটি স্নিগ্ধ-মনোরম রচনাশৈলী নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বানানরীতির ব্যাপারে তিনি পুরনোপন্থী ছিলেন। তা ছাড়া বানানের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে, সেকালের অনেকের মতো, বিভ্রান্তিও লক্ষ্য করা যায় : একই শব্দ

একাধিক বানানে লিখেছেন, যেমন –কোন দিন– কোনোদিন, ছোট –ছোটো, বড়–বড়ো, আরও – আরো, জিনিষ–জিনিস, ভালবাসা–ভালোবাসা, বল্লাম – বললাম, ফার্সি–ফারসী–পারসী, ক্ষুদে–খুদে, জগত–জগৎ, করল–করলো, বলেছিল–বলেছিলো, পাখী– পাখি প্রভৃতি। যে-বানানরীতি তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাঁর অনেক আগেই বার্জিত হয়েছে তাই বহাল রাখেন তিনি। জীবনের একেবারে শেষের দিকে ছাড়া সারাজীবনই তিনি লিখেছেন : পূর্ব্ব, মর্জ্জি, মার্জ্জিত, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বর্জ্জন, অর্জ্জন, সূর্য্য, কার্য্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য্য, দুর্দ্দিন, ব্যবহার্য্য, নির্ম্মাণ, প্রাচুর্য্য, সৌন্দর্য্য, শৌর্যবীর্য্য, বর্ত্তমান, নির্য্যাতন, পর্য্যন্ত প্রভৃতি। তাঁর শেষের দিকের লেখার পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় তিনি আধুনিক প্রমিত বানানের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। মোতাহের হোসেনের মুদ্রিত লেখা এবং তাঁর পাণ্ডুলিপির বানানই বহাল রাখা হয়েছে তবে শুধু বর্জন করা হয়েছে দ্বিত্ব। তাঁর হাইফেন ব্যবহারের প্রবণতা ছিল, অর্থাৎ যেখানে হাইফেন না দিলেও চলে সেখানেও তিনি হাইফেন দিতেন ; যেমন–মধ্য-যুগ, জীবন-প্রীতি, বন্ধু-বান্ধব, জাতীয়তা-বিরোধী, গোলাপ-কুঞ্জ, বাংলা-গদ্য, মানব-সত্তা প্রভৃতি। জীবনের এক এক পর্যায়ে, অনেক লেখকের মতো, মোতাহের হোসেনও একই শব্দ একাধিক বানানে লিখেছেন। সর্বশেষ পদ্ধতিটিই গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি–২০০৯

সৈয়দ আবুল মকসুদ

সংস্কৃতি-কথা

ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা—সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।

ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্মচেতনার অপর নাম আত্মা।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লা সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সে-ই কাল্‌চার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আল্লাকে জীবনপ্রেরণা রূপে পায় না, ঠোঁটের বুলি রূপে পায়। তাই শ'র উক্তি : Beware of the man whose God is in the skies— আল্লা যার আকাশে তার সম্বন্ধে সাবধান। কেন না, তার দ্বারা যে-কোনো অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে। আল্লাকে সে স্মরণ করে ইহলোকে মজাসে জীবন-যাপন করবার জন্য আর পরকালে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা স্বর্গে একটা প্রথম শ্রেণীর সিট রিজার্ভ করার আগ্রহে—অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়। ইহকালে ও পরকালে সর্বত্রই একটা ইতর লোভ।

অপর দিকে কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে; অন্যায় নিষ্ঠুরতাকে তো বটেই, ন্যায় নিষ্ঠুরতাকেও। মানুষকে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে। নিষ্ঠুর হয়ো না—এই তাদের ভেতরের দেবতার হুকুম আর সে হুকুম তারা তালিম না করে পারে না, কেননা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা কালচারের উদ্দেশ্য। যেখানে তা নেই সেখানে আর যাই থাক কালচার নেই। কালচার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম। ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।

কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো এ-ই কালচারের আদেশ। এবং এই আদেশের সফলতার দিকে নজর রেখেই তা সমাজতন্ত্রের আদেশ। সমাজতন্ত্র তার কাছে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। কালচার ব্যক্তিতান্ত্রিক এ কথা বললে এ বুঝায় না যে, কালচার্ড মানুষ সমাজের ধার ধারে না, সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া জীব। তা নয়, সমাজের ধার সে খুবই ধারে। নইলে প্রাণ পাবে কোত্থেকে? ব্যক্তি তো নদী, সমাজ সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে-যোগযুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে? সুতরাং নিজের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই কাল্‌চার্ড মানুষ সমাজের কথা ভাবে, এমন কি দরকার হলে সমাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত

দিতে প্রস্তুত থাকে। সংস্কৃতিবান মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। এই সমাজে, এই অর্থনীতির অধীনে এর চেয়ে বেশী সুন্দর হওয়া যায় না, এ কথা বলে নিজেকে কি অপরকে সান্ত্বনা দিতে সে লজ্জাবোধ করে। সে চায় নিজের সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। নিজের কাছ থেকে ষোল আনা আদায় করে না নিতে পারলে সে খুশী হয় না। এই জন্য শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা তার মনঃপূত নয়। কেননা তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়, এবং নিভৃতবাসী অন্তরপুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়। অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে–মানুষের চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে অন্তরায় ঘটায়। সমাজের আদেশ : দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না। এগারোদের সে সহ্য করে না–যদিও গৌরবের জন্য মাঝে মাঝে মাথায় করে নাচে। কাল্‌চারের আদেশ : দশের মধ্যে এগারো হও, দশের মধ্যে থেকেই নিজেকে নিজের মতো করে, সর্বাঙ্গ সুন্দর করে ফুটিয়ে তোল। তাতেই হবে তোমার দ্বারা সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবা, যদিও সমাজের বিরক্তি-ভাজন হওয়াই হবে তোমার ভাগ্য।

সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সহায়তায়। এই যে নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলা এরি নাম কাল্‌চার। তাই কাল্‌চার্ড মানুষ স্বতন্ত্রসত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না হলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। চিন্তা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে সমতা স্থাপন করে মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করতে চায় বলে ধর্ম অনেক সময়ে কাল্‌চারের পরিপন্থী। মতবাদীও এ দোষে দোষী, তাই মতবাদী ও ধার্মিকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সরকারী গলায় কথা বলে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে ষ্টীমরোলার চালাতে ভালোবাসে। ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফ্‌ট-রাইট্ করতে শেখায়।

ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ও-সবের বালাই নেই। তারা সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা–বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা–এরি নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহু দূরে থাকে সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা, কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না। তার উক্তি :

তুমিতো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোক আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

পরম বেদনায়, অসংখ্য দুঃখের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে অন্তরে যে গোলাপ ফুটিয়ে তোলে তাই তার স্বর্গ। সেই সৃষ্টি করা এবং তা অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ

করা, এ-ই কাল্‌চার্ড জীবনের উদ্দেশ্য। এই কথা যখন অন্তরে জাগে তখন বাইরেও তার প্রভাব উপলব্ধ হয়। তখন স্বতঃই বলতে ইচ্ছে হয় :

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে।

ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, চক্ষুটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে কাল্‌চারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পতন পাপ থেকে রক্ষা নয়। গোলাপের সঙ্গে যদি দু'একটা কাঁটা এসেই যায় তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কি-না—এ-ই কাল্‌চারের অভিমত। মনুষ্যত্বের বিকাশই সব চেয়ে বড় কথা, চলার পথে যে স্খলন-পতন তা থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং বড় জীবনের তাগিদে এলে এই স্খলন-পতন ও মর্যাদাও বেড়ে যায় অনেকখানি। মর্যাদাবান হয়ে ওঠে।

বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে ধর্ম সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়সাধনার পরিপন্থী। অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবনসাধনারই অপর নাম কাল্‌চার। মন ও আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের নবজন্মদানই কালচারের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের সবকটিই যে সমমূল্য তা নয়। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষু আর কানই সেরা। তাই তাদের স্থান সকলের আগে দেওয়া হয়েছে। চোখের মানে ছবির সাধনা, কানের সাধনা গানের। (সাহিত্যের মধ্যে চোখ ও কান উভয়েরই কাজ রয়েছে, কেননা তা ছন্দ ও ছবি উভয়ের মিলন।) চোখ ও কানের পরেই নাসিকার স্থান—নিঃশ্বাস গ্রহণের সহায়তায় বাঁচবার সুযোগ দেয় বলে নয়, সুগন্ধ উপলব্ধির দ্বারা আত্মাকে প্রফুল্ল রাখবার সুযোগ দেয় বলে। চোখ ও কান 'আত্মার' জিহ্বা, এদের মারফতেই সে তার খাদ্য চয়ন করে। অথচ, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কোনো কোনো ধর্ম এই চোখ ও কানের সাধনারই পরিপন্থী, সেখানে তারা পতনের ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তাই আমরা চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা। সুর বা ছবির সূক্ষ্মতা আমাদের প্রাণে দাগ কাটে না। চোখ ও কানের প্রতি বেখেয়াল থাকা যে আত্মার প্রতিই বেখেয়াল থাকা, সংস্কৃতিবানরা তা বুঝলেও ধার্মিকের মাথায় তা সহজে ঢোকে না। তাই তারা শুধু ঈশ্বরের নাম নেয়, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে না।*

ইন্দ্রিয়ের সাধনা বলে কাল্‌চারের কেন্দ্র নারী। নারীর চোখ-মুখ, স্নেহ-প্রীতি, শ্রী ও হ্রী নিয়েই কাল্‌চারের বাহন শিল্প-সাহিত্যের কারবার। ইন্দ্রিয়গ্রামের জাগরণ ও নিয়ন্ত্রণের মূলেও নারী। 'বোধকলি' তার প্রসাদেই ফোটে, জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা নারী থেকেই আসে। তাই কবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : 'আমি হব না তাপস, হব না, যদি না পাই গো তপস্বিনী।' জীবনে তপস্যা করতে চায় বলে নারী-সঙ্গ কাল্‌চার্ড মানুষের এতো কাম্য। বৈরাগীরা নারীকে পর করে সংস্কৃতিকেও পর করে। তাই তাদের জীবনে ঋদ্ধি নেই, তারা নিঃস্ব—নব নব বুদ্ধি ও প্রীতির স্বাদ থেকে

---

* ঈশ্বরকে চাওয়া মানে ঐশ্বর্যকে চাওয়া। রামকৃষ্ণ বলতেন : ঈশ্বর বেটাকে কে মানতো যদি তার ঐশ্বর্য না থাকতো? এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি-যোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের আশ্রয়ে তাঁর যে সাধনা তা চিত্ত সমৃদ্ধিরই সাধনা। পথের বৈচিত্র্যের স্বাদ তিনি পেতে চেয়েছিলেন নইলে পথ যে আসলে এক, তা কি তিনি জানতেন না?

বঞ্চিত। কী মানসিক, কী সাংসারিক সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির গোড়ায় নারী। যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনিই পুরুষের জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। যে জাতি নারীকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা রাখতে চায় সে-জাতি জীবনে মৃত্যুর আরাধনা করে–ইতিহাসের খাতায় সে মরা-জাতির পৃষ্ঠায় নাম লেখায়। তার জীবনে আত্ম-নির্যাতন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। আর আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই বলে সংস্কৃতিও নেই। কেননা সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ–নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।

ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত রয়েছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের নজরে, আর কোনো কোনো ধর্ম ততটা না গেলেও সঙ্গীত-নৃত্যের মারফতে নারীকে ঘিরে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি তাতে জানিয়েছে ঘোর আপত্তি। সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি তার কাছে কামেরই আয়োজন, কামের উন্নয়ন নয়। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের সহায় না হয়ে নারী স্থূল ভোগের বস্তু হয়েই রইল, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরক ও উচ্চতর জীবনের সহায় হতে আর পারলে না। যৌন ব্যাপারে বিশেষ ও কড়া শাসনের ফলে মানুষ তাতেই আকৃষ্ট হয়ে রইল–যৌন সম্ভোগকে অতিক্রম করে যে প্রেম ও আনন্দ তা অনুভব করতে পারলে না বলে। নিষিদ্ধ বস্তু সাধারণতঃ ভীতি ও অতিরিক্ত আকর্ষণ–এই দুই মনোবৃত্তির সংঘর্ষ বাধিয়ে জীবনে বিকৃতি ঘটায়। এখানেও তাই হল, যৌন ব্যাপার মন্দ, এ কথা না বলে যদি বলা হ'ত : প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, তা হলে পৃথিবীর চেহারা হয়তো এতো কদর্য হত না। প্রেমের দ্বারা কাম নিয়ন্ত্রিত হ'ত বলে ব্যভিচার ও নিরোধ উভয়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ সহজ ও সুন্দর হতে পারত।

কিন্তু তা না বলে নীতিবিদরা মানুষকে সংযম শিক্ষা করতে বললেন, অথচ কোন্ বড় জিনিসের দিকে তাকিয়ে তা করতে হবে তা বাত্‌লালেন না। কেবল স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর স্বর্গের যে চিত্রটি আঁকা হল তাতে এখানে যা ভয়ঙ্কর বলে সাব্যস্ত, সেই ইন্দ্রিয়বিলাসেরই জয় জয়কার ঘোষিত হল। তাই ইন্দ্রিয়-ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে–মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার মতো বড় কিছুর আশ্রয় খুঁজে পেলে না। নীতিবিদদের জানা উচিত ছিল, সংযম বলে কোনো স্বাস্থ্য-প্রদায়ী বস্তু নেই, আছে বড় জিনিসের জন্য প্রতীক্ষা আর সেই বড় জিনিস হচ্ছে প্রেম। যে প্রেমে পড়েছে, অথবা প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করেছে সে-ই প্রতীক্ষা করতে শিখেছে, অর্থাৎ সে-ই সহজে সংযমী হতে শিখেছে, অপরের পক্ষে সংযম মানে পীড়ন আর পীড়ন নিষ্ঠুরতার জনয়িত্রী। যে বিনা কারণে নিজেকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দিতে তার তিলমাত্রও বাধে না। Sadism-এর গোড়ায় আত্মপীড়ন, এ কথা মনে রাখা চাই।

নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায় যৌনতৃপ্তি। যৌনতৃপ্তির উপায় কামকে প্রেমের সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু কামে তৃপ্তি নেই, তা পরিণামে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে আসে। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েই কাম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে। অথচ সমাজ বিয়ের মারফতে কামের দ্বারটি খোলা রাখলেও (বিয়ে মানে : Sex made-easy), প্রেমের দ্বারটি বন্ধ করে দিয়েছে।

বিবাহিত নর-নারীর প্রেমহীন স্থূল যৌনসম্ভোগে সমাজের আপত্তি নেই, কিন্তু অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকা যদি একটু হাতে হাত রাখে, অথবা ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকায় তবেই যতো আপত্তি। প্রীতিকে বড় করে না দেখে নীতিকে বড় করে দেখার এ-ই স্থূল পরিণতি। বলা হবে সমাজকে রক্ষা করতে হলে এই স্থূলতার প্রয়োজন আছে, অতএব

তা দোষাবহ নয়। উত্তরে বলব : হাঁ, সমাজের কাজ তো ঐ পর্যন্তই, নিজের কাঠামোটুকু টিকিয়ে রাখাই তার কাজ, তার বেশী কিছু নয়। ব্যক্তির বিকাশের কথা সে যতটুকু ভাবে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার কথা, আর সমাজকে টিকিয়ে রাখা মানে সমাজের মোড়লদের টিকিয়ে রাখা–তাদের স্বার্থকে অক্ষত রাখা। মানুষ গোল্লায় যাক, তবু মোড়লদের জবরদস্তি বজায় থাক, এই-তো সমাজের কাম্য। সমাজ মানুষের বৃদ্ধি চায় না, চায় একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে তাকে কোনোপ্রকারে টিকিয়ে রাখতে–তার চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে বাধা দিতে।

তাই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভার নিয়েছে কাল্‌চার। যৌনব্যভিচারের দ্বারা লোকটি নিজেকে ও সমাজকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে কিনা সেদিকে তার নজর নেই। শকুনের মতো সে মরা গরুর সন্ধানে থাকে না, বুলবুলের মতো তার দৃষ্টি থাকে গোলাপ-কুঞ্জের দিকে। লোকটির মনে সৌন্দর্য ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় কি-না, তার বুকে মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য সজীব দরদ আছে কি-না, নিষ্ঠুরতাকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে কি-না, তা-ই সে দেখতে চায়, এবং দেখতে পেলে খুশী হয়ে সাত খুন মাফ করে দেয়। কেননা, সে জানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারীদের জীবনে এখানে-সেখানে স্খলন-পতন থাকলেও, যাকে বলা হয় ব্যভিচার তা কখনো থাকতে পারে না। লোভ ও লালসার হাতে ক্রীড়নক হতে চায় না বলে তারা সদা পবিত্র-গঙ্গাধারার মতো কখনো কখনো পঙ্কিলতা বহন করেও অপঙ্কিল। কিন্তু পঙ্কিলতা-অপঙ্কিলতার প্রতি ধার্মিকের দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি কেবল নীতিরক্ষার দিকে। নীতিরক্ষা হলেই ব্যস, লেফাফাদুরস্তি ও লেবাস-পোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। আত্মার দিকে তার নজর নেই, নীতিরক্ষী নির্দয় ও নিষ্প্রাণ মানুষকেও সে শ্রদ্ধা জানায়।

কামকে দমাতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্ম-সৃষ্ট সমাজ প্রেমকেই দমায়। প্রেম মরে যায়, কাম গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করে টিকে থাকে–মুখ নীচু ক'রে চোরের মতো চলে। সমাজ তাতেই খুশী। কেননা, সে ভীরুতাই পছন্দ করে, সাহস নয়। প্রেম অন্যায়কারী বলে নয়, সাহসী বলেই সমাজের যত ক্রোধ তার উপরে গিয়ে পড়ে। প্রেমিকের আচরণে একটা চ্যালেঞ্জ দেখতে পায় বলে সে তাকে সহ্য করতে পারে না। (সমাজ যেন নীরব ভাষায় বলে ডুবে-ডুবে জল খা'না–কে তাতে আপত্তি করে? অত দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছিস যে, সাহসের বাড় বেড়েছে বুঝি? আচ্ছা দাঁড়া তোর বড়াই ভাঙছি।) গোপনে পাপ করে চলো কেউ কিছু বলবে না ; না জানলে তো নয়ই, জানলেও না। তুমি যে মাথা হেঁট করে চলেছ তাতেই সকলে খুশী, তোমাকে অবনতশিরই তারা দেখতে চায়। প্রেমের শির উন্নত বলেই তার বিপদ–সমাজের যত বজ্রবাণ তার মাথার উপরেই বর্ষিত হয়।

নীতির ব্যর্থতার যে এই একটি দিকই তা নয়, অন্য দিকও আছে। একটি ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ জীবনের সর্বত্র তার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্লাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়। অথচ যৌনব্যভিচারের চেয়ে উৎকোচ গ্রহণ আর কালোবাজারি যে সমাজের পক্ষে কম অকল্যাণকর তা কেউ বলবে না। নীতির কেন্দ্রীভবনজাত এই শোচনীয়তা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ। যাদের নীতিবোধ একটা নির্জীব সংস্কার মাত্র নয়, সজীব উপলব্ধির ব্যাপার, তারা তা মানতে বাধ্য। য়ুরোপে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে বলেই জীবনের সর্বত্র, বিশেষ করে অর্থের ব্যাপারে, তার প্রয়োজনীতা অনুভূত হচ্ছে। একটি ব্যাপারেই আবদ্ধ হয়ে না থাকায় ঘৃণা সেখানে জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার

সুযোগ পেয়েছে। যৌনব্যভিচারীর চেয়ে উৎকোচগ্রহণকারী সেখানে বেশী বই কম ঘৃণার পাত্র নয়। আমাদের এখানে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমরা যৌনব্যভিচারীকে দেখলে নাসিকা কুঞ্চিত করি, অথচ উৎকোচগ্রহণকারীকে শ্রেষ্ঠ আসনটি দিতেও দ্বিধা করিনে।

(বাইরের নীতির এই যে অস্বাস্থ্যকর প্রাধান্য, এর প্রতিবাদ রয়েছে হিন্দু পুরাণে। সত্যিকার মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে তথাকথিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীরা সেখানে প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রাতঃস্মরণীয়া বলে গৃহীত। কাল্‌চারের গোড়ার কথা যে মূল্যবোধ, তা পুরাণকারদের ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় নীতিকে বড় ক'রে না দেখে তাঁরা অন্তরাত্মার মহিমাকেই বড় করে দেখেছেন, আর যেখানেই তা দেখতে পেয়েছেন সেখানেই শ্রদ্ধায় অবনতশির হয়েছেন। মনুষ্যত্ব তথা সজীব দয়া-মায়া স্নেহ-প্রীতি ও মহত্ত্বই তাঁদের পূজ্য। নীতির খোলস ভেদ করে তাঁরা মানুষের মর্মকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। পুরাণকারদের সেই ধারা বয়ে শরৎ বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পুরাণকারদের মতো তিনিও সত্যিকার মনুষ্যত্ব তথা মহত্ত্বের খোঁজে–মহত্ত্বই তার কাছে মনুষ্যত্ব আর কিছু নয়–যাত্রা করেন এবং সমাজপরিত্যক্ত তথাকথিত পতিত-পতিতাদের মধ্যেই তার সাক্ষাৎ পান, সভ্যভব্য নীতিপরায়ণদের জীবনে নয়। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছেন শুধু মিথ্যার খেলা আর সংকীর্ণতার জয়জয়কার। লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তি ঠিকই আছে, নাই কেবল মনুষ্যত্বের প্রতি ঐকান্তিক টান–যার ফলে মানুষ সঙ্কট-সঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না।

কিন্তু হিন্দুপুরাণের ধারাবাহী শরৎবাবু সম্বন্ধে যখন হিন্দু অধ্যাপককেই সাবধানবাক্য উচ্চারণ করতে শুনি তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। হিন্দুর ঐতিহ্য যে নীতির ঐতিহ্য নয়, নীতির চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় প্রীতির ঐতিহ্য, মহত্ত্বের ঐতিহ্য, হিন্দুঐতিহ্যের ধ্বজাবাহী অধ্যাপক মশাই তা-ই উপলব্ধি করতে পারেন না। যার কথা বলা হল, তিনি আমারও শিক্ষক আর শিক্ষক কি মুরুব্বীর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারিনে—ঘাবড়ে যাই, থতমত খেয়ে যাই। নইলে তাঁকে বলতুম, শরৎবাবু সম্বন্ধে তো ছেলেদের সাবধান করে দিলেন স্যার, কিন্তু শরৎবাবু যার ধারাবাহী সেই পুরাণ সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না–বিষবৃক্ষের আগাটা কাটা হল বটে, কিন্তু গোড়াটা রয়ে গেল যে। উত্তরে তিনি কী বলতেন জানিনে, তবে যা বলতেন তা বোধ হয় এই রকম একটা-কিছু আন্দাজ করা যায় : হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রাতঃস্মরণীয়াদের জীবনে যা ঘটেছে তা তাঁদের জীবনেই খাটে, অন্যের জীবনে নয়, এ কথা হিন্দু জানে, তাকে সে-কথা বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

জানে বই কি, নইলে হিন্দুর পতন হবে কী করে? যেদিন থেকে হিন্দু, দেবতাদের জন্য এক জীবন আর নিজের জন্য অন্য জীবন মেনে নিলে সেদিন থেকেই তো তার পতনের সূত্রপাত হল–নীতিধর্মী, অশক্ত, বেদনাবিহীন, দুর্বল জীবন কামনা করার ফলে। জীবনের সমৃদ্ধিকে কামনা না করে কোনোপ্রকারে টিকে থাকাকেই সে বাঞ্ছনীয় মনে করলে। আর সত্যি-সত্যি কোনোপ্রকারেই সে টিকে রইল–museum specimen হয়ে। সেদিন থেকে হিন্দু-সমাজে নীতিধর্মী মাঝারির রাজত্ব স্থাপিত হল এবং অ-নীতিধর্মী মহতেরা অন্তর্ধান করলে। মহতেরা বললে : তোমার নীতি আমি মানিনে। ... ...

জীবন নিয়ে পরীক্ষা করবার অধিকার আমার আছে। আমার ভেতরে যে অমৃত লুকিয়ে আছে তা আমার চাই-ই। আর তা আমাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে, তোমার দেওয়া ধরাবাঁধা নীতির অনুসরণ করলে পাওয়া যাবে না। কে তোমাকে শেষ কথা বলার অধিকার দিয়েছে? আমি যে অশেষের পূজারী। ছোট ছোট নীতির বাঁধনে বেঁধে

আমার জীবনকে, আমার আগমনকে ব্যর্থ করে দিও না, আমাকেই আমার উদ্ধারকর্তা হতে দাও, আমার জীবনের নিয়ামক হতে দাও। নীতিধর্মী মাঝারি বললে : চুপ করো, অত সাহস দেখিয়ো না, ঐ পরীক্ষাতে বিলক্ষণ ভয়ের কারণ আছে, ওখানে উন্নতির সম্ভাবনার চেয়ে পতনের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং সাবধান। উন্নতি না হলে থোড়াই ভাবনা, পতন না হলেই হল। আমার দেওয়া এই নীতির মাদুলি পরিধান করো, পতন থেকে রক্ষা পাবে, আর এই রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা। দেখো না চারিদিকে কেবলই পতনের ফাঁদ। আমার কথা শুনলে তুমি অমৃত পাবে না বটে, কিন্তু বিষ থেকে বেঁচে যাবে। আর তাই তো চাই, অমৃত না খেলেও বাঁচা যায় কিন্তু বিষ খেলে তো বাঁচা যায় না। উত্তরে মুহূর্তকামীরা বললে : তা হলে বিদায়, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে, তোমার রাজ্যে আমার স্থান নেই। আমি অমৃতাভিসারী, মরণ ভয় আমার নেই। শুধু কোনোপ্রকারে টিকে থাকার সাধনা আমার নয়। মাঝারিরা বললে : ভালোই হল, আপদ গেছে। আমাদের সনাতন শান্তির রাজ্যে সে অশান্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। কী কেবল অমৃত-অমৃত করে! অমৃত কি মানুষের। সে তো দেবতার। দেবতার পাতে হাত দিতে চায় যত অকালকুষ্মাণ্ডরা।

দেবতার জন্য প্রেম, দেবতার জন্য মুহূর্ত, দেবতার জন্য সমৃদ্ধি। আমরা শুধু জন্মগ্রহণ করেছি আপিসের বড় বাবুটি হয়ে, বে-থা করে নিশ্চিন্তে ছেলের মাথায় হাতটি রেখে মরে যাওয়ার জন্য। দূরাভিসারী চিত্ত আমাদের নয়, কঠিনের সাধনাকে আমরা ভয় করি। তাই প্রেমকে ভয় করি, মহত্বকে ভয় করি, জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভয় করি। মৃত্যুর পরে যার তহবিলে কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া যায়, সে ব্যক্তিই আমাদের কাছে সার্থক মানুষ, তারি প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ। আমাদের ছেলেদের তারি চরিত্র অধ্যয়ন ও অনুসরণ করতে বলি। ভুলে যাই যে, অন্তরের দিক দিয়ে যে যত বেশী ছোট, তারি তত বেশী টাকা-পয়সা জমাবার সম্ভাবনা। ছোটলোকামির সাধনাই আমাদের কাছে জীবন-সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। নীতি এ সাধনার সহায়ক, একটা ধরাবাঁধা পদ্ধতির অনুসরণ না করলে আর যাই করা যাক টাকা-পয়সা করা যায় না। তাই আমরা নীতিধর্মী হয়েছি।

কথায় কথায় হিন্দুর উন্নতি-অবনতির কথা এসে পড়ল। ভালোই হল, কথায় বলে নসীহতের চেয়ে নজীর ভালো। আর এ নজীরে বিপদের সম্ভাবনা কম। কারণ, আর যে-কারণেই হোক ধর্মের সমালোচনায় হিন্দু, অন্তত বাঙ্গালী হিন্দু, উদ্দণ্ড হয় না। ধর্ম ব্যাপারে পাশাপাশি বিভিন্ন মতবাদ চলার দরুন সে অনেকখানি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অর্জন করেছে।)

ধার্মিক আর কাল্‌চার্ড মানুষে আরেকটা লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য এই যে, ধার্মিকের চেয়ে কাল্‌চার্ড মানুষের বন্ধন অনেক বেশী। উল্‌টা কথার মতো শোনালেও, কথাটি সত্য। ধার্মিকের কয়েকটি মোটা বন্ধন, সংস্কৃতিবান মানুষের বন্ধনের অন্ত নেই। অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সে-ই তো ফ্রি-থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কাল্‌চারের দান। যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কাল্‌চার নেই।

প্রশ্ন হবে : ধর্ম আর কাল্‌চারকে যেভাবে আলাদা করে দেখা হল তাতে মনে হচ্ছে নাকি ধার্মিক কখনো প্রকৃত অর্থে কাল্‌চার্ড হতে পারে না? কিন্তু কথাটি কি সত্য? ধার্মিকদের মধ্যেও তো অনেক কাল্‌চার্ড লোক দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে বলব : তা বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে, সেখানেও কাল্‌চারই কাল্‌চার্ড হওয়ার হেতু। অনুভূতি, কল্পনার সাধনা করেছেন বলেই তাঁরা কাল্‌চার্ড, অন্য কারণে নয়।

একটা অভিজ্ঞতার সহায়তায় আমি কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। আমি

মিলিটারি কন্ট্রাক্টারের খাতায় নাম লেখানোর দরুন পাদ্রি ওয়াট্‌সন সাহেব যা বলেছিলেন তা এখানে মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন : কবিত্বের প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কন্ট্রাক্টার হওয়া অপরাধ, মহা অপরাধ। নিজের প্রতিভাকে মরতে দেওয়া আর নিজের আত্মাকে মরতে দেওয়া এক কথা। তুমি নিজেকে মরতে দিতে পার, কিন্তু নিজের আত্মাকে মরতে দিতে পার না। যে-পেশা গ্রহণ করলে তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সৌন্দর্য-বোধ ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা, তুমি সে-পেশা গ্রহণ করেছ শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি চাই তুমি না খেয়ে মর তথাপি তোমার সূক্ষ্মঅনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখ, কেননা সূক্ষ্মঅনুভূতিরই অপর নাম আত্মা। তুমি বলবে তোমার সামান্য প্রতিভা, আর little genius is a great bondage–সামান্য প্রতিভা, কঠিন বন্ধন। কিন্তু সামান্য হলেও তা মূল্যবান। আর যা মূল্যবান তার যত্ন না নেওয়া মহাপাপ। বুঝলে? কথায় বলে ভালো লোকদের ভাত নেই। তোমার ভাত না থাক, কিন্তু ভালোত্ব বজায় থাক, এই আমার কামনা।

তখনো মার্কসের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয় নি। তাই কথাটা শুনে খুশী হয়ে ঘরে ফিরে এলাম, কোনো তর্ক না করে। এখনো মাঝে মাঝে আমার সেই বোকামিকে আমি চুমু খাই। কেননা আমি জানি খুশী হওয়ার জন্যে বোকা হওয়ার প্রয়োজন আছে। বাইবেলের ভাষাটা একটু বদলে দিয়ে বলা যায় : Blessed are the simple hearted for they shall be happy.*

এখন এই যে মূল্যবোধ, এই যে সূক্ষ্মঅনুভূতি আর আত্মাকে এক করে দেখার প্রবৃত্তি একি ধর্মের দান, না কাল্‌চারের কীর্তি? কই সচরাচর তো ধার্মিকের মুখে এ ধরনের সুন্দর কথা শুনতে পাওয়া যায় না। তার কাছে তো আল্লার হুকুম আর বেহেশত দোজখই বড় হয়ে ওঠে, সূক্ষ্মঅনুভূতির কথা নয়। সূক্ষ্মঅনুভূতি কাল্‌চারের দান। Human value সম্বন্ধে কাল্‌চারই মানুষকে সচেতন করে। তবে কাল্‌চার্ড মানুষ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে কেন? উত্তর, আরামের জন্য। একটা বিশ্বাসের আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সহজে জীবন যাপন করা যায় বলেই তিনি তা করেন। যে-ধর্মকে তিনি আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন তাতে তিনি নিজেরই কাল্‌চার্ড মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পান, এবং দেখতে পেয়ে ঘোষণা করে বেড়ান : দেখো, দেখো এখানে সব আছে, এখানে এসো ; কাল্‌চার্ড মনের উপযোগী ধর্ম যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা এখানে, এখানে, এখানে।–ব্যাপারটা যে মোটের উপর তাঁরি মনের প্রতিফলন, বাইরের তেমন কিছু নয়, তা তিনি টের পান না। প্রেমিক যেমন নিগ্রো মেয়ের ভুরুতেও হেলেনীয় সৌন্দর্য দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে, এখানেও তেমনি একটা ব্যাপার ঘটে। তা তিনি মুগ্ধ হয়ে থাকুন কিন্তু তাঁর 'সুন্দরী'কে অপরেও সুন্দর বলুক, এমনি একটা গোঁয়ার্তুমি যেন তাঁকে পেয়ে না বসে, এই আমাদের প্রার্থনা।

সংস্কৃতি মানে জীবনের Value** সম্বন্ধে ধারণা। ধর্মের মতো মতবাদ বা আদর্শও

---

* এর কিছুদিন পরে আমার এক ধার্মিক বন্ধুকে বল্লাম : দেখুন তো খ্রীষ্টান পাদ্রীরা কি সুন্দর কথা বলেন, আমাদের মৌলবী সাহেবদের তো এমন সুন্দর কথা বলতে শোনা যায় না। উত্তরে বন্ধুটি বললেন : বোকা কোথাকার, ওদের পাদ্রীদের যে কাল্‌চার আছে। আমাদের মৌলবী সাহেবদের তা কোথায়? ব্যস্, আমার বোকামীর পুরস্কারটি হাতে হাতে পেয়ে গেলাম : কাল্‌চারই সৌন্দর্যের কারণ, অন্য কিছু নয়, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

** অনেকে বলেন হায়ার ভ্যালু, কিন্তু হায়ার ভ্যালু বলে কোনো কথা থাকা উচিত নয়। কেননা, 'ভ্যালু' জিনিসটা নিজেই একটা 'হায়ার' কিছু, সুতরাং হায়ার কথাটা ফাজিল, অতিরিক্ত।

তা ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সে-সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার দরকার। অতীতে ধর্ম ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করেছিল, বর্তমানে মতবাদ বা আদর্শ মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে। লোকটা মোটের উপর ভালো কি মন্দ সেদিকে আমাদের নজর নেই, তার গায়ে কোন্ দলের মার্কা পড়েছে সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য। মার্কাটি নিজের দলের হ'লে তার সাতখুন মাফ, না হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার দোষ বের করা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এই মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি না পেলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। মনে রাখা দরকার, ধর্মের সমস্ত দোষ মতবাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। মতবাদী ধার্মিকের মতই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী, অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর। ধার্মিকের নিষ্ঠুরতার সহায় ছিল ধর্মগ্রন্থের সমর্থন, মতবাদীর সহায় বিজ্ঞান। আমি আমার জন্য নিষ্ঠুর হচ্ছি না, পৃথিবী-উন্নয়নের বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের জন্যই নিষ্ঠুর হচ্ছি। অতএব এখানে আমার গৌরব নিহিত, কলঙ্ক নয়। নিষ্ঠুরতাব্যাপারে এই যুক্তিই মতবাদীর আত্মসমর্থনের উপায়। সৌভাগ্যের বিষয় সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না, মতবাদকে তারা যমের মত ভয় করে। কেননা তাদের কাজ বাইরের থেকে কোনো দর্শন গ্রহণ করা নয়, বহু বেদনায় নিজের ভিতর থেকে একটা জীবনদর্শনের জন্ম দেওয়া, এবং দিনদিন তাকে উন্নতির পথে চালনা করা।

আইডিয়ার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের বা নিজের দলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে একটুখানি সন্দেহ রাখা। এই সন্দেহটুকুই মানুষকে সুন্দর করে তোলে, আর সৌন্দর্যই সংস্কৃতির লক্ষ্য। স্কেপ্‌টিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এতো এক রকম অবিসংবাদিত সত্য। মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতিবান হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই, বিচিত্র পথ। কার জন্য কোন্ পথটি সার্থক কে বলবে? সেকালে বলা হ'ত যত জীব, তত শিব ; এ কালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতি-পন্থা। যে-পথটি ধরে মানুষ কাল্‌চার্ড হয় তা অলক্ষ্য না হলেও দুর্লক্ষ্য। তা পরে আবিষ্কার করা যায়, আগে নয়। তাই সংস্কৃতিবান মানুষটি একটা আলাদা মানুষ, স্বতন্ত্রসত্তা। তার জীবনের একটি আলাদা স্বাদ, আলাদা ব্যঞ্জনা থাকে। সে মতবাদীর মতো বুলি আওড়ায় না, তার প্রতিকথায় আত্মা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, এমন কি সাধারণতঃ ধর্মীয় কল্যাণের ব্যাপারেও তার আত্মার ঝল্‌কানি দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পথটি নিজেই তৈরী করে নেয় বলে সে নিজেই নিজের নবী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কল্যাণের ব্যাপারে সাম্যকে স্বীকার করলেও প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, চিন্তার ব্যাপারে সে স্বাতন্ত্র্য তথা বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী। সত্যকার সংস্কৃতিকামীরা নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করতে চায় না। নকল যীশু, নকল বুদ্ধ, নকল মার্কস বা নকল লেনিন হওয়া তাদের মনঃপুত নয়। ক্ষুদ্র হলেও তারা খাঁটি কিছু হতে চায়।

কিন্তু পথের বিভিন্নতা থাকলেও তাদের লক্ষ্যের সাম্য রয়েছে–সকলেই অমৃত তথা আত্মাকে চায়। যীশুখৃষ্ট যখন বলেন : For what is man profited if he shall gain the whole world, and lose his own soul?–তখন সংস্কৃতিকামীর অন্তরের কথাই বলেন। এই খ্রীষ্টবাণীরই ঔপনিষদিক ভাবান্তর হচ্ছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম'–যা দিয়ে আমি অমৃত লাভ করব না তা দিয়ে আমি কি করব ? অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এই তো সংস্কৃতি। এই জন্য সংস্কৃতিকে একটা আলাদা ধর্ম, উচ্চস্তরের ধর্ম বলা হয়েছে। প্রাণিজীবনের ঊর্ধ্বে যে জীবন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে, এবং তার দ্বারা প্রাণিজীবনকে

খণ্ডিত করে দিয়ে, তা মানুষের অন্তরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে। তাই বলে প্রাণিজীবনের তথা ক্ষুৎপিপাসার মূল্য যে তা দেয় না তা নয়। খুবই দেয়। Man does not live by bread alone–এই কথাটার মধ্যেই ক্ষুৎপিপাসার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে মর্যাদাভেদ আছে। যা নিয়ে বাঁচা যায়, আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সংস্কৃতিকামীদের ইচ্ছা : ক্ষুৎপিপাসার জগৎটি তৈরী করা হোক ক্ষুৎপিপাসার ঊর্ধ্বে যে জগৎটি রয়েছে তারি পানে লক্ষ্য রেখে। নইলে সংস্কৃতি ব্যাহত হবে। সংস্কৃতিকামীরা আরো কামনা করে : ক্ষুৎপিপাসার জগৎ তথা কল্যাণের জগৎ নির্মাণে লক্ষ্যের চেয়ে উপায়কে যেন কম বড় স্থান দেওয়া না হয়। কেননা উপায়ই চরিত্রের স্রষ্টা, লক্ষ্য নয়। একবার এক রকম চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেলে পরে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

হিমালয়ের চূড়ান্ত চূড়ায় যে ধনধারা আবদ্ধ হয়ে আছে, ভগীরথের মতো সমতল ভূমিতে নামিয়ে এনে তাকে সাধারণের ভোগের বস্তু করতে না পারলে যে জগতের মুক্তি নেই, সংস্কৃতিকামীরা এ কথা স্বীকার করে ; কিন্তু এই একটি সুরই তাদের জীবনে বেজে ওঠে না, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রসুরের সমারোহ দেখা দেয়। একসুরা, একঝোঁকা জীবন যে দীন জীবন, তা তারা জানে। বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত সুরের চমকে সিম্‌ফনি সৃষ্টি করতে না পারলে তারা খুশী হয় না। তাদের জীবনবীণাটি একতারা নয়, বহুতারসমন্বিত। তাই একত্ববাদে তাদের এতো আপত্তি। একত্ববাদী তথা মতবাদীরা অনেক সময় সূক্ষ্ম তারগুলিকে আমলই দিতে চায় না, অথচ প্রকৃত সংস্কৃতিকামীদের নজর সে-দিকেই। মতবাদীর সব চেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, একটি আদর্শের আলোকে সমস্ত কিছু দেখতে চায় বলে সে অব্‌জেক্‌টিভ তথা তন্ময় হতে পারে না। অব্‌জেক্‌টিভ হতে হলে নিজেকে লুকোতে হয়। মতবাদী, নিজেকে, তথা নিজের মতটিকে লুকোতে পারে না বলে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির আগার মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। সে কেবল নিজের মতবাদটিকেই খোঁজে, বারে বারে ফিরে ফিরে তার সেই এক কথা। বিভিন্ন ব্যাপারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন কি একটি ব্যাপারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে না জানলে যে জীবন দরিদ্র থেকে যায় তা সে বোঝে না। আদর্শের গোঁড়ামির দরুন সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে। তাই কান পাততে নয়, মুখ খুলতেই সে ভালোবাসে। অথচ কান পাতাতেই সংস্কৃতি, মুখ খোলাতে নয়। কান পাতার ফলে যখন লোকের মনের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি এসে আপনার অন্তরকে অজ্ঞাতসারে ভরে তোলে, তখনই আপনি অভাবিতের দেখা পান। মুখ খুললে শুধু 'ভাবিতে'র প্রকাশ। মতবাদী কান পাততে জানে না বলে অন্তরের দিক দিয়ে মরে যায়, যদিও হৈ-চৈ করে ব'লে ভাবে, সে-ই সব চেয়ে বেশী বেঁচে আছে। প্রবল ভাবে বাঁচা যে বাঁচা নয়, মৃত্যু। প্রচুর ভাবে, গভীর ভাবে বাঁচাই বাঁচা–সংস্কৃতিকামীই এ-সত্য উপলব্ধি করতে পারে, অপরে নয়। মতবাদ ঝড়ের মতো এসে জীবনের সমস্ত মুকুল ঝরিয়ে দেয়। সংস্কৃতি ঠিক তার উল্টো। দখিণ হাওয়ার মতো জীবনের সমস্ত ফুল ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। তখন কতো রং, কতো বৈচিত্র্য, কতো সৌন্দর্য। একসুরা, একরঙা জীবন মতবাদীর, সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা। Let us agree to differ–'ভিন্নরুচির্হি লোক:'–এই উক্তিতে মতবাদীর আস্থা কম। অথচ সংস্কৃতিকামীর কাছে এর চেয়ে শ্রদ্ধেয় বাণী আর নেই।

সাধারণ লোকের কাছে প্রগতি আর সভ্যতায় কোনো পার্থক্য নেই। যা সভ্যতা তা-ই প্রগতি, অথবা যা প্রগতি তা-ই সভ্যতা। কিন্তু কাল্‌চার্ড লোকেরা তা স্বীকার করে

না। উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে তারা সচেতন। প্রগতি তাদের কাছে মোটের উপর জ্ঞানের ব্যাপার। কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়। তাই জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই তারা প্রগতি মনে করে। প্রকৃতিবিজয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি। কিন্তু সভ্যতা শুধু প্রগতি নয়, আরো কিছু। প্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, হলে সভ্যতা হয় না। আর সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাপারটা তথা শিল্পের ব্যাপারটা–কেননা শিল্প, সৌন্দর্য ও প্রেমেরই অভিব্যক্তি–চিরন্তন ব্যাপার, প্রগতির ব্যাপার নয়। এ-সম্বন্ধে গিল্‌বার্ট মারের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য : Doubtless there is in every art an element of knowledge of science, and that element is progressive. But there is another element, too, which does not depend on knowledge and which does not progress but has a kind of stationary and eternal value, like the beauty of the dawn, or the love of a mother for her child, or the joy of a young animal in being alive, or the courage of a martyr facing torment. We cannot, for all our progress, get beyond these things ; there they stand, like light upon the mountains. The only question is whether we can rise to them. And it is the same with all the greatest births of imagination–চিরন্তনকে স্পর্শ করতে না পারলে সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। কেননা সভ্যতা 'ভ্যালু'র ব্যাপার, আজ 'নিউ ভ্যালু' ব'লে কোনো চিজ নেই। জীবনে সোনা ফলাতে হলে প্রগতিকে চলতে হবে সভ্যতার দিকে মুখ করে, নইলে তার কাছ থেকে বড় কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজকাল প্রগতি কথাটা যত্রতত্র শুনতে পাওয়া গেলেও সভ্যতা কথাটা এক রকম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। লোকেরা কেবল প্রগতি প্রগতি করে, সভ্যতার নামটিও কেউ মুখে আনে না।

অনেকে সংস্কারমুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্য নয়। সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির একটি শর্ত মাত্র। তাও অনিবার্য শর্ত নয়। অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। সংস্কারমুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব। মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির চেয়ে কুসংস্কার ভালো। শিশ্নোদর-পরায়ণতার মতো মন্দ সংস্কার আর কি হতে পারে? অর্থগৃধ্নুতাও তাই–কিন্তু এসব মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তিরই ফল। তাই শুধু সংস্কারমুক্তির উপরে আস্থা স্থাপন করে থাকা যায় না। আরো কিছু দরকার। কামের চেয়ে প্রেম বড়, ভোগের চেয়ে উপভোগ, এ-সংস্কার না জন্মালে সংস্কৃতি হয় না। সূক্ষ্ম জীবনের প্রতি টান সংস্কৃতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির টান সে দিকে নয়, তা স্থূল জীবনেরই ভক্ত।

সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে, সংস্কৃতি মানে সুন্দর ভাবে, বিচিত্র ভাবে, মহৎ ভাবে বাঁচা ; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা ; কাব্যপাঠের মারফতে, ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা ; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলীমায় বাঁচা ; গল্পকাহিনীর মারফতে, নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা ; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে, বিচিত্র-দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা ; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা ; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীর ভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

সংস্কৃতিবান মানুষ সমাজের কল্যাণ কামনা করে এবং সেজন্য প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চায় সে নিজের জীবনে সোনা ফলাতে। কেননা সেখানে তার অবাধ অধিকার। তাই জগৎকে মেরামত করার চেয়ে নিজেকে শোধরানোর দিকেই তার অধিক ঝোঁক। তার সমুখ দিয়ে কে যেন সর্ব্বদা গান গেয়ে যায় :

মন তুমি কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

জীবনে সোনা ফলাতে হলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব-মুক্ত হয়ে বিচিত্র জীবনধারণার সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া–নিজেকে বিশ্বের পানে মেলে ধরা, সংকুচিত ও সংকীর্ণ করে রাখা নয়। কবির যে প্রার্থনা–'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ'–তাতে সংস্কৃতিকামনাই ব্যক্ত হয়েছে। সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে মুক্তি, সকলের থেকে আলাদা হয়ে, সংকুচিত হয়ে, কূর্মের মতো আত্মগত হয়ে থাকা মুক্তি নয়, বন্ধন। 'জীবনে জীবন যোগ করা, নহিলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা', এই উক্তিটিও একই কামনার অভিব্যক্তি। পার্থক্য কেবল, ওখানে বাঁধনটা চাওয়া হয়েছে নিজের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের জন্য, এখানে সকলের দিকে তাকিয়ে এবং সকলের জন্য। বাঁধন, বাঁধন, বাঁধন। সকলের সঙ্গে বাঁধন পরাতেই সমৃদ্ধি, 'ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন ঝলমল প্রাণ করিস যাপন'–শিথিল বাঁধন না হলে 'ঝলমল প্রাণ' লাভ করা যায় না। আর ঝলমল প্রাণ লাভই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

শিথিল বাঁধনের অন্তরায় বলেই সংস্কৃতিকামীরা উগ্র জাতীয়তাকে এতো ভয় করে। সব দেশে তাদের যে ঘরটি রয়েছে, সেই ঘরটি তারা খুঁজে নিতে চায়। সকল দেশের, সকল জাতির, সকল কালের লোকই তাদের আত্মীয়। তারা বিশ্বনাগরিক, অনাত্মীয়তা, মানুষকে আপন না জানা, ধর্ম বা মতবাদের বিভিন্নতার জন্য মানুষকে পর ভাবা সংস্কৃতির মনঃপুত নয়। কেননা সংস্কৃতি মানেই অহমিকামুক্তি। অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকামীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অহংকার পতনের মূল কিনা তা সে বলতে পারে না, কিন্তু তা যে আনন্দের অন্তরায় সে-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। অহংকারী হওয়ার মানে নিজের চারদিকে বেড়া দিয়ে মানুষকে পর করা, আর মানুষকে পর করা মানে আনন্দকে পর করা। মানুষে-মানুষে মিলনেই আনন্দের জন্ম, বিরোধে নয়। বিরোধ আনন্দের শত্রু।

সংস্কৃতিসাধনা মানে ripe হওয়ার সাধনা। সে-জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রেমের। সংস্কৃতিবান হওয়ার মানে প্রেমবান হওয়া। প্রেমের তাগিদে বিচিত্র জীবনধারায় যে স্নাত হয় নি সে তো অসংস্কৃত। তার গায়ে প্রাকৃত জীবনের কটুগন্ধ লেগে রয়েছে ; তা অসহ্য। 'সবার পরশে-পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে', স্নাত না হ'লে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না।

অহমিকা—সৌন্দর্য-চেতনা—রবীন্দ্রনাথ

'রমজানের প্রার্থনা' প্রবন্ধে আপনি ইসলামের যে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সত্যই মর্মস্পর্শী। মুসলিম অমুসলিম সকলেরই লেখাটি ভালো লাগবার কথা। তবে মনে হয়, মুসলমানদের চেয়ে অমুসলমানরাই লেখাটির কদর করবে বেশী। কেননা, তারা যে সহজ মনুষ্যত্বের দৃষ্টি নিয়ে লেখাটির দিকে তাকাবে মুসলমানরা সে-সহজ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবে না। তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে 'আল্লার হুকুম' আর অহমিকাস্ফীতি, সত্যকার মনুষ্যত্বপ্রীতি নয়। (কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবহ, কিন্তু আসলে পরোধর্ম নয়, স্বধর্মই ভয়াবহ। কেননা, স্বধর্ম আমাদের মানতে হয়, পরোধর্ম হয় জানতে। আর জানা নয়, মানাই বন্ধন।) ইসলামের গুণগানে বড়াই-ই মুসলমানের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, মনুষ্যত্বের আগ্রহ নয়। 'যাহা নেই কোরাণে, তাহা নেই ভুবনে'—এ কথা প্রমাণ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অহমিকাতৃপ্তি।

ব্যক্তিগত অহমিকা আজ সকলের কাছেই নিন্দনীয়। নিজের বা বাপদাদার গুণগান করলে শ্রোতারা মনে-মনে হাসে। অথচ অহমিকার বালাই থেকে মুক্তি পাওয়াও কঠিন। তাই, ধর্মীয় অহমিকা, জাতীয় অহমিকার কাছে ধন্না দিতে হয়। কিন্তু তাতেও যে ব্যাপারটা ইতরতামুক্ত হ'য়ে সুন্দর হয়ে যায় তা নয়। বরং তাতে তার ইতরতা বাড়েই, কমে না। ধর্মীয় অহমিকা বা জাতীয় অহমিকার তাগিদে জগতে যত কুকাণ্ড হয়েছে, ব্যক্তিগত কি পারিবারিক অহমিকার তাগিদে তার শতাংশের একাংশও হয় নি। আমরা যখন প্রমাণ করতে লেগে যাই, ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর হজরত মহম্মদ জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, তখন তা অহমিকার তাগিদেই করি, মুনষ্যত্বের তাগিদে করিনে। করলে আমাদের চেহারা হ'ত অন্য রকম। তখন তাতে এমন একটা শ্রী নামত যে, সকলেই তার পানে চেয়ে খুশী হ'ত—সকলেই তাকে সৌন্দর্য কল্যাণের দিশারী বলে গ্রহণ করত। আয়োজন ঠিকই ছিল, উপাদানেরও কমতি ছিল না, কিন্তু যে-ভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, সেভাবে গৃহীত হয় নি বলে সব ভণ্ডুল হ'ল। বড়াই সত্যকে বাইরে রেখে দেয়, ভেতরে আসতে দেয় না, আনন্দই তাকে ভেতরে নিয়ে আসে, অথবা যখন তা ভেতরে আসে তখনই আমরা আনন্দিত হই—এ কথা ভালো করে বোঝার ওপরও নির্ভর করছে ইসলাম ও মুসলমানের জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু এ সহজ ব্যাপার নয়, দস্তুর মতো সাধনাসাপেক্ষ ব্যাপার। বহু বেদনায় তার জন্ম দিতে হয়। মনুষ্যত্বের পরিচয় চিহ্ন আনন্দ, অহমিকা নয়, এ কথাটা মনে রাখতে হবে। এখন আমরা ইসলামের মহৎবাণীগুলি নিয়ে বড়াই করি, মনুষ্যত্বের প্রেরণা পেলে সেগুলি নিয়ে করব আনন্দ। আর আনন্দ জীবনের জড়তা ঘুচিয়ে দিয়ে শক্তির বিকাশ ঘটাবে, নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির দ্বার খুলে দেবে। জীবনে তখন যে সাড়া জাগবে তার উদ্দেশ্য হবে মিলন, বিরোধ নয়। বিরোধ যদি করতেই হয় তো করব নিজের সঙ্গে—নিজের ভেতরে যে জড়তা ও অন্ধতা রয়েছে তার সঙ্গে।

মনুষ্যত্বের আগ্রহের আরেকটি লক্ষণ হবে, নিজের ধর্মের মতো অপর ধর্মের মহৎবাণীর প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত হওয়া, এবং ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনা না করা।

বিভিন্ন ফলের মতো বিভিন্ন ধর্মের স্বাদও আলাদা, আর আলাদা স্বাদের মধ্যে তুলনা চলে না। তুলনা জিনিসটাই মন্দ। তার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে। আর প্রতিযোগিতা যে অহমিকার সন্তান সে তো এক রকম জানা কথা। আপনার ঘোড়াটি না আমারটি আগে গেল–এ মনোবৃত্তির মতো অশ্লীল ব্যাপার আর কি হতে পারে? অথচ ধর্ম ও মহাপুরুষদের তুলনামূলক সমালোচনার বেলা আমরা সাধারণতঃ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকি তা অনেকটা এ ধরনেরই।

অহমিকা এক প্রকারের জড়তা। যাদের বুকে বিশ্বের স্পন্দন বাজে নি তারাই অহমিকার পরিচয় দিয়ে থাকে। অপরেরা তাকে শয়তানের মতো 'পরহেজ' বা বর্জন করে চলে।

ব্যক্তি বা জাতি যখন সম্বিতহারা হয়ে পড়ে তখন চেতনাসঞ্চারের জন্য অহমিকা-বাণীর দরকার হ'য়ে পড়ে। জাগরণের প্রাথমিক অবস্থায় সেটা শোভন। কিন্তু অধিক-কাল স্থায়ী হ'লে তার দ্বারা ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। 'ওঠো, জাগো, তোমার মতো আর কেউ নেই, তুমিই জগতের সেরা'–এ কথা বললে যে উন্মাদনা আসে তা দিয়ে বড় কিছু, সুন্দর কিছু সৃষ্ট হয় না। তা মানুষকে একটা খ্যাপামির মধ্যেই আটকে রাখে। তাই দরকার হ'য়ে প'ড়ে নববাণীর, আর সে নববাণী হচ্ছে খুশী হওয়ার আর খুশী করার বাণী। খুশী হওয়া আর খুশী করা পরস্পর নির্ভরশীল ব্যাপার। আমরা অপরকে খুশী করতে না পারলে নিজেরা খুশী হতে পারিনে, আর নিজেরা খুশী না হ'লে অপরকে খুশী করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষকে খুশী করার কায়দাটি হচ্ছে স্মিত হাসি হেসে তার কাছে যাওয়া। আমাদের খুশী যে অপরের ঠোঁটে হাসি হ'য়ে ঝরছে তা আমরা হালে টের পেয়েছি। তাই বিদ্বেষমুক্তি আমাদের কাম্য হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষের দ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে আমরা আর রাজি নই। গণতন্ত্রের দাবীও সেজন্যই। বিদ্বেষ মুক্তিই তার লক্ষ্য, যদিও বিদ্বেষ থেকেই তার যাত্রা শুরু।

অহমিকার বাণীর প্রয়োজন ছিল, এবং সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য লোকেরও আগমন হয়েছিল। তাঁদের কাজটি তাঁরা ক'রে গেছেন, এখন তাঁদের দিন ফুরিয়েছে। নতুন পরিবেশে নতুন লোকের, নতুন বাণীর প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে, 'ইগো' 'ই'-বর্জিত হ'য়ে মাথায় চন্দ্রবিন্দু চড়িয়ে কেবলই ছড়িহাতে সর্দারি ক'রে বেড়াচ্ছে। সে-সর্দারিতে কোনো শুভ-কামনা নেই, আছে কেবল স্বার্থসিদ্ধি আর কারদানী করবার স্পৃহা। তার ধরনধারণ দেখে দেশবাসী পীড়িতই হচ্ছে, প্রীত হচ্ছে না। এককালে যাকে তারা মঙ্গলের বাহন বলেই ধ'রে নিয়েছিল, তার ওপর আজ তারা আস্থা হারিয়ে বসেছে।

Being determines consciousness–নতুন পরিস্থিতি নতুন চেতনা নিয়ে এসেছে। দেশের বুকে নতুন আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়েছে। সে-চেতনা, সে-আকাঙ্ক্ষা যে সাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়। এখনো তা আভাসেই রয়ে গেছে। দেশবাসীর মনের এই নব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ভার নি· দেশের নব সাহিত্যিক-শিল্পী-সম্প্রদায়।

'তাদের কথা শোনাই ·াদের
আমার চোখে জল আসে।'

দেশবাসীর মনের কথা তাদের শুনিয়ে যেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা চোখের জলের স্বাদ লাভ করেন। কিন্তু তাও যেন করা হয় অনুরাগের তাগিদে, রাগের তাগিদে নয়। কেননা অনুরাগই

সৃষ্টি করতে পারে, রাগের সে ক্ষমতা নেই। লোকদেখানো সহানুভূতিই রাগের রূপ নিয়ে দেখা দেয়, সত্যিকার সহানুভূতি কখনো তা করে না। নীতি বা সহানুভূতির ছদ্মবেশধারী রাগকে তো আমরা যত্রতত্রই দেখতে পাই, তা দূরবীন দিয়ে খুঁজে বের করতে হয় না। রাগ প্রকাশের সুবিধা পাই ব'লেই আমরা অন্যায়কৃতকে শাস্তি দিতে ছুটে যাই, কিন্তু অন্যায়কৃতকে সান্ত্বনা কি শান্তি দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টাও করি নে। সত্যকার সহানুভূতি শান্ত, স্নিগ্ধ ও সমাহিত। তা আগুনের মতো দপ ক'রে জ্বলে ওঠে না, প্রদীপের মতো শান্তশ্রীমণ্ডিত হয়ে আলো দান করে। কিন্তু এ ধরনের সহানুভূতি খুব কমই মেলে, দপ্-ক'রে-জ্বলে-ওঠা সহানুভূতির নিদর্শনই বেশী। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তারি জয়জয়কার। রবীন্দ্রনাথের মতো সচেতন মনের শিল্পীও যে শিল্পের মাথায় নীতির লগুড়াঘাত ক'রে বলেছিলেন :

সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী নিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজ্‌দুরি।–

সেটা প্রয়োজনের তাগিদেই। তিনি অনুভব করেছিলেন, জনসাধারণের নামে যা হচ্ছে, তা সত্যিকার অনুভূতির তাগিদে নয়, ফ্যাসানের তাগিদে। আমাদের নবীন শিল্পী-সাহিত্যিকরা যেন এ উক্তির তাৎপর্যটা ভালো ক'রে উপলব্ধি করেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়, এর আগের উক্তিগুলিই তাঁরা মনে রাখেন, এ গুলি নয়। সেটা কি কাব্যসৌন্দর্যের তাগিদে না অন্য কারণে কে বলবে? বলাবাহুল্য, পরেরটুকু মনে রাখলেই তাঁদের লাভ, আগেরটুকু রাখলে নয়। আগেরটুকু করবে লোভসৃষ্টি, পরেরটুকু করাবে আত্মসমালোচনা। আর লোভ নয়, আত্মসমালোচনাই উন্নতির গোড়ায়।

'খুশী হওয়া' আর 'খুশী করা' ছোট্ট দু'টি কথা। কিন্তু ছোট্ট হলেও মূল্যহীন নয়। ঢাউস কথার পূজারীরা তাদের কোনো মূল্য দেবেন না, জানি, কিন্তু রসিকরা দেবেন। ক্ষুদ্র ফুলের পশ্চাতে থাকে যেমন বিরাট বৃক্ষের সাধনা, এদের সার্থক ক'রে তোলার জন্যও দরকার তেমনি বিপুল জীবনায়োজন। মানসিক শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন ও সার্থক নিয়ন্ত্রণ না হ'লে আমরা মানুষের ঠোঁটে হাসি ফোটাতে পারিনে, আর মানুষের ঠোঁটে হাসি ফোটাবার জন্য শক্তির উদ্বোধন না হ'লে তা দিয়ে সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের সম্ভাবনাই বেশী। ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই আমাদের কাম্য। মানবজীবনের সুন্দরতম ফসল হাসি। সেই হাসির চাষই আমরা করতে চাই, তাই বিদ্বেষকে পর করতে চাই, অহমিকাকে পর করতে চাই, প্রতিযোগিতাকে পর করতে চাই। কেননা, আমরা জেনেছি ও-তিন চিজের মতো হাসির শত্রু আর নেই।

(বজ্রের শক্তিও শক্তি, ফুলের শক্তিও শক্তি। যারা ফুলের শক্তির মূল্য না দিয়ে বজ্রের শক্তির গুণগান করে তারা তো স্থূলতার পূজারী। তাদের সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভালো।)

রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্বন্ধে আপনি যে সব কথা বলেছেন তা সত্যই ভেবে দেখবার মতো। রবীন্দ্রজয়ন্তী যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মোটের ওপর একটা উৎসবের ব্যাপার, যার

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি, কান পেতে আছি।

লক্ষ্য ফুর্তি–তার বেশী কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবন উন্নয়নের যে অপূর্ব উপাদান রয়েছে, সে-দিকে কারো লক্ষ্য নেই। রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিজের স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছি, নিজেকে রবীন্দ্রনাথের স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিনে। কেননা তা কষ্টসাধ্য, আর যা কষ্টসাধ্য তারি প্রতি আমরা বিমুখ। বড় কবিরা আসেন সাধারণ মানুষকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য–'কথারে ভাবের স্বর্গে মানবের দেবপীঠলোকে' উন্নীত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কবির ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, মানুষের ইচ্ছারও দরকার। ইচ্ছার অভাবে সুকাব্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও মানুষ নীচেই থেকে যায়, ওপরে আর উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণেরই জয় হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী যে নৃত্যগীতময় একটা উৎসবের ব্যাপার হ'তে চলেছে তা আর কতটুকু দুঃখের? তার চেয়েও গভীর দুঃখের বিষয় এ নয় কি যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রোপ্যাগান্ডার কাজে লাগান হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসা হচ্ছে না, আসা হচ্ছে অন্য দিকে তাকিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের সত্যকার মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়। নীতিও তিনি প্রচার করেছেন আর আদর্শের খোঁজও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা তাঁর আসল দিক নয়, সাময়িক বা অপ্রধান দিক। সে সবের দরুন রবীন্দ্রনাথের মূল্য অনেক বেড়ে গেলেও, তাঁর আসল মূল্য সেখানে নয়। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' জাতীয় কবিতায় তাঁর সাময়িক দিকেরই প্রকাশ, শাশ্বত দিকের নয়। শাশ্বত দিকের প্রকাশ 'উর্বশী' ও 'আবেদন' জাতীয় কবিতায়। সেখানেই আমরা তাঁর সৌন্দর্যময় আত্মাকে স্পর্শ করি। কিন্তু প্রচারপ্রিয়দের দ্বারা আহূত সভাগুলিতে (এখানে বলা দরকার, বেশীর ভাগ সভা এঁদের দ্বারাই আহূত হয়) এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসঞ্চারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি। উর্বশী তো তাদের কাছে একটা নৃত্যময়ী বাইজির চিত্র, তার বড়ো কিছু নয়। Personification of impersonal beauty নিরাকার সৌন্দর্য সাকারীকরণ, এ সব তো তাঁদের কাছে অর্থবিহীন পাগলের প্রলাপ। মোদ্দা কথা, কবি যে সকল কবিতা খোশমেজাজে ও বহাল-তবিয়তে লিখেছেন, সেগুলির দিকে তাঁদের নজর নেই, যে-সকল কবিতা সাময়িক উত্তেজনার বশে লেখা সেগুলির প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, যে-সকল কবিতার গোড়ায় সংস্কৃত অর্থে রাগ নয়, বাংলা অর্থে রাগ সেগুলিই তাঁদের প্রিয়। ফলে অর্ধবিদগ্ধ পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মর্ম-উপলব্ধি সম্ভব হয় না। আজকাল লোকেরা রবীন্দ্রনাথের রাগের কবিতাগুলিই আওড়ায়, অনুরাগেরগুলি নয়। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা সভাসমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন তাঁরা তাঁর সৌন্দর্যময় আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেন না। তাঁদের আলোচনায় 'সমাজচেতনা' কথাটা ঘুরে ঘুরে এলেও, 'সৌন্দর্যচেতনা' কথাটার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য তো একটা অশক্ত ক্ষয়কর ব্যাপার, তা দিয়ে জগতের কি লাভ? তা যত শীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এমনি একটা ভাব তাদের পেয়ে বসেছে, মনে হয়।

অথচ সৌন্দর্যচেতনা সত্যি-সত্যি অশক্তের নয়, শক্তিমানেরই ব্যাপার। কঠিন পাত্র না হ'লে যে রস ধারণ করা যায় না, সে তো আপনি আপনার এক অভিভাষণে বলেছিলেন। কথাটা যে আমার কি ভালো লেগেছিল তা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। সৌন্দর্য সাধনা সত্যি-সত্যি শক্তিমানেরই কর্ম। তার জন্য যে-সংযম, যে-ত্যাগ ও যে-অভিনিবেশ দরকার হয়, তার তুলনা নেই। সে-জন্য সৌন্দর্যস্বাদকে তথা

রসকে ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ব্রহ্মস্বাদের মতো সৌন্দর্যস্বাদও বলহীনের লভ্য নয়। পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের অধিকারীরাই তা পেয়ে থাকে। সমাজচেতনাবাদীরা বলেন, সৌন্দর্যচেতনা প্রগতির পরিপন্থী, একটা কৃত্রিম মানসিক সুখ সৃষ্টি ক'রে তা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে। আর যা ভুলিয়ে রাখে তা-ই বর্জনীয়। কিন্তু এ কথা বলে যে তাঁরা সমগ্র শিল্পের বিরুদ্ধে যান তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। শিল্প-সাহিত্য বোঝবার ক্ষমতা একপ্রকার ভোলবার ক্ষমতা বই কি! সে-ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা যেন নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান হন, রোগকে যেন তাঁরা স্বাস্থ্য ব'লে ভুল না করেন। অবশ্য তাঁরা বলবেন, আর্ট বিপ্লবের বা সমাজ-পরিবর্ত্তনের একটা হাতিয়ার মাত্র। যে-রচনা বিপ্লবের কাজে লাগে না, তার কোনো মূল্য নেই। সুতরাং তা বর্জনীয়। তাঁদের সঙ্গে আমরা তর্ক করতে চাইনে, কেননা, ভিন্ন রুচিহি লোকঃ। তবে এই বলব যে, আর্টের একটিমাত্র রূপকে বড় করে দেখা হ'লে তাতে কি আর্ট একটা একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না? আর ফলে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আর্ট বলে পূজিত এমন অনেক কিছুই কি আর্টের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় না?

যাক, সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা জগতের প্রগতি হয় না এ কথা মেনে নিলেও, তা দিয়ে যে জগতের উন্নতি হয় এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রগতি মানে সামনের দিকে যাওয়া, আর উন্নতি মানে ওপরে ওঠা। সৌন্দর্যচেতনাই আমাদের টেনে ওপরে তুলতে পারে ; আর কারো সে-শক্তি নেই। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মশাই একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। সেটুকু তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না :

"শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে—কেননা মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা। তার পরে আসে সত্যের জ্ঞান, এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্ম জ্ঞান, এবং আংশিক ভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়—এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ। সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা এ জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সমাজের গোড়ার কথা হলেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সৌন্দর্য্য তার অভ্রভেদী চূড়া। ... আমার ধারণা আমরা সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী, সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ, আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।"

কি চমৎকার উক্তি! এর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা আজ সত্যই বিরল। একপ্রকার ফিলসফি প'ড়ে প'ড়ে লোকের মন এতো নিচে নেমে যাচ্ছে যে, উঁচু ভাব সূক্ষ্মঅনুভূতির মূল্য দেওয়ার ক্ষমতাই তারা হারিয়ে বসছে। আর এই হারিয়ে বসার জন্য লজ্জিত না হ'য়ে গর্বই বোধ করছে। শিবজ্ঞানী হ'তেই তারা ভালোবাসে, সত্যজ্ঞানীও অংশত হতে চায়, কিন্তু রূপজ্ঞানী নৈব নৈব চ—হারগীজ নিস্ত।

সৌন্দর্যচেতনা সমাজচেতনার ঊর্ধ্ব। রসিকরাই তা উপলব্ধি করতে পারে, তাত্ত্বিকরা নয়। কেননা রসিকরাই জীবন সমুদ্রে ডুব দিতে জানে, তাত্ত্বিকরা জানে তার তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুণতে। রূপলোক ইন্দ্রিয় আত্মার প্রভু নয়, দাস। তাই রূপলোকে গমন আত্মার পক্ষে অবরোহন নয়, অধিরোহন। রূপলোকে ইন্দ্রিয়চেতনার পরিচয় পাওয়া গেলেও, ইন্দ্রিয়পরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। অসংযমীর জন্য রূপলোকের দ্বার রুদ্ধ।

কিন্তু সমাজচেতনাবাদীদের এ কথা বোঝান সত্যই কঠিন। তাঁরা ভোগের কথা বোঝেন, উপভোগের কথা বোঝেন না। লজিকের স্থূল অঙ্গুলি দিয়ে গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে যে সত্য বোঝান যায় না সে সত্যের মূল্য তাঁদের কাছে নেই। তাঁরা ফিলিস্টাইন, সূক্ষ্ম ও

বিচিত্র অনুভূতির জগতে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ। তাই তাঁদের আহূত সভায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধির চেষ্টা হয় না, হয় রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার ছদ্মনামে বিশেষ মতবাদ প্রচার। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। তাঁকে 'কাজে লাগান' হচ্ছে, তাঁর উদ্দিষ্ট রূপজগতে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে না। রবীন্দ্রজয়ন্তী যে নৃত্যগীতময় একটা উৎসবে পর্যবসিত হ'তে চলেছে তা কি এর চেয়ে কম মারাত্মক নয়? কথাটা আপনাকে এবং রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁরা সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। জয়ন্তী যখন একটা উৎসবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে রবীন্দ্রনাথের মনোময় দিকটার পরিচয় পাওয়া না গেলেও প্রাণময় দিকটার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরনের সভায় কিন্তু তারও অভাব।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এঁরা রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথের অপরিপূর্ণতা প্রমাণ করতে চান, এবং তাঁর অস্পষ্ট ভাবটি যে সব কবির কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। ভাবখানা এ রকম : রবীন্দ্রনাথ যা পারেন নি এঁরা তা পেরেছেন, অতএব রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এঁরা– ইত্যাদি। অবশ্য কথাটা বলার সাহস তাঁরা পান না, ইঙ্গিতে জানান।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচিত্রগতি হ'লেও, একটি ভাবের অভাব তাতে রয়েছে, সেজন্য তিনি নিজেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটা দুঃখ প্রকাশই, দীনতা স্বীকার নয়। তবু অনেকেই তাকে দীনতা প্রকাশের স্বীকার-উক্তি ব'লে ধ'রে নেন। রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গীর সত্যকার তাৎপর্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ মোটের ওপর এই বলতে চেয়েছেন : হায় হায়, আমার পাতে দশটা ব্যঞ্জন ছিল, আমি মাত্র ন'টা খেলাম একটা খেতে পারলাম না, আমি কি হতভাগ্য! এ কথা শুনে কেউ যদি ব'লে ওঠেন : মশাই, আপনি যেটা খেতে পারেন নি আমি সেটা খেয়েছি, সুতরাং কেয়াবাৎ, আমি আপনার ওপর টেক্কা মারলুম–তখন তাঁকে আর তাঁর সমর্থকদের অন্ধ ছাড়া আর কি বলা যায়? অথবা অন্যভাবে দেখতে গেলে, ক্লাসের প্রথম ছেলেটি দশটি অংকের মধ্যে নয়টিই রাইট করেছে, সময়ের অভাবে একটির উত্তর দিতে পারে নি, আরেকটি ছেলে সেই অংকটিই রাইট করেছে বাকিগুলো স্পর্শ করে নি। প্রথম ছেলেটির না-পারা অংকটি শুদ্ধ করার জন্য সে গর্বে ধেই ধেই নৃত্য করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষক তাকে সেই দশ-ই দেবেন, একশো নয়।

রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে ভোজের কথা এসে পড়ল ; ভালোই হ'ল। জগতের 'আনন্দ-যজ্ঞে' যে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, সে তো তিনি নিজেই ব'লে গেছেন। 'যজ্ঞের' জায়গায় 'ভোজ' : কথাটি আশা করি স্বচ্ছন্দেই ব্যবহার করা যায়। তাতে গাম্ভীর্য নষ্ট হলেও, অর্থের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বিচিত্র ভোজে যার নিমন্ত্রণ একটি বা দুটি পদে সে তার রুচিকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না, কিছু কিছু ক'রে সমস্ত পদের স্বাদই তাকে নিতে হয়। বিশেষ পদের কাছে দাসখৎ দিলে চলে না ব'লে নিজের ওপর কর্তৃত্ব রাখা আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। জীবনের ভোরে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি এক কর্তা। অনেক কিছুই তিনি গ্রাস করেছিলেন, কিন্তু কোনো কিছুর দ্বারা গ্রস্ত হন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

দেশী বিদেশী কত ভাব যে তিনি গ্রহণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কারো দ্বারাই তিনি সম্মোহিত হন নি। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ, ডারউইনীয় অভিব্যক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির নিদর্শন তাঁর রচনায় যথেষ্টই পাওয়া যায়, কিন্তু কখনো তিনি 'হেগেলীয়ান' বা 'ডারউইনিয়ান' বলে পরিচিত হতে চান নি। সকলই তাঁর খাদ্য, তিনি খেয়েছেন। কিন্তু

খেয়েছেন ব'লে যে খাদ্যের নামে পরিচিত হ'তে যাবেন, তার মানে কি থাকতে পারে? মুক্তভোগী ছিলেন তিনি। ভোগ যে কারাগার সদৃশ হ'তে পারে, তা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তখনকার একটি সনেটে দেখতে পাওয়া যায় :

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।

স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধ না আমায়,
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

ভোগের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে ভাবের ব্যাপারেও তা বলা যায়। ভাবও তো এক প্রকারের ভোগ।

এমন যে তাঁর প্রিয় ভগবান যার জন্য 'একটি কান্নাধন' সব সময়ই তাঁর অন্তরে ছিল, তাঁকেও তিনি চেয়েছিলেন আত্মশুদ্ধি ও আত্মউপলব্ধির তাগিদে, আত্ম-অবলুপ্তির তাগিদে নয়। দ্বৈতকে দূর করতে তিনি চান নি, চেয়েছিলেন পরমাত্মার স্পর্শে এসে নিজেকে মার্জিত করতে, নিজের ভেতরের আবর্জনা দূর করতে। আত্মবিলুপ্তি নয়, আত্মসৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য। সে জন্যই তিনি আল্লার চরণে মাথা নত করেছিলেন। মানুষের ভেতরে এমন ভাব, এমন অনুভূতি, এমন মাধুর্য রয়েছে, ভগবানের মতো সূক্ষ্ম সত্তার কাছে না এলে যার স্বাদ পাওয়া কঠিন। তাই তিনি তাঁকে অন্তরের প্রভু ক'রে তুললেন। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার এই যে, এখানেও তিনি কেবলামির পরিচয় দেন নি, আল্লাকে মনে রাখতে গিয়ে সংসারের বৈচিত্র্য ভুলে যান নি, বরং বৈচিত্র্যকে সুসমঞ্জস্য করে তোলবার জন্যই তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভগবানের দ্বারা অনুস্যূত করে বৈচিত্র্যের মালা পরিধানই তাঁর উদ্দেশ্য। ভগবান তাঁর কাছে দূরকে নিকটে করার পরকে আপন করার উপায় : সুতরাং জীবনেরই উপায়, মৃত্যুর নয়। আরো, আরো জীবন পাওয়ার জন্যই তিনি ভগবানের করুণা কামনা করেছিলেন।

এটাও কম লক্ষ্যযোগ্য নয় যে, ভগবানে অবস্থিতি তথা গীতাঞ্জলি গীতিমালা ও গীতালির যুগ তাঁর নিবাস নয়, স্বাস্থ্য-নিবাস। স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পর আবার তিনি সহজ মানবরসের দিকে ঝুঁকলেন। এ ভাবে নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এলেন বলে এ জন্মেই তিনি নানা জন্মের স্বাদ পেলেন–'আমার জীবনে ঘটালে তুমি জন্ম জন্মান্তর।' কিন্তু কোনো ভাবই তাঁকে একান্তভাবে বেঁধে রাখতে পারে নি। অথচ যাকে বলা হয় নতুনত্বের পূজারী তা তিনি কখনো ছিলেন না, মুক্তির কামনাই তাঁকে বারবার নতুনের কাছে এনে হাজির ক'রে দিয়েছে। সেজন্যেই তিনি 'বারে বারে নতুন ফিরে ফিরে নতুন'। রবীন্দ্রনাথ যে আপনাকে বলেছিলেন : ওদুদ তারিফ করো না, তারিফ করলে হয়তো কাল থেকে বারে বারে সে ছবিটাই আঁকতে থাকব–সে কথাটা আজ মনে পড়লো। মুক্তিকামী মানুষের মনের কথা বটে। আমাদের একটা ভাব বা টেক্‌নিকের তারিফ করা হ'লে আমরা সে-প্রশংসার মধু পান ক'রে বোকা ব'নে যাই, এবং রচনায় সে-টেক্‌নিক বা ভাবের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। তাই আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের বেশীর ভাগ রচনাই clap-trap বা করতালি-ফাঁদ। যুগের হাওয়ায় যে কথাটি ঘুরছে সেটি শুনতে আমরা কান পাতি, এবং পরে তারি প্রতিধ্বনি করতে থাকি। কথাটা সত্যি-সত্যি অন্তর ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসেছে কিনা তা একবারও ভেবে দেখিনে। Exploitation-এর নিন্দা করলেও আমরাও এক প্রকারের exploiter।

রবীন্দ্রনাথ যে কোনো বিশেষ ভাবের দ্বারা গ্রস্ত না হয়ে সমস্ত ভাবকে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন সেখানেই তাঁর জিত, আর আমরা যে বিশেষ ভাবের দ্বারা গ্রস্ত হ'তে চাই সেখানেই আমাদের হার। একটা মতবাদের কাছে মাথা নত করে কৈবল্য কামনা করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা সকলেই কেবলা। রবীন্দ্রনাথ আর যা-ই থাকুন কেবলা ছিলেন না। বিচিত্র জীবনের পূজারী রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হ'লে দরকার বিচিত্র জীবনবোধের, কেবলাদৃষ্টিভঙ্গীর নয়।

পরিশেষে আমি এই বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথকে আমি নীতিবিদ হিসেবে দেখিনে, সৌন্দর্যবিদ হিসেবে দেখি। কিন্তু তাতেও কি তাঁর সত্য পরিচয় দেওয়া হল? বিদ্ শব্দটি যখন সমাসের পরে আসে তখন তার মানে হয় বেত্তা অর্থাৎ যে জানে। রবীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্যবেত্তা বললে কিছুই বলা হয় না। তিনি সৌন্দর্যস্রষ্টা–রূপকারক। তাঁর কথায় সুন্দর ধরা দেয়, ভাব রূপময় দেহ ধারণ করে। সত্য হও, সুন্দর হও, আনন্দিত হও, এ ধরনের উক্তির মধ্যেই যদি রবীন্দ্র-রচনা পর্যবসিত হ'ত তো কে তাঁর মূল্য দিত? তাঁর শ্রেষ্ঠতা এখানে যে, তিনি এমন অপূর্ব কথা বলেছেন যার স্পর্শে অন্তরে সৌন্দর্য জাগে, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং চিত্ত সত্যের স্বাদ পায়। তাঁর সত্য abstract সত্য নয়, রূপময় সত্য, যে-সত্যের গুণগান করতে গিয়ে কবি Keats বলেছেন : A thing of beauty is a joy for ever–সে সত্য। যে যাদুদণ্ডের স্পর্শে সত্য ও সৌন্দর্য এক হয়ে যায় তা তাঁর ছিল। আজকালের ইন্‌টেলেকচুয়ালদের মতো তিনি মরা মানুষ ছিলেন না, জ্যান্ত মানুষ ছিলেন। বই তাঁর কাছে জগৎ ছিল না, জগৎই বই ছিল। সে বই তিনি নিত্য উপভোগ করতেন। তাই তাঁর কাছে এলে শুধু জগতের জ্ঞানই পাওয়া যায় না, স্বাদও পাওয়া যায়। যে-সত্য রূপ ধরে ওঠে নি তা নিয়ে দার্শনিকের কারবার, কবির কারবার রূপময় সত্য নিয়ে। নইলে তার মন ভরে না। আমাদের অন্তরে যে একটা রসলোক সৌন্দর্যলোক রয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার মায়াদণ্ড-স্পর্শে তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। তখন জীবনের যান্ত্রিকতা ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের ভেতরের অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করি। তখন কত রং, কত শোভা, কত বৈচিত্র্য। 'আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ তার অন্ত নাই গো নাই', এ খবরটা আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকেই পাই, আর এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠতা।

তবে তাঁর রচনায় যে, সমাজচেতনার পরিচয় নেই, তা নয়। যথেষ্টই আছে ; আর শুধু কল্যাণের টানে না এসে সৌন্দর্যের টানে আসায় তার মূল্যও অনেক। অন্ততঃ মূল্যবোধহীন সমাজচেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তা সত্ত্বেও তার শ্রেষ্ঠতা এখানে নয়, সৌন্দর্যসৃজনে। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা কাজে লাগাতে চান তাঁদের দৃষ্টি সে দিকে থাকে না। সেটা মস্ত বড় ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসৃষ্টিকে বড় করে না দেখে তাঁর কেজো কথাকে বড় করে দেখা আর নৃত্য-শিল্পীর নৃত্যকে বড় ক'রে না দেখে তার মঞ্চ ঝাঁট দেওয়াকে বড় করে দেখা এক কিনা (ছবিটা অন্নদাশংকর থেকে নেওয়া) তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

পাকিস্তানে কবি ইকবালকে রাষ্ট্রভিত্তি করে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় বা ভারতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনুরূপ চেষ্টা চলবে কিনা বলতে পারি নে। চললে দুঃখের অন্ত থাকবে না। তবে ভরসা এই যে, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতা রবীন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রভিত্তি হওয়ার দায় থেকে মুক্তি দেবে। তিনি এতো সূক্ষ্ম যে, রাষ্ট্রের মাটি চাপা দেওয়া হ'লেও সেখানে আটকে থাকবেন না–মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে মানব-লীলার

সঙ্গী হবেন, এবং নীতি হয়ে জীবনের গোড়ায় না থেকে মূল্যবোধ হয়ে জীবনের চূড়ায় থাকবেন। শা'জাহান বা মানবাত্মাকে সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন :

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনো দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;

সে-কথাটা ঈষৎ পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথকেও বলা চলে :

মহাকবি, কোনো মহারাষ্ট্র কোনোদিন
পারিবে না তোমারে ধরিতে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সৌন্দর্যের, আনন্দের, প্রেমের সঙ্গী হয়ে মানুষকে নব নব অনুভূতি ও কল্পনার স্বাদ পাওয়াবেন। তিনি লুকিয়ে-লুকিয়ে জীবনের মুকুলকে ফুলে, ফুলকে ফলে পরিণত করবেন। তাই তিনি মৃত্যুহীন। সত্যের মৃত্যু হয়, দর্শনের ধ্বংস ঘটে–একটা দর্শন আরেকটা দর্শনকে কেটে সামনে এগিয়ে চলে। কিন্তু রূপ চির-অমর। একবার সৃষ্ট হ'লে চিরকালের শিরোপা পেয়ে যায়। A thing of beauty is a joy for ever.

রবীন্দ্রনাথ যে একটা দার্শনিক বা রাষ্ট্রীয় মত দিয়ে গেলেন না সে জন্য অনেকে মুখ বাঁকায়। তিনি যে ডাঙর মাথার লোক ছিলেন না এটা নাকি তারি প্রমাণ। কিন্তু তা সত্য নয়। ডাঙর মাথা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও ডাঙর ছিল তাঁর আত্মা, আর তা ছিল অনুভূতি ও কল্পনায় ঠাসা। রবীন্দ্রনাথের আত্মার কাছে তাঁর বুদ্ধি নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েছে, কিন্তু অপরের বুদ্ধির কাছে নয়। তিনি ব্যারিস্টারি না করাতে যে জগৎ একজন সুচতুর আইনজীবী থেকে বঞ্চিত হয়েছে, 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের বাকদ্বন্দ্বই তার প্রমাণ। নিজেকে লুকিয়ে অপরের কথা বলার কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল সেখানে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়। তাই তাঁর রচনায় রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত নেই, আছে জীবনের রূপায়ণ–সৌন্দর্যসৃষ্টি। মত ঝরে যায়, সৌন্দর্য টিকে থাকে। তাই তিনি সৌন্দর্যের সাধনায় তন্ময় হয়েছিলেন। মানুষের মাঝে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, আর মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার সার্থকতম উপায় এই।

একব্যঞ্জনীদের পক্ষে বহুব্যঞ্জনী রবীন্দ্রনাথকে বোঝা কঠিন। অথচ তাঁরাই তাঁর জয়ন্তী পরিচালনার ভার নেন। ধার্মিকদের মতো তাদের মনও সরলীকরণের দিকে। সত্য তো একরকমের হবে, বিভিন্ন রকমের হবে কেন, এ কথা ভেবে তাঁরা বোকা ব'নে যান। জীবনের বিচিত্র ভোজে যাঁদের নিমন্ত্রণ নেই, তাঁদের যে এ দশা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

একব্যঞ্জনী প্রাগতিকরা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের ওপর জুলুম চালান তা নয়, অপরাপর সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও তাঁরা একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদের সাম্যনীতির জোয়ারে সব কিছুই একাকার হয়ে যায়। জারী-কীর্তন, বাউল-ভাটিয়ালি শুনি আমরা জীবনসংগ্রামের ধুলাবালি মুছে নিজেকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করে তোলার জন্য–নিজের ভেতরে যে চিরন্তন রসিক মানুষটি রয়েছে তার সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু লোকসঙ্গীত সম্মেলনে এসে আপনাকে হতাশ হ'তে হ'বে। সেখানে এসে দেখবেন জীবনসংগ্রামের ধুলাবালি সমানই উড়ছে হয়তো-বা আরো প্রবল ভাবে। (কেননা জীবনে যা ছড়ানো সুতরাং অতীব্র, শিল্পে তা-ই সংহত ও তীব্র রূপ পায়।) সব গানেরই

কথা এক, সুর আলাদা। জারী-কীর্তন, বাউল-ভাটিয়ালির দেহটিকে নেওয়া হয়েছে আত্মাটিকে বাদ দিয়ে। কথা সেই এক, থোড়বড়ি-খাড়া খাড়াবড়ি-থোড় ; সেই অন্নবস্ত্রহীনতার কথা, সেই সরকারের সমালোচনা। আপনি রুচিবান মানুষ, প্যারোডি মাঝে মাঝে শুনতে ভালোবাসেন, কিন্তু সমগ্র বৈঠকটাই যদি প্যারোডি হয় তো তা আর সইতে পারেন না। তাই রুচি আহত হয় ব'লে আপনি চ'লে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু আপনার এই চ'লে আসাটা ব্যাখ্যাত হয় বুর্জোয়া রুচিবিকার বলে।

এটা সংস্কৃতি সঙ্কট নয় কি?*

* কাজী আবদুল ওদুদকে লিখিত।

ব্যর্থতা জিন্দাবাদ

বৃদ্ধ ও তরুণ উভয়েরই নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করার এমন কি ভুল করার অধিকার থাকা চাই, নইলে সমাজে প্রাণদৈন্যের অবধি থাকে না। প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে–যেমন বিয়ে, বৃত্তি নিরূপণ, বন্ধুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে। যে জাতির তরুণরা এ সব বিষয়ে স্বাধীনতার পরিচয় দেয় না, সে-জাতি মৃত, তার কাছ থেকে দুনিয়া কিছু আশা করতে পারে না। সে পৃথিবীর বোঝা স্বরূপ।

মনে করুন নটের পেশা আপনার মনঃপুত, সেদিকেই আপনার প্রতিভা সহজ পথ খুঁজে পাবে বলে আপনার বিশ্বাস। কিন্তু আপনার গুরুজনরা তা পছন্দ করেন না। তাঁদের কাছে হয় তা নীতির দিক দিয়ে নিন্দনীয়, নয় সামাজিকতার দিক দিয়ে নিম্নস্তরের। তাই তা থেকে বিরত করবার জন্যে যত প্রকারের চাপ সম্ভব তাঁরা আপনাকে দেবেন। হয়, 'আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে আমরা তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করব' বলে তাঁরা আপনাকে শাসাবেন, নয়, 'কিছুদিনের মধ্যেই তুমি তোমার একগুঁয়েমির জন্য অনুতপ্ত হ'বে ব'লে ভয় দেখাবেন। কিন্তু আপনার দমলে চলবে না। হয়তো এ কথা ঠিক যে আপনার গলার স্বর খারাপ, অভিনয়ের প্রতিভা আপনার নেই। কিন্তু তা হলেও থিয়েটারে যোগ দিয়ে উপযুক্ত লোকের কাছ থেকেই তা জানা ভালো, অনুপযুক্ত লোকের কথায় কান পাতা ঠিক হবে না। সময়ের অপব্যয়ের কথা বলবেন জানি। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, এর পরেও বহু সময় হাতে থাকবে। অপচয়ের ভয়ে নিজেকে সংকুচিত করবেন না। জীবন যে ধনী, অপচয়ের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। এতএব ভাবনা কি? একেবারে নির্ভুল জীবন-যাপনের চেষ্টা ভালো নয়। প্রাণশক্তির অভাব ঘটে ব'লে তাতে জীবনে মর্চে পড়ে। অভিজ্ঞতা-সম্পন্নদের কথায়ই আপনি কান পাতবেন, অভিজ্ঞতাহীনদের কথায় নয়। আপনি আপনার পথটি অনুসরণ করে চললে মুরুব্বিরা একদিন-না-একদিন আপনাকে সমর্থন করবেনই–আপনি যত দেরীতে ভাবছেন তার বহু পূর্বেই। সুতরাং মা ভৈ, নিষেধের কথা ভেবে না-হক নিজেকে বিচলিত করবেন না।

আপনি কি জানেন না, সমাজ-মরু সবসময়ই প্রতিভাতরুর রস শুষে নিতে চায়, যখন পারে না, যখন শত নির্যাতন সত্ত্বেও তরুটি ফুল ফোটায়, তখনই সে বলে ওঠে : দেখ দেখ কেমন ফুল ফুটিয়েছি। যেন এই ফুল ফোটানোর বাহাদুরিটা তারই। সমাজের মতো বেহায়া আর কে আছে? আপনি যে পথে চলতে চেয়েছিলেন সে পথেই চলুন। দেখবেন সার্থক হ'লে পরিবারের লোকেরা আপনাকে গলার মালা করেই রাখবেন, না হ'লে অবশ্য ভিন্ন কথা।

কিন্তু সার্থক না হ'লেই যে আপনার জীবনটা বরবাদে গেল তা নয়। বরং আপনার মতো ব্যর্থ লোকেরাই সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যে সমাজে যত ব্যর্থলোকের বাস সে সমাজ তত ধনী। কেননা ব্যর্থতার কথাটাই সাধনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ব্যর্থলোকের সংখ্যা কম বলেই তো বাংলার মুসলমানসমাজ ব্যর্থ হল, বেশী বলে নয়। এ সমাজে যে ব্যর্থলোকের সংখ্যা কম আশাকরি কেউই তা অস্বীকার করবে না। আপনি কি বলবেন জানিনে, আমি তো দু'চারটির বেশী দেখতে পাইনে। আপনি হয়তো বলবেন, কি বললেন? বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই? হায় আল্লা, আপনি অন্ধ,

একেবারেই অন্ধ। আর আপনার অন্ধতার গোড়ায় রয়েছে আপনার রোমান্টিসিজ্‌ম। রোমান্টিসিজ্‌মের হিপ্‌নটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না, নইলে বলেন বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই, থাকলেও দুচারটি? না, আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা, আপনি একেবারে অবাস্তব। নইলে গরিবদের হাহাকারের কথা, আশান্বিত কর্মচারীদের নিরাশ হওয়ার কথা, নিশ্চয়ই জানতেন। কতো লেক্‌চারার যে প্রফেসর, কতো প্রফেসর যে প্রিন্‌সিপ্যাল, কতো প্রিন্‌সিপ্যাল যে ডাইরেক্টর বাহাদুর হতে পারলেন না তার খবর রাখেন কি? রাখলে বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই, এমন কথা কখনো মুখে আনতেন না। চারিদিকে যেখানে ব্যর্থতা জড়ানো সেখানে ব্যর্থ লোক দেখতে না পারার মতো অন্ধতা আর কি হতে পারে?

আমি বলব, আপনি যে-ব্যর্থতার কথা বলেছেন সে-ব্যর্থতার প্রতি আমার দৃষ্টি নেই। পাকিস্তান হওয়ার পরে যে-সব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট্ কমিশনার, কমিশনার গভর্ণর হতে না পেরে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছেন তাদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু আমি তাঁদের ব্যর্থতার কথা বলছিনে, বলছি সাধনার ব্যর্থতার কথা। সত্য সুন্দর বা কাল্পনিক কল্পনার ফলে যে-ব্যর্থতার আবির্ভাব হয় সে-ব্যর্থতার কথা।

সাধনা বাইরের দিকে ব্যর্থ হলেও ভেতরের দিকে কোনোদিন ব্যর্থ হয় না। বামন হয়ে যারা চাঁদের দিকে হাত বাড়ায় চাঁদের আলো কিছু-না-কিছু তাদের চিত্তে লেগে থাকেই। চাঁদকে তারা হয়তো পায় না, কিন্তু চাঁদের আলোকে পায়। যারা একটা বড় জিনিস চেয়ে ব্যর্থ হয়, তাদের অন্তরে সেই বড় জিনিসের ছাপ না থেকে পারে না। তাই ছোট ব্যাপারে সার্থকতার চেয়ে বড় ব্যাপারে ব্যর্থতা অনেক ভালো। তাতে করে মানুষটি বড় হয়—তার ভেতরে কালিমা-কলুষ দূরীভূত হয়ে সে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এই ধরনের সুন্দর মানুষের সংস্পর্শে এসেই সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। তাই বলেছি যে-সমাজে যত ব্যর্থলোকের বাস সে-সমাজ তত ধনী। (যে-বনে যত বেশী ঝরা ফুল সে বনে তত বেশী বসন্ত এসেছে মনে করতে হবে।) ব্যর্থলোকের সংখ্যা বাড়ার মানে কি? যারা সৌন্দর্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা প্রেমকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা সত্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, এক কথায় যারা সংস্কৃতিকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া।

সাধনার দ্বারা সোনা হতে চেয়ে যদি আপনি ব্যর্থকাম হন তো তাতে দুঃখ নেই। কেননা, সোনা না হলেও আপনি কষ্টিপাথর হবেনই। আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হওয়াটাও কম কথা নয়। কষ্টিপাথর হওয়ার দরুন সোনা কি চিজ তা আপনি সহজেই বলতে পারবেন। তাই সভ্যতাসৃষ্টির ব্যাপারে আপনার মূল্য অনেক—এমন কি প্রতিভাবানের চেয়েও বেশী। বেল সাহেব যখন বলেন, সভ্যতা প্রতিভার সৃষ্টি নয়, সমজদারির সৃষ্টি তখন ঠিকই বলেন। যে-সমাজে সমজদার যত বেশী সে-সমাজ তত বেশী সভ্য। সমজদারি মানে মূল্যবোধ। মূল্যবান শিল্প রচনা করলেও সব প্রতিভাবান মূল্যবোধের পরিচয় দেয় না। আর্ট সৃষ্টি করলেও অনেক সময় তা প্রাকৃতই থেকে যায়, আর্ট হয় না। তাদের রচনার পশ্চাতে থাকে একটা অন্ধ প্রেরণা, চক্ষুষ্মান প্রচেষ্টা নয়। সমজদারের বেলা কিন্তু বড় হয়ে ওঠে চক্ষুষ্মান প্রয়াস। সে যা হতে চায় তাই হয়, অন্ধপ্রেরণার তাগিদে কিছু হয় না। প্রতিভাবান একতরফা, একঝোঁকা, সমজদার বহুভঙ্গিম। বহু প্রতিভাকে হজম করেই সমজদার সমজদার। সে স্রষ্টা না হলেও ভোক্তা, ভোজ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন। প্রতিভাবানদের অনেক সময়ই সে চেতনা থাকে না। কাজেই প্রতিভা প্রকাশ করতে গিয়ে যদি আপনি ব্যর্থ হন তো তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। কেননা পরিণামে আপনি সমজদার হবেনই, আর সমজদার না হলেও নয়, হলেই সমাজের লাভ।

(প্রতিভাবান যে কখনো সমজদার হয় না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। হয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ আর ক'টি জন্মে ? বেশীর ভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ। তারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য কি বস্তু তা বলতে পারে না। তাই শিল্পী হলেও জীবনশিল্পী তারা হতে পারে না।) মানুষের দু'টো ক্ষমতা—নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিভাবানের, সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রসিকের বা সমজদারের। সাড়া দেওয়ার ক্ষমতার অনুশীলনেই জীবন শিল্পমণ্ডিত হয়।

জীবনের দু'টো শক্তি—নাড়া দেওয়ার শক্তি, আর সাড়া দেওয়ার শক্তি। নাড়া দেওয়ার শক্তি প্রতিভাবানের আর সাড়া দেওয়ার শক্তি সমজদারের। নাড়া দেওয়ার শক্তিটা খোদাদাদী, সমজদারের শক্তিটা সাধনা-লভ্য।

সমজদারি মানে মূল্যবোধের অনুশীলন। পিতার ধনে পোদ্দারি করার সুযোগ পায় না বলে সমজদারদের মূল্যবোধের অনুশীলন করতে হয়। তাদের সাধনায় সমাজে মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে। সেটা একটা মন্দ-নয় ধরনের লাভ নয়, বিশেষ লাভ। এরি ফলে সমাজ সাধ্যানুসারে ক্ষমতা লাভ করে। মানুষের চলার পথটি সহজ করে দেওয়া নয়; কঠিন পথটি আনন্দময় ক'রে তোলাই তার কাজ। শ্যামের বাঁশীর দিকে কান রেখে পথের কাঁটা দলে চলার কায়দাটি সে বাতলে দেয়।

অধুনা সমজদারি কথাটা ক্রিয়েটিভিটির চেয়ে কম মূল্য পেলেও, আসলে কম মূল্য নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে, সমজদারির হাতেই আত্মউৎকর্ষের ভার, ক্রিয়েটিভিটির হাতে নয়। ক্রিয়েটিভিটির হাতে কেবল আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা। ভেতরে যা আছে তা বাইরে ঠেলে প্রকাশ করে দাও, এই তার হুকুম, ভেতরটা মেজে ঘষে সুন্দর ও অনাবিল করে তোল, অন্তরাত্মার পুষ্টিসাধন করো, এমন কথা সে বলে না। এই যে ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশের তাগিদ এরি ফরাসী নাম 'এলাঁভাইট্যাল'। বর্তমান জগৎ এরি প্রভাবে গতিচঞ্চল। প্রগতি এরি সন্তান। কেবল ব্যস্ততা, কেবল তাড়াহুড়া, কেবল ঠেলাঠেলি, অন্তরে কোনো গভীরতরো প্রাপ্তির তাগিদ নেই। তাই, হালে কাল্‌চারের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ক্রিয়েটিভিটি কথাটা। গল্প কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির দ্বারা সকলেই মানুষকে চমকে দিতে চায়, শিল্প সাহিত্যের প্রভাবে এসে নিজেকে সুন্দর ও মহান করে তুলতে চায় কম লোকই। সকলেই চায় প্রতিষ্ঠা। বছর বছর অজস্র পুস্তক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে মানুষের তেমন উন্নয়ন হচ্ছে না তার হেতুও এখানে। মানসভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার দিকে ঝোঁক নেই বলে অধুনা মানুষের অন্তরজীবনটা ফাঁকা ও ফাঁপা হয়ে পড়ছে। গভীর অনুভূতিতে মূক হয়ে যাওয়ায়, নীরবতার গানে কানপাতার প্রবৃত্তি কারো ভেতরেই নেই। সকলেই চায় কেবল দিতে, নিতে নয়। প্রশংসা-লোলুপ লেখক আর পাঠকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। সকলের মুখে কেবল বিশ্বের কথা, নিজের কথা, নিজের অন্তরাত্মার কথা কেউ আর বলে না। কিন্তু যতই আমরা বিশ্ব-বিশ্ব করছি ততই যে অন্তরের দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছি, সে-দিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশ্ববুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্তরের নিঃস্বতা ঢাকবার একটা উপায়, এমনি মনে হয়। গভীরতরো প্রাপ্তির দিকে নজর নেই বলে রাজনীতির মতো সংস্কৃতি জিনিসটাও হৈ-চৈ-চর্চা হয়ে পড়েছে। সেখানেও দেখা দিয়েছে বুলিসর্বস্বতা। একটা আইডিয়ার প্রতিধ্বনি হয়ে চিন্তার বালাই থেকে মুক্তি পাওয়াই অধুনাতন সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

তাই পুঁথির প্রতাপ দেখে যখন মোহিতলাল শংকিত হন তখন তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই

বলার থাকে না। সত্যিই তো পুঁথি আজ জগদ্দল শিলার মতো মানুষের বুকের ওপর চেপে বসেছে, তার অন্তর বিকাশে সহায়তা করছে সামান্যই। ভূমাপ্রীতি তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল খণ্ডজ্ঞানে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে তোলা। তাই আত্মার উজ্জীবন আর হয় না। লেখক কি পাঠক কেউই রূপান্তর কামনা করে না, সকলেই চায় শক্তির জলুষ দেখিয়ে বাহ্‌বা পেতে। পাঠকদের যে গ্রহণ তাও যেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। কথা বলে লোককে চমকে দেওয়ার জন্যেই তারা বই পড়ে, আত্মপুষ্টির জন্য নয়। বই পড়ার দরুন বুদ্ধিরই কসরৎ হয়, আত্মার অনুশীলন হয় না। মুখে মুখে আধুনিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বুলি, ভেতরে একটা ছদ্মবেশ, অসভ্যতার ওপর সভ্যতার পলেস্‌তারা। সকলেই চায় বিশ্বকে পরিবর্তিত করতে, নিজের রূপান্তরের দিকে কারোই ঝোঁক নেই। অথচ বিশ্বের চেয়ে নিজের ওপরই যে আমাদের অধিকার বেশী, নিজেকেই যে সহজে বদলানো যায়, সে-কথাটা আমাদের মনে থাকে না। নিজেকে নীরবে ফুলের মতো বিকশিত করে তোলার আনন্দ আজ আর কেউ চায় না, সকলেই চায় সমারোহ প্রকাশ। করার দিকেই সকলের ঝোঁক, হওয়ার দিকে নয়। অথচ কাল্‌চারের উদ্দেশ্য যে কিছু করা নয়, কিছু হওয়া–সুন্দর হওয়া, প্রেমিক হওয়া, নবীন হওয়া–এতো এক রকম অবিসংবাদিত সত্য।

কিন্তু সচরাচর এই সত্যের প্রতি নজর রাখা হয় না বলে এক প্রকার সস্তা সংস্কৃতিতে জীবন ছেয়ে যায়। তাতে থাকে কেবল বুদ্ধির চটক, আত্মার গভীরতা নয়। তাই তা দিয়ে জীবনের দীনতা দূর হয় না। পুস্তক বাহুল্যের দরুন এই যে সস্তা সংস্কৃতি, এর অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি গ্যেটে বহুপূর্বেই ইংগিত করেছেন :

> আমরা যে যুগে বাস করছি, তাতে প্রকর্ষ এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, তরুণরা সে-সব পাচ্ছে যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ভাবে। কাব্য-দর্শন বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে, তারা সে-সব গ্রহণ করছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, মনে করছে সে-সব তাদের নিজস্ব সম্পদ, প্রকাশও করছে সে-সব সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু যুগের কাছ থেকে যা পেয়েছে তা যখন ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই যুগকে, তখন তারা হয়ে পড়ছে নিঃস্ব। তারা যেন ফোয়ারা, কিছুক্ষণের জন্য চলে তাতে জলের খেলা কিন্তু জল নিঃশেষিত হবার সঙ্গে হয় তার শেষ।*

আমাদের বেলাও তাই ঘটছে। যুগের জিনিস যুগকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে আমরাও নিঃশেষিত হয়ে পড়ছি। গভীরতরো প্রাপ্তির দিকে নজর নেই বলেই এমনটি ঘটে। নইলে জীবন এমন ফাঁকা হয়ে পড়তো না।

এই ধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য মানুষের দিকে তাকিয়ে গ্যেটে যে-নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক উক্তি করেছেন তাও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> মানুষ আরো সচেতন আরো কুশাগ্রবুদ্ধি হবে, কিন্তু থাকবে না তাদের মহত্ত্ব, সুখ, কর্মদক্ষতা, যদিও থাকে তবে বিশেষ বিশেষ যুগে। এমনকালের কথা ভাবতে পারি যখন ঈশ্বর মানুষে আর কোনো আনন্দ পাবেন না। তখন সব ভেঙ্গেচুরে তিনি গড়বেন নতুন করে। **

আল্লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার জীবন উপভোগ করবার জন্য। যদি উপভোগনীয় কিছুই না রইল তবে তাকে আর রেখে কি লাভ? আল্লা উপভোগ করেন মানুষের ভেতরের বেদনশীলতা আর তা বুদ্ধির ব্যাপার নয়, আত্মার ব্যাপার, তাই আত্মার তাগিদ তথা

---

* কবিগুরু গ্যেটে ২য় খণ্ড–কাজী আবদুল ওদুদ

** কবিগুরু গ্যেটে ২য় খণ্ড–কাজী আবদুল ওদুদ

সৌন্দর্যের তাগিদ। মহত্ত্বের তাগিদ যখন ফুরিয়ে যায় তখন মানুষে আর আল্লার রুচি না হওয়ারই কথা। আল্লা বেদনাহীন তথা মহত্বহীন জীবন পছন্দ করেন না।

('Man is not the last word of God' এ কালের ব'লে লেখক বার্নার্ড-শ'ও মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্যাক টু ম্যাথুশেলা'য়। আর হাকস্‌লির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লডে'র অনুপম চরিত্র 'স্যাভেজ'-এর সৃষ্টিও এই বেদনাহীনতার প্রতিবাদেই।)

যেখানে পশুমানুষটি তলিয়ে গিয়ে মানুষ-মানুষটি বড় হয়ে ওঠে না, যেখানে প্রতিযোগিতা, প্রতারণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিসমূহের জয়জয়কার সেখানে ক্রিয়েটিভিটি থাকতে পারে, কিন্তু সমজদারি নৈব নৈব চ–হারগীজ নিস্ত। রিফাইনমেন্ট সমজদারিরই দান, ক্রিয়েটিভিটির নয়। ক্রিয়েটিভিটির গায়ে অনেক সময় লেগে থাকে আদিমতার গন্ধ। তা দিয়ে বড় কিছু সৃষ্ট হলেও অনুপম কিছু সৃষ্ট হয় না। সমজদারির লক্ষ্য রূপান্তর–নিজেদের ভেতরের সুন্দর ও মহৎ মানুষটির উন্মোচন। যেখানে এই রূপান্তর নেই, সেখানে সমজদারি নেই, সেখানে আছে কেবল চমকলাগানো শক্তির প্রকাশ। সমজদারি তো আর ক্রিয়েটিভিটির মতো একটা হঠাৎ-আসা ব্যাপার নয় যে, জীবনের ওপর প্রভাব না রেখে চলে যাবে। তা সাধনালব্ধ ব্যাপার আর সাধনার প্রভাব থাকেই। ক্রিয়েটিভিটি কথাটায় শক্তির প্রকাশই বড়ো হয়ে ওঠে, আত্মমার্জিতি নয়। সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি যে আত্মসৃষ্টি, ক্রিয়েটিভিটি-বুলিবাদীদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের জীবন ও রচনা অসংস্কৃতির গন্ধমুক্ত হতে পারে না। জোয়ারের জলের মতো কোথাকার একটা শক্তি এসে তাদের তোলপাড় করে দিয়ে যায়, তারপরে যে-দীনতা সে-দীনতা। জীবনের ওপর রচনার কোনো প্রভাব থাকে না বলে তাদের জীবন আর ইতর জীবনে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। ক্ষণদ্যুতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা হয় শুধু রচনায়, জীবনে নয়। তাই জীবন ফাঁকা থেকে যায়। (অথবা ভুল বলেছি, জীবন কোনোদিন ফাঁকা থাকে না, আল্লা না থাকলে সেখানে শয়তান থাকেই, সুন্দর না থাকলে তা অসুন্দরের আস্তানা হয়ে পড়েই।)

সমজদারদের কিন্তু ভিন্নধারা। অপরকে চমকে দেওয়া নয়, নিজেকে খুশী ও সুন্দর করাই তাদের উদ্দেশ্য। তা বিনয়ের সন্তান, অহমিকার নয়। নিজের কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যে পীড়া বোধ করা সমজদারিরই পরিচয়। অপরেরা যেখানে গর্বে মাথা উঁচায়, সমজদাররা সেখানে লজ্জায় অধোবদন হয়। মিথ্যা ঔজ্জ্বল্যে তারা তৃপ্ত হতে চায় না, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ কিনতে তারা নারাজ। তারা চায় খাঁটি জিনিস। 'কৃত্রিমপণ্যে' যে জীবনের পসরা ব্যর্থ হয়ে যায় তা' তারা সবচেয়ে ভালো বোঝে।

বলেছি, সমজদারি ব্যর্থতার দান, প্রতিভা প্রকাশ করতে গিয়ে যারা ব্যর্থ হয় সাধারণতঃ তারাই সমজদার হয়। অকৃতকার্যতাটা এখানে শাপে বর হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যর্থতা জিন্দাবাদ না বলে উপায় নেই। ব্যর্থতার দিকে মানুষকে ডাকুন, সমাজ সমৃদ্ধ হবে। বড় কাজে হাত দিয়ে যারা ব্যর্থ হয় তারাই তো সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার : সমজদারও সৃষ্টি করে, কিন্তু সে বই নয়, শিল্প নয়, নিজের অন্তরাত্মা, আর অন্তরাত্মার চেয়ে বড়ো সৃষ্টি আর কি হতে পারে?

না, ব্যর্থতাকে ভয় করবেন না। সাহিত্যশিল্পের পথে পা বাড়ানো কি ব্যর্থতার পথে

পা বাড়ানো নয়? ও পথে সার্থকতা লাভ করে আর ক'টি লোক? কিন্তু যারা ব্যর্থ হয় তাদের জীবনেও এমন একটা মূল্যবান জিনিসের আবির্ভাব হয় যা না হ'লে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের ব্যর্থলোকের দ্বারাই সমাজে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। পলিমাটি ফেলে-ফেলে এরাই সমাজকে উর্বর করে দিয়ে যায়, তাই এদের মূল্য অনেক। শুধু ঢাউস নামের অধিকারীদের মনে রাখা তো অনেক সময় এক প্রকারের মোহ, সত্যকার সচেতনতার পরিচয় দেওয়া হয় এদের মনে রাখলেই।

এই যে সমজদার-সম্প্রদায়, এরা খুশী হওয়া আর খুশী করার মন্ত্রে দীক্ষিত। এদের সাধনা দুঃখ ভুলবার সাধনা, দুঃখ দূর করবার সাধনা নয়। মন ভোলাবার মন্ত্র এরা জানে। একটা বড় কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এরা নিজেদের অবিক্ষুব্ধ রাখে।

পরিশিষ্ট

ওপরে যে গতির কথা বলা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে। গতিকে না মানলে হয়তো চলে না, জীবনের জড়ত্ব ঘুচাবার ক্ষমতা তারি হাতে। কিন্তু অসহায়ের মতো কেবল গতিকে মানলে জীবনে কর্তৃত্ব থাকে না। গতির মধ্যে স্থিতিকেও জানতে হবে। আর তা সম্ভব হয় চিরন্তনকে উপলব্ধি করলেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাই করেন। গতি থেকে চিরন্তনকে ছিনিয়ে নিয়ে রূপায়িত করাই এঁদের কাজ। আর রূপায়ণ মানে স্থিরতা দান 'অসীমের সীমা রচনা করা।' অনন্ত কালপ্রবাহ এই যে স্থির ধ্রুবতারাবৎ সৃষ্টিসমূহ এরাই সংস্কৃতির উপাদান। এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েই আমরা মূল্যবোধের পরিচয় দেই।

কালপ্রবাহ অনবরত বয়ে চলেছে। বিরতিহীন তার গতি। কিন্তু এই চিরপ্রবহমান কালধারার বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে এমন কতিপয় লোক আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান, আলোক স্তম্ভের মতো নিয়ত সম্মুখে থেকে যাঁরা মানুষের পথচলাকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তোলেন। তাঁরাই মানববন্ধু। তাঁদের দানে জীবন ভরে তোলাই সমৃদ্ধি।

বুদ্ধদেব-কনফুসিয়াস-সক্রেটিস-যীশুখ্রিস্ট-হজরত মহম্মদ, কালিদাস-হাফেজ-শেকসপিয়ার-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ, কালের গর্জন অগ্রাহ্য করে এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো উন্নতশিরে। এঁদের উন্নতশীর্ষকে অন্তরে ধারণ করতে না পারলে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। তাই সংস্কৃতির জন্য অতীতের জ্ঞান এতো প্রয়োজনীয়। কেবল 'বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লাসি নৃত্য করলে' সংস্কৃতি হয় না। অতীতে মানস-পর্যটন প্রয়োজনীয়। অতীতেরই একটা রূপ আছে, বর্তমানের নেই। বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান, তাই রূপের সীমায় বাঁধা পড়ে না। অতীত রূপের সীমায় বাঁধা, সে একখানা ছবির বই। আর এই ছবির বইখানা হাতড়াতে-হাতড়াতে অন্তরে যে সৌন্দর্য, যে শ্রদ্ধা জাগে তাই সংস্কৃতি (বলা বাহুল্য, এখানে অতীতের সুহৃদ্ সম্মিত রূপের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, প্রভুসম্মিত রূপের প্রতি নয়। প্রভুসম্মিত রূপ যে অন্তরাত্মাকে চেপে রাখে, বিকশিত করে না, সে তো একরকম জানা কথা।)

এখানেই প্রগতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ বাধে। প্রগতি মানে কালের যাত্রাপথটি মসৃণ ও অব্যাহত রাখা। যেখানে-যেখানে অন্যায় অবিচারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজের সার্থক প্রকাশকে ব্যাহত করে সেখানে-সেখানে সেই আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে দিয়ে গতিধারাকে মুক্ত করাই প্রগতির কাজ। কিন্তু শুধু তা করলেই সংস্কৃতি হয় না। সংস্কৃতি মানে কেবল কল্যাণ নয়, সৌন্দর্যও। সৌন্দর্যই বেশী। অনেক সময় অকল্যাণকে বরণ করে নিয়েই সৌন্দর্যসাধন করতে হয়। আগে কল্যাণ পরে সৌন্দর্য এমন তর্ক খাটে না।

এই সৌন্দর্যসাধনের জন্য স্থিতির প্রয়োজন। দিনের চলমান অবস্থায় যে সৌন্দর্য আমাদের চোখে পড়ে না, রাত্রের স্থির অবস্থায় তাই মানসচক্ষে ফুটে ওঠে। তখন সৌন্দর্য আমরা শুধু দেখিনে, সৃষ্টিও করি, কেননা চোখের কাজের চেয়ে মনের কাজটাই তখন বড় হয়ে ওঠে। দিনে যে সৌন্দর্য চেতনের ওপর আলগা ভাবে পরশ বুলায়, রাত্রে তাই ফুটে ওঠে অচেতনের মায়ায় উজ্জ্বল হয়ে। গ্রহ-তারা দীপ জ্বালে যেন দিনের স্মৃতিকে মধুরতরো উজ্জ্বলতরো করবার উদ্দেশ্যেই। দিনে কাজ, ছুটাছুটি, রাত্রে ধ্যান,

কল্পনা। রহস্যের উপলব্ধি করা যায় রাত্রেই, দিনে নয়।

তাই দরকার স্থিরতার। কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে স্থিরতার প্রয়োজন অনিবার্য। স্থিরতার মানেই একটা অবস্থাকে মেনে নেওয়া, সেই অবস্থায় দুঃখবেদনা নিয়ে ছটফট না করা। সার্থক নেতৃসম্প্রদায় তাই সমাজকে এমন একটি কালের তীরে এনে পৌঁছে দেন যেখানে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসুৎ পাওয়া যায়। নইলে কেবল প্রগতির তাগিদে চলতে আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়। তখন সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টি আর থাকে না। কাঁটা তোলার কাজে অতিরিক্ত রত থাকার দরুন ফুল দেখার দৃষ্টিটা বেমালুম হাতছাড়া হয়ে যায়।

(কবীর 'বুত্‌শিকন'কে যে কথাটা বলেছিলেন এখানে তা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন : হে বুত্‌শিকন তুমি যে মূর্তি ভেঙে চলেছ তাতে তোমার ক্ষতিই হচ্ছে, কেননা তুমি কেবল মূর্তিই দেখতে পাচ্ছ আল্লাকে আর উপলব্ধি করতে পারছো না। তেমনি এ কালের প্রগতিবাদীদের সম্বোধন করে বলা যায় : হে প্রগতিবাদী সম্প্রদায়, তোমরা শুধু অন্যায়-অবিচারের কাঁটাই দেখলে পৃথিবীপুষ্পে সৌন্দর্য আর উপলব্ধি করতে পারলে না। তোমরা দুর্ভাগা।

বলা বাহুল্য, এখানে প্রগতির বিরুদ্ধে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রগতি কোথায় সৌন্দর্যের গায়ে হাত তুলতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রগতি আম দরবারের ব্যাপার, সংস্কৃতি খাস দরবারের। বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটা যেন না হয়।

কাঁটা তোলার ব্যর্থতা এখানে যে, কাঁটার অন্ত নেই। একভাবে না একভাবে তা দেখা দেবেই। তাই কাঁটা তোলার ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন আধুনিক কবির মুখে শুনতে পাই :

ফুল্লধরার কাঁটা তুলে তুলে আঙুল রাঙাবো কত,
আত্মঘাতীর মতো।
আমার ধরণী শ্যামা অপ্সরা
নাচে শিরে ধরি শোভার পসরা
কোথারে মৃত্যু কোথা তব জরা
এ দেখা দেখিব কবে?
অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে।*

এই যে সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টি, এ প্রগতির দান নয়, সংস্কৃতির দান। (ওস্তাদী গানের অনুশীলনে প্রগতির মাথাব্যথা থাকার কারণ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির আছে।) সংস্কৃতি সৌন্দর্যভুক। প্রগতি কল্যাণভুক। তাই কাঁটা বাছার কাজে জীবন যাতে সাঙ্গ হয়ে না যায় সে-দিকে নজর রাখতে হবে। মাঝে মাঝে জগতের দুঃখবেদনার কথা ভোলা ভালো। তাতে লাভ এই যে, নিজেকে আর কাঁটা করে তুলতে হয় না। ফলে অন্ততঃ একটা কাঁটা থেকে জগৎ মুক্তি পেয়ে যায়।

---

* রাখী–অন্নদাশংকর রায়।

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার

পেরিক্লিসীয় এথেন্‌স, রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি-দেশ, এই সভ্যতা-ত্রয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়–মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব। এই দুই বৈশিষ্ট্য যে সব সময় আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে তা নয়, প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার–প্রতি সভ্যতারই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এখানে প্রশ্ন হবে : মূল্যবোধ কাকে বলে, আর যুক্তিবিচার জিনিসটাই বা কি?–নিকটবর্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা–এ-সবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এ সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব। যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব বলতে বুঝায় জীবনের সকল ব্যাপারকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার প্রবণতা। যুক্তিবিচার সকলের ভেতরেই কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু এই সাধারণভাবে থাকা নয়, বিশেষ ও ব্যাপক ভাবে থাকার কথাই বলা হচ্ছে। এ যেন যুক্তিবিচারের পূজা, অর্থাৎ তার আদেশ-পালন, কার্যসিদ্ধির জন্য তার নামমাত্র ব্যবহার নয়। নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধিই যুক্তিবিচার ; স্বার্থের দাগ লাগা বুদ্ধিকে যুক্তিবিচারের সম্মান দেওয়া যায় না। তখন সে আর প্রভু নয়, গোলাম–আমাদের স্বার্থের মোট ব'য়ে বেড়ান তার কাজ। সচরাচর আমরা যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকি সে এই স্বার্থের মোটবওয়া গোলাবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।

বুদ্ধি কি করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে যত্রতত্রই তার নজির পাওয়া যায়–সেজন্য বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। সে দিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ধর্ম, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করছিলুম। কথায় কথায় একজন বলে উঠলেন : আরে ছেঃ? হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা আর তুলো না, তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। যারা আমাদের এতটা অবজ্ঞা করে যে, আমাদের নামগুলো পর্যন্ত শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে কি লিখতে পারে না, তাদের সঙ্গে মিল হতে পারে কি করে? অথচ দেখ না, আমরা কত সহজে তাদের নামগুলি, শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদের নামগুলো পর্যন্ত, লিখে যেতে পারি–কোথাও একটুকু বানান ভুল না করে।–উপস্থিত সকলেই কথাটায় সায় দিলেন, আমিও বাদ রইলুম না। কিন্তু নির্জনে চিন্তা করতে গিয়ে যখন নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধির আলোক লাভ করলুম তখন বুঝতে পারলুম ভুল হয়ে গেছে, না ভেবে-চিন্তে তখন কথাটায় সায় দেওয়া ঠিক হয় নি। মুসলমান যে হিন্দুর নামগুলো যথাযথ বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, সে মুসলমানের গুণ নয়, কেননা বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা, আর হিন্দুর নামকরণ সে ভাষাতেই হয়ে থাকে ; আর হিন্দু যে মুসলমানের নামগুলো বিশুদ্ধভাবে বানান ও উচ্চারণ করতে পারে না, সে হিন্দুর দোষ

নয়–কেননা মুসলমানের নামকরণ সাধারণতঃ যে দুটি ভাষায় হয়ে থাকে, সেই আরবী ও ফারসী ভাষা হিন্দুর মাতৃভাষা নয়। (হিন্দুর কথা না হয় থাক্, শতকরা ক'জন মুসলমান মুসলমানের নামগুলি–সে সবের মধ্যে নিজেদেরগুলোও অন্তর্ভুক্ত–ঠিক মতো বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, তা ভেবে দেখবার বিষয়।) অবশ্য ইচ্ছাকৃত ত্রুটি যে নেই তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

পরদিন কথাটা বন্ধুদের বললুম, কিন্তু তাদের অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দেখে ও সম্বন্ধে অধিক আলাপ করা আর সঙ্গত মনে হল না। সত্যের জন্য যাদের উন্মুখতা নেই, তাদের সত্য জানানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তর্ক করে লাভ নেই, তাতে খামখা মন বিগড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সত্যকে পাওয়ার আগ্রহ তলিয়ে গিয়ে জয়ের ইচ্ছাই বড় হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধির জগৎ ছেড়ে প্রাণের জগতে নেমে আসা স্বাস্থ্যকর। আমিও তাই করলুম। তর্ক ছেড়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলুম।

যাক, যা বলছিলাম। সংকীর্ণবুদ্ধি তথা যুক্তি তর্ক নয়, উদারবুদ্ধি তথা যুক্তিবিচার সভ্যতা, আর তার অভাবই বর্বরতা। তাই বুদ্ধিকে নিজের কাজে না লাগিয়ে নিজেকে বুদ্ধির কাজে লাগানো দরকার। নইলে বুদ্ধির শুভ্রতা নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অবনতি ঘটে। প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে। একই বুদ্ধি সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে মনীষার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, আবার মদ, মাৎসর্য, লোভ ইত্যাদি অসুন্দর বৃত্তির সংস্পর্শে এসে চালাকির নিম্নস্তরে নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর বুদ্ধিকে সাহিত্য, শিল্প ও বিশ্বচিন্তায় না লাগিয়ে ব্যারিস্টারী কাজে লাগাতেন তো তাঁর বুদ্ধির উন্নয়ন না হয়ে অবনতিই ঘটত এবং তিনিও মনীষীর মর্যাদা না পেয়ে একজন সুচতুর আইনজীবীর সম্মান লাভ করতেন। তা হলে বলতে পারা যায়, মানুষের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাচুর্য নয়, উৎকর্ষই গণনার বিষয়। কার কি পরিমাণ বুদ্ধি আছে, তা দেখে লাভ নেই ; কে কতখানি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করেছে, তাই দেখবার বিষয়। বুদ্ধির অপ্রতুলতা কি প্রাচুর্যের জন্য মানুষের নিন্দা কি প্রশংসা করা ঠিক নয়। কেননা, তা প্রকৃতির দান, আর প্রকৃতির খেয়ালের উপর কারো হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলেই বুদ্ধির পরিমাণ বাড়াতে পারিনে, কিন্তু উৎকর্ষ বাড়াতে পারি। শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবৃদ্ধি পরিমাণবৃদ্ধি নয়।

বুদ্ধিজীবীরা যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা পান না তার হেতুও এখানে। বুদ্ধির প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তাঁরা যে কারো চেয়ে কম যান তা নয়–হয়তো অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের বহু পশ্চাতেও ফেলে যান ; কিন্তু সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলেন না বলে উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁরা অনেক পেছনে পড়ে থাকেন। তাই প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনীষা আখ্যা তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। কেননা, সংস্কৃত-সুন্দর বুদ্ধিই মনীষা, অসংস্কৃত অসুন্দর বুদ্ধি মনীষা নয়–চাতুর্য। উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি নোংরামিমুক্ত, নির্মল আত্মার সরোবরে ডুব দিয়ে যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে ; আরেকটা নোংরা, কুশ্রী–ন্যাক্কার-জনকতার দরুন তার দিকে তাকানই যায় না। অসংস্কৃত, অসুন্দর বুদ্ধিকে সংস্কৃত ও সুন্দর করে তোলা শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য। না, ভুল বলেছি, শিক্ষার মানেই তাই। বিবিধ জ্ঞানানুশীলন সত্ত্বেও বুদ্ধির সংস্কার না হলে শিক্ষা সার্থক হয়েছে বলা যায় না। বুদ্ধির সংস্কার মানে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ; আর সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তির সংস্পর্শে এসেই মূল্যবোধের উন্মেষ হয়।

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব সামাজিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। নিরাপত্তার অভাবহেতু অসভ্যদের ভেবে-চিন্তে চলার সময় নেই। পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। সহজপ্রবৃত্তি যা আদেশ করে, তাই তারা নিরুপায়ের মতো 'যো হুকুম' বলে তামিল করে–সহজপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে যে মন তার কোনো খবরই রাখে না। তাই প্রয়োজনের কারাগারে তারা আবদ্ধ–অপ্রয়োজনের মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করতে অক্ষম। একটি সুন্দর সনেট যে একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমের চেয়ে মূল্যবান, এ ধারণা অসভ্যদের নেই। শুধু অসভ্যদের কথাই বা বলি কেন, নিম্নস্তরের সভ্যদের মধ্যেও এ ধারণার অভাব। যন্ত্র-বিদ্যার চেয়ে সুকুমার বিদ্যা শ্রেষ্ঠ–অন্নবস্ত্রের চিন্তায় অস্থির মানুষকে এ কথা বুঝাতে যাওয়া বাতুলতা। প্রয়োজনের নিগড়েই যাকে সারাক্ষণ আবদ্ধ থাকতে হয়, প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি নজর দেওয়ার তার সময় কোথায়? কাজ নিয়েই তার সময় কাটে, লীলারস সম্ভোগের অবসর জোটে না। তাই সভ্যতাসম্মত মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সভ্যতার জন্য অবসরের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত, আর নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্রী। যেখানে নিরাপত্তা নেই সেখানে মূল্যবোধ ও বিচারশীলতা নেই, আর মূল্যবোধ ও বিচার-শীলতার অভাব মানে–সুসভ্যতার অভাব।

নিরাপত্তা সভ্যতার সহায়। কিন্তু তাই বলে নিরাপত্তা অথবা তার উপায়কে সভ্যতা বলা যায় না। এই যে আমি নিশ্চিত মনে বসে বসে রচনা লিখছি, এর পেছনে রয়েছে পুলিশের অস্তিত্ব। পুলিশ না থাকলে তা কখনো সম্ভব হ'ত না–নিয়ত আমাকে পরিবার ও আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। কিন্তু তাই বলে পুলিশ সভ্যতা নয়, সভ্যতার রক্ষক মাত্র। গোলাপের সঙ্গে কাঁটার যে-সম্বন্ধ সভ্যতার সঙ্গেও পুলিশের সেই সম্বন্ধ–উভয়ই আত্মরক্ষার উপায় নয়। তবু সঙ্গীন-বন্দুক, কামান-বারুদকে অনেকে সভ্যতা বলে ভুল করে।

প্রকৃতিবিজয়ের ফলে যা আসে তা সভ্যতা নয়, আত্মমার্জিতির ফলে যা পাওয়া যায়, তা-ই সভ্যতা। প্রকৃতিবিজয়ের মত্ততাহেতু মানুষ আত্মমার্জনার কথা একরকম ভুলেই যাচ্ছে। তাই মনে হয়, প্রকৃতিবিজয় মানুষের জীবনে আশীর্বাদের মতো না এসে মহাঅভিশাপের মতোই আবির্ভূত হয়েছে। বিজিতের চরণে সেলাম ঠুকে' বিজেতা অসহায়ের মতো দাসখৎ দিতে দ্বিধা করে নি। ফলে মূল্যবোধ তিরোহিত হ'ল, বিচারবুদ্ধি স্বার্থসিদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো বড় কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পেল না। অতএব, বলতে ইচ্ছে হয়, প্রকৃতিবিজয় না হলেই যেন ভালো হ'ত; কেননা, তা' হলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্য কোনো সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত এবং ধ্যান-কল্পনার পূজা করে ইতরতামুক্ত হ'তে পারত।

মনে রাখা দরকার, যা দিয়ে বাঁচা যায় তা সভ্যতা নয়, যার জন্য বাঁচা হয়, তা-ই সভ্যতা। তাই ভাত-কাপড়ের যোগাড়কে সভ্যতা না বলে সৌন্দর্য ও আনন্দের আয়োজনকেই সভ্যতা বলা সঙ্গত। মূল্যবোধের অভাবে মানুষ এ কথা উপলব্ধি করতে পারছে না বলে ক্রমবিকাশ ব্যাহত হচ্ছে–মানুষ যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করার এই শাস্তি। এই শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। মূল্যবোধের সচেতনতা মানে সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা।

কিন্তু আনন্দ আজ অবজ্ঞাত, আরাম তার স্থান দখল করে বসেছে। আরামের আয়োজনকেই আনন্দের আয়োজন মনে করে লোকে ভুল করছে। ও দু'বস্তু যে এক চিজ নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, সে-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে না পারলে সমূহ ক্ষতি। আনন্দ মানসিক ব্যাপার, আরাম শারীরিক। আরামের জয়ে শরীরেরই জয় হচ্ছে।

মন বেচারী কোণঠাসা হয়ে কোনোপ্রকারে দিনগুজরান করছে মাত্র। তার দিন ফিরিয়ে আনতে না পারলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ, সংগ্রাম আরামের জন্যই হয়ে থাকে, আনন্দের জন্য হয় না। আনন্দ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর নয়, আরাম একান্তভাবে বস্তুনির্ভর। আর বস্তুর জন্যই যুদ্ধ। তাই পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করতে হলে আরামের চেয়ে আনন্দ তথা শরীরের চেয়ে মনকে বড় করে তোলা দরকার। নইলে যুদ্ধবিরতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৃষ্টিভঙ্গীই ইষ্টানিষ্টের মূল। তাই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন তথা মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মূল্যবোধ লক্ষ্য, সমাজপরিবর্তন উপলক্ষ, এ-কথাটা ভালো করে মনে রাখা চাই। নইলে সমাজপরিবর্তন আমাদের বেশী দূর নিয়ে যেতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাঁরা বলেন, সমাজপরিবর্তন হলে মূল্যবোধ আপনা-আপনি সৃষ্টি হবে, সেজন্য পূর্ব থেকে সচেতনতা বা প্রয়াসের প্রয়োজন নেই, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনে এই জন্য যে, মনুষ্যত্বকে তাঁরা যতটা সস্তা মনে করেন আসলে তা ততটা সস্তা তথা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেজন্য সদাজাগৃতির প্রয়োজন; আর মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা সদাজাগৃতির লক্ষণ। মনুষ্যত্বকে যাঁরা সমাজপরিবর্তনের by product মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

মূল্যবোধের অভাবের দরুন আসলকে নকল, নকলকে আসল, লক্ষ্যকে উপায়, উপায়কে লক্ষ্য মনে করছি। তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কোন জিনিসের উপর কোন জিনিস স্থাপিত হওয়া দরকার, কোনটা জীবনের পাদপীঠ, কোনটা শিরোপা, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অন্নবস্ত্রের আয়োজন আনন্দ-উপভোগের উপায় না হয়ে আনন্দ-উপভোগই অন্নবস্ত্র উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা যখন সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তখন বিজ্ঞের মতো বলে থাকে : আরে একটু আনন্দ-উপভোগ না করলে কর্ম-উদ্যম বজায় থাকবে কি করে? আর কর্ম-উদ্যম বজায় না থাকলে আমরা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব কোন উপায়ে?–যেন কর্মউদ্যম বজায় রাখবার জন্যই আনন্দের প্রয়োজন, তার নিজস্ব কোনো সার্থকতা নেই। উপায়কে লক্ষ্য আর লক্ষ্যকে উপায় করে দেখার এ চমৎকার নিদর্শন। বিজ্ঞন্যন্যরা 'আনন্দ' কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আসলে তারা যা বুঝাতে চায় তা হচ্ছে 'ফুর্তি'। জীবনের গভীরতার সঙ্গে পরিচয় নেই বলে আনন্দ কী বস্তু, তা তারা ধারণা করতেই পারে না। পারলে তাকে উপায় না করে লক্ষ্যই করতো।

বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবন বড়, এ-ই মূল্যবোধের শিক্ষা। তাই বাইরের জন্য ভেতরকে, স্থূলের জন্য সূক্ষ্মকে বলি দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপুত নয়। সুকুমারবৃত্তির বিকাশেই জীবনের চরিতার্থতা, স্থূল ভোগে নয়–এই বিশ্বাস আছে বলে সূক্ষ্ম উপভোগের দিকেই তার ঝোঁক। প্রয়োজনের দাবীর চেয়ে অপ্রয়োজনের দাবিই তার কাছে বড়। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনের দাবীও সে অস্বীকার করে না। দেহের জন্য আত্মা বিক্রয় যেমন তার কাছে মহা অপরাধ তেমনি প্রয়োজনবোধে জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় না করাও মহাপাতক। বেঁচে থাকার দাবীই তার কাছে সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় সমর্থন করলেও সাংসারিক উন্নতির জন্য আত্মা বিক্রয় সে কোনোদিন সমর্থন করে না। সে জানে সংস্কৃতির যদি কোনো শত্রু থাকে তো সে এই সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা। কেননা, সংস্কৃতির মানে সুকুমারবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধন, আর সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা শিলাবৃষ্টির মতো সুকুমারবৃত্তির বিকাশ-উন্মুখ মুকুলগুলিকে ছিন্নভিন্ন

করে দিয়ে যায়। আগে জীবন পরে সংস্কৃতি এ কথা সে মানে, কিন্তু আগে সাংসারিক উন্নতি পরে সংস্কৃতি এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা সংস্কৃতি-কামনাকে এমনভাবে দাবিয়ে রাখে যে, তা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না–আলো-হাওয়ার স্পর্শবঞ্চিত ফুলের মতো অবচেতনের অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে যায়। লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়। ধন আর মন এক সঙ্গে যায় না। ধনকে যে চেয়েছে মনকে সে পর করেছে, আর মনকে যে কামনা করেছে ধন তার দিকে ফিরেও তাকায় নি–এতো সচরাচরই দেখতে পাওয়া যায়। তাই লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডারকে সমভাবে বেঁটে দেওয়ার উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। অতিভোগ ও ভোগহীনতার পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার এ-ই একমাত্র পথ। কিন্তু তা করতে হবে সরস্বতীর প্রতি দৃষ্টি রেখে, লক্ষ্মীর দিকে নজর রেখে নয়। ধনসাম্যের উদ্দেশ্য হোক সার্বজনীন সরস্বতী পূজা : তবেই তা মানুষের সত্যিকার মুক্তির বাহন হতে পারবে। বলা বাহুল্য, লক্ষ্মী মানে কল্যাণ আর সরস্বতী মানে সৌন্দর্য। কল্যাণের জগৎ থেকে সৌন্দর্যের জগতে গমন প্রাণের পক্ষে অধিরোহণই, অবরোহণ নয়। আর কল্যাণের জগতে থেকে যাওয়াকে অবরোহণ বলা গেলেও অধিরোহণ বলা যায় না। তাই কল্যাণকে সৌন্দর্যের বাহন করে তোলা দরকার, নইলে প্রগতি একটা তাৎপর্যহীন বাত–কি–বাত হয়ে দাঁড়ায়।

মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে দু'টি কারণে। প্রথমত, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হতে চলেছে, আর আমেরিকা জাত হিসেবে স্থূলবুদ্ধি। গভীর জীবনের স্বাদ তারা পেতে চায় না। তারা যা চায় তা আনন্দ নয়, ফুর্তি। ভোগেই তারা পটু, উপভোগ নয়। ছন্দো ও সুষমাময় জীবন তারা কল্পনাই করতে পারে না। সমস্ত দিন ব্যাংকের লেজারের উপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব মিলান আর সন্ধ্যাবেলা সুরামত্ত হয়ে সারাদিনের পরিশ্রমজনিত দুঃখ লাঘবের প্রয়াস–এ-ই তাদের কাছে 'জীবন'। কোনো প্রকার গভীর অনুভূতি কি সুন্দর কল্পনা তাদের জীবনে সাড়া জাগাতে পারে না। সুখের আত্যন্তিক প্রয়াস যে সুখের অন্তরায়, এ-ধারণা তাদের নেই। অর্থকামনার চাকার নিচে জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলি মাড়িয়ে দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই আমেরিকা সভ্য হয়েই রইল, সুসভ্য হতে পারলে না। অবশ্য এ সব কথা বলবার অধিকার আমার নেই এবং বলতুমও না যদি বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তাশীলদের রচনার সঙ্গে পরিচয় না ঘটত। রাসেল তো মাঝে মাঝে আমেরিকার প্রতি রাগে লাল হয়ে ওঠেন। তাঁর দুঃখ এই যে, আমেরিকার মনোবৃত্তি সমগ্র পৃথিবীর মনোবৃত্তি হতে চলেছে–অচিরে সমস্ত দেশগুলো আমেরিকার মতো আনন্দবোধহীন ও স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়বে, এমন কি, এমন যে তাঁর প্রিয় দেশ চীন–যা তাঁর মতে চিন্তার স্বাধীনতা ও জীবনবোধের দেশ–তাও বাদ পড়বে না। কেননা, সকল দেশই আধুনিক হতে চলেছে, আর আধুনিক হওয়া মানে মার্কিন হওয়া। মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমেরিকার প্রভাবে পৃথিবীর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী। তাই সাবধান হওয়া দরকার।

আত্মিক ব্যাপারে অতৃপ্তি ভালো, তা জানার সীমানা ডিঙিয়ে অজানার রাজ্যে উঁকি দেওয়ার প্রেরণা জোগায়। কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে অতৃপ্তিবোধ মারাত্মক, তা আত্মার সৃজনীশক্তিকে পঙ্গু ও অথর্ব করে রাখে–তাকে স্বচ্ছন্দগতি হতে দেয় না। A dissatisfied Socrates is thousand times better than a satisfied pig—এই উক্তিতে যে অতৃপ্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তা এই আত্মিক অতৃপ্তি–divine discontent–বস্তুগত অতৃপ্তি নয়। আত্মিক অতৃপ্তি এক প্রকারের সুখ–পরমবেদনা, বস্তুগত অতৃপ্তি নির্জলা দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় না, ব্যাহত করে। তাই তা পরিত্যাজ্য। A happy man is he who knows what he wants. বস্তুত কী চাই, তা ভালো করে

জানা থাকলে মানুষ সহজেই সুখী হতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমেরিকানদের তথা আধুনিকদের অভাববোধের অন্ত নেই। তারা কেবলই 'আরো চাই' 'আরো চাই' করছে। কী তাদের দরকার, কী না হলেও চলে, তা জানা নেই বলে সব কিছুই তারা চায়, আর সব কিছু চাওয়া মানে জীবনে দুঃখকে দাওয়াত করা। অভাবের মাত্রা বাড়িয়ে চলা আর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে চলা এক কথা। বস্তুসাধনার উদ্দেশ্য বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া। প্রবল বস্তুসাধনা সত্ত্বেও আমেরিকা বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে না এই উদগ্র ক্ষুধার জন্য। 'আরো চাই' 'আরো চাই' মনোবৃত্তি তাকে উন্নত ও সুন্দর জীবনের স্বাদ পেতে দিচ্ছে না। অমৃতের কামনা নেই বলে সে কেবলই বস্তুর দাস হয়ে পড়ছে। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য This far and no further–এই পর্যন্তই, এর বেশী নয়–এই বাণীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে জাতি বা দেশ শুধু মুখে উচ্চারণ করে নয়, জীবনে, রূপায়িত করে এই বাণী প্রচার করবে, তার দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হবে। অতিভোগ ও ভোগহীনতার বর্বরতা থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তারই আছে। কিন্তু একটি কথা, তারও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, আমরা নতুন রাষ্ট্রের অধিবাসী আর নতুন রাষ্ট্র ও যুদ্ধকালীন রাষ্ট্র মূল্যবোধকে তলিয়ে দিয়ে প্রয়োজনবোধকে উপরে তুলে ধরে। যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশের দাবিকে ভয়ের চোখেই দেখা হয়। তাই তাকে দমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের জন্য জানকোরবানের বাণীকে লোভনীয় করে তুলে ধরা হয়। বাক-চাতুর্যের দ্বারা বীরত্ববোধ ও উগ্র স্বদেশপ্রেমের কাছে আবেদন জানান হয় বলে বুদ্ধিবৃত্তি সহজেই কাবু হয়ে পড়ে–সমালোচনাশক্তি একেবারেই পঙ্গু হয়ে যায়। আরে ছেঃ ছেঃ নিজের জীবনটা ভোগ করতে চাও? নিজের জীবন তো সকলেই ভোগ করে ; তাতে কী মহত্ব আছে? মহত্ব রয়েছে জীবন দেওয়ায়। যদি জাতির জন্য, ধর্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য জীবন দিতে পারো তো বুঝব তোমার ধমনীতে দামী রক্ত প্রবাহিত, নইলে আর তোমার জীবনের মূল্য কী?–ব্যস্ তরুণ সম্প্রদায়কে বোকা বানাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো সমরানলে পুড়ে মরবার জন্য অমনি তারা দলে দলে ছুটে চলবে। তাদের এই প্রাণদানে জগতের কতটুকু লাভ হবে, তা একবারও ভেবে দেখবে না। সত্যি বলতে কী, যুদ্ধ জিনিসটা তরুণ সম্প্রদায়ের বোকামির উপর নির্ভর করেই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। আবেগের প্রাবল্য কমিয়ে দিয়ে তারা যদি একটুখানি সচেতনবুদ্ধির চর্চা করত, তবে তা বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যুদ্ধে যে তরুণদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি আবেগের প্রাবল্যের দরুন তারা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারে না।

যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রের এই চিত্র। নতুন রাষ্ট্রের চিত্রও অনেকটা এরই মতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকলে এখানেও যুদ্ধের বাণী বড় হয়ে ওঠে, নইলে কর্মের বাণী প্রাধান্য লাভ করে। কর্ম করো, কর্ম করো–হে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ। নিজের ভোগের দিকে না তাকিয়ে অনবরত রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে চলো। ওই যে গোবরে পোকা, সেও তো নিজের জন্য জীবনধারণ করছে। তা হলে তার জীবনে আর তোমাদের জীবনে পার্থক্য কোথায়? নিঃস্বার্থ কর্মই মনুষ্যত্ব। অতএব, স্বার্থলেশহীন হয়ে কাজ করে যাও, স্বার্থের কথা ভেবে না-হক জীবনকে কলঙ্কিত করো না।–কর্মের বাণীর সঙ্গে একটা মতবাদ বা আদর্শও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মানুষকে আত্মচেতনাহীন করে তুলবার উদ্দেশ্যে। তখন পুতুল-নাচের পুতুলের মতো তাকে যদৃচ্ছা চালনা করা সহজ হয়ে পড়ে।

নতুন রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় ত্রুটি এই যে, তাতে সুকুমারবিদ্যার চেয়ে কেজোবিদ্যা প্রাধান্য লাভ করে, আর কেজোবিদ্যা ধীরে ধীরে সুকুমারবৃত্তির ধারগুলো বেমালুম ভোতা

করে দিয়ে মানুষকে অনুভূতিহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করে। কেজোবিদ্যার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই, তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে যদি সুকুমারবিদ্যাকে গলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তার গদিটি দখল ক'রে বসতে চায় তো আপত্তি না জানালে অন্যায় করা হবে। শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য জীবন-উপভোগের ক্ষমতাবর্ধন। কেজোবিদ্যার দাবী বড় হয়ে উঠলে সে-উদ্দেশ্যটি চাপা পড়ে যায়–শিক্ষা জীবনার্জনের উপায় না হয়ে জীবিকা উপার্জনের উপায় হয়ে ওঠে। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের অভাবে বর্বরতার সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না–মানুষ আত্মিক জগতে উন্নীত হয়ে বস্তুজগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। আনন্দই আমাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে নিয়ে যেতে পারে–বস্তুর সে ক্ষমতা নেই–প্রয়োজনের তাগিদে নতুন রাষ্ট্রের কর্তারা সে কথাটা ভুলে যান। তাই নতুন রাষ্ট্রে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

চূড়ার দিকে নজর রেখেই গোড়ার কথা ভাবা দরকার, নইলে গোড়াতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়–চূড়ায় ওঠা আর সম্ভব হয় না। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে নজর রেখেই রাষ্ট্র গড়ে তোলা দরকার, নইলে শেষ পর্যন্ত তা মানুষের মুক্তির উপায় না হয়ে বন্ধনের রজ্জু হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের পুতুল পূজার জন্য মানুষের জন্ম হয় নি। মানুষের বিকাশের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। অতএব, লক্ষ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়া দরকার। নতুবা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। মানুষের বিকাশের জন্যই রাষ্ট্র আর মুক্তি মানে বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে সৌন্দর্য ও আনন্দলোকে উন্নয়ন। মানুষ ব্যক্তি হিসেবে অনেকদূর এগিয়ে গেছে–সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে তার অভিযান চলেছে, কিন্তু জাতি হিসেবে সে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে নি। রাষ্ট্রের কাজ বস্তুর বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে মানুষের ক্রমবিকাশে সহায়তা করা। এ-ব্যাপারে কেজো-বিদ্যার দান অপরিসীম। কিন্তু মুক্তির মানে কেবল বস্তুর থেকে নিষ্কৃতি নয়, আরও কিছু। বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে ধ্যানকল্পনার জগতে যেতে না পারলে সত্যিকার মুক্তিলাভ হয় না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, কান্তিবিদ্যা ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে মানবমনের যে ক্রমিক উন্মোচন, তারি নাম মুক্তি। এ-ব্যাপারে সুকুমারবিদ্যার একচেটে অধিকার, কেজোবিদ্যা এখানে দাঁত ফুটাতে পারে না। তাই সুকুমারবিদ্যার এত প্রয়োজন। সুকুমারবিদ্যাকে অবজ্ঞা করা আর মূল্যবোধহীনতার পরিচয় দেওয়া এক কথা।

যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধের যে খুব পার্থক্য আছে, তা নয়। মূল্যবোধকে যাচাই করে নেওয়ার পদ্ধতিই যুক্তিবিচার। একই বস্তু অনুভূতিলোকে একরূপ, বুদ্ধিলোকে অন্যরূপ লাভ করছে, এই যা প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই মূলতঃ এক। মূল্যবোধকে সংশ্লিষ্ট যুক্তিবিচার, আর যুক্তিবিচারকে বিশ্লিষ্ট মূল্যবোধ বললে ভুল বলা হবে না। তাই যুক্তিবিচার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা সঙ্গত মনে হল না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনমান নয়, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারই জীবনসমৃদ্ধির পরিমাপক। এই দুই গুণের পরিচয় যিনি যত বেশী দিতে পেরেছেন, তিনি তত বেশী উন্নত বলে পরিগণিত হয়েছেন–যুগে যুগে, কালে কালে মানুষ তাঁরি মহিমাকীর্তন করেছে ও করবে। তাই তাদের জয় কামনা করে আমি বক্তব্য সমাপ্ত করছি। যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধ–এই দু'টি কথা আমাদের জপমন্ত্র হোক ; তা হলেই আমরা বর্বরতামুক্ত হয়ে সুন্দর ও সুসভ্য হতে পারব–চাই কি, যাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ দিব্যসত্তা, তার সঙ্গেও আমাদের মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

মূল্যবোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলেও কী মূল্যবান, কী মূল্যবান নয়–সে-সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছুই বলা হয় নি–সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। এখানে সে অভাবটুকু পূরণ করবার চেষ্টা করছি। প্রথমতঃ বলা দরকার, মানবজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো ব্যাপারকেই মূল্যহীন বলা যায় না। তবে মূল্যের কমবেশ আছে। তাই মূল্যবোধের মানে মূল্যের কমবেশ সম্বন্ধে ধারণা। সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায় : প্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বেশী। কেননা, প্রয়োজনীয় জিনিস দেহের তৃপ্তি মাত্র, আত্মার তৃপ্তি নয়–আত্মার তৃপ্তি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে। তাই একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমের চেয়ে একটি সনেটের মূল্য বেশী। এখন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এ-দুয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কী করে? যা না পেলে তীব্র দুঃখ, কিন্তু পেলে মামুলি সুখ, গভীর আনন্দ নয়, তা-ই প্রয়োজনীয় ; আর যা না পেলে তেমন দুঃখ হয় না, কিন্তু পেলে গভীর আনন্দ, তা-ই অপ্রয়োজনীয়। নিচের দৃষ্টান্তগুলোর দিকে নজর দিলেই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হবে। ভাত না খেলে তীব্র দুঃখ অনুভূত হয়, কিন্তু খেলে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় না। একটা সুন্দর সনেট না পড়লে দুঃখ নেই, কিন্তু পড়লে খুশীতে মন ভরে ওঠে। দৈনিক পত্রিকা না পড়লে দিনটা মাটি হল বলে মনে হয়, কিন্তু পড়লে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। একটা ভালো সাহিত্যের বই না পড়লেও চলে, কিন্তু পড়লে মন আনন্দে নেচে ওঠে–জীবনকে সার্থক বলে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে হয়। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তা আর দেওয়া হল না। তা হলে দেখতে পাওয়া গেল, যা না হলে চলে না তা-ই কম মূল্যের, আর যা না হলেও চলে তা-ই বেশী মূল্যের। অথবা অন্যভাবে দেখতে গেলে, যা শারীরিক অথবা নিম্নস্তরের মনের ব্যাপার (যেমন দৈনিক পত্রিকা-পাঠ) তারি মূল্য কম, যা মানসিক তারি মূল্য বেশী। শারীর-ব্যাপার বলে কামের মূল্য কম, আত্মার ব্যাপার বলে প্রেমের মূল্য বেশী। তবে প্রেম বলে আলাদা কিছু বোধহয় নেই, কামই যখন আত্মার রঙ লেগে সুন্দর ও শালীন হয়ে ওঠে তখনই তা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম কামেরই ঊর্ধ্বমুখীন সুন্দর প্রকাশ। তাই জঠরের চেয়ে কাম বড়ো– Sex is more spiritual than belly. আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে কামের ঊর্ধ্বগতি আছে, জঠরের নেই। তাই কাম এতো কাব্য-সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে, জঠর হয় নি। জঠর মানে ইতর ব্যাপার, তার সৌন্দর্য নেই। কেবল টিকে থাকবার জন্য তার প্রয়োজন। কিন্তু কাম ইতর ব্যাপার নয়, শ্রদ্ধেয় ব্যাপার। সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মহত্ত্বের সঙ্গেও। শ্রদ্ধেয় ব্যাপার বলেই তার বেলা এতো আঁটাআঁটি, এতো সাবধানতা। পূজালয়ে প্রবেশ করতে হলে যে শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন, এখানেও তাই আবশ্যক। *

(এই নিবন্ধে জীবনের বাইরের কোনো ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নি। জীবনের ভেতরেই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, সুন্দর-অসুন্দর রয়েছে তারি প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) জীবনশিল্পের মানেই এই উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতনতা। জীবনশিল্পীরা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়কে মেনে নিয়ে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে দেয়। মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। প্রয়োজনের দিকটা প্রধান দিক হলেও যে শ্রেষ্ঠ দিক নয়, শ্রেষ্ঠ দিক অপ্রয়োজনের দিক, কেননা তাতেই মানুষের মুক্তি–এই বোধ না থাকলে সত্যকার জীবনশিল্পী হওয়া যায় না।

---

* বলা হয়েছে, জঠর ইতর ব্যাপার। তাই মানুষকে ইতরতামুক্ত করতে হলে জঠরের সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

সমাজশিল্প জীবনশিল্পের বনিয়াদ। আর জীবনশিল্প মূল্যবোধেরই অভিব্যক্তি। দার্শনিক যাকে superstructure বলেছেন, তার গোড়ায়ও মূল্যবোধ। তাই তা অবহেলিত হওয়ার মতো জিনিস নয়। বরং superstructure-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই main structure গড়ে তোলা দরকার। নইলে সমাজ-পরিবর্তন মানুষকে বেশী দূর এগিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। গ্রিসে superstructure (সৌন্দর্যজগৎ) প্রাধান্য লাভ করেছিল।** রিনেসাঁসের ইটালিতেও। কিন্তু তাদের main structure তথা কল্যাণের জগৎ ত্রুটিবিহীন ছিল না। অনেক নিষ্ঠুরতা ও ব্যভিচারের কাহিনী তাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। অধুনা কল্যাণের জগৎটি যথাসম্ভব ত্রুটিবিমুক্ত ও নিষ্কলুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা চলেছে। সে ভালো কথা। কিন্তু superstructure-এর দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। কেননা, তা-ই সভ্যতা। আর সভ্যতা আপনা-আপনি সৃষ্ট হয় না, তার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের প্রয়োজন।***

** শিল্প ও জ্ঞানের জন্য যদি পৃথিবীতে কোনো জাতি বেঁচে থাকে, তবে তা গ্রিক জাতি। গ্রিসে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হয় ভাস্কর, নয় ভাস্করের সহকর্মী ছিল। আর্ট ও কালচার তাদের কাছে উপরি পাওনা ছিল না, ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই তারা চমৎকার সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

*** কয়েক বছর আগে ক্লাইভ বেলকে অনুসরণ করে বিভিন্ন পত্রিকায় আমি সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। সেগুলোতে বেল সাহেবের কথাই বেশী, আমার কথা সামান্য। বর্তমান প্রবন্ধে বেল সাহেবের কথা সামান্য, আমার কথা বেশী। তথাপি প্রেরণা ক্লাইভ বেল থেকে নেওয়া হয়েছে স্বীকার করা দরকার। নইলে বিবেকদংশনের জ্বালা ভোগ করতে হবে।

রিনেসাঁস: গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী

রিনেসাঁস কথাটার শব্দগত অর্থ পুনর্জন্ম অর্থাৎ পুরাতনে ফিরে যাওয়া, অথবা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া ; কিন্তু ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানবমহিমা তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রিনেসাঁসের ইতিহাস তাই জীবন-সূর্যের পুনরোদয়ের ইতিহাস–বুদ্ধি ও কল্পনার জয়যাত্রার ইতিহাস।

য়ুরোপের ইতিহাস থেকে কথাটি নেওয়া হয়েছে। অতএব একবার সে-দিকে তাকান দরকার।

য়ুরোপের মধ্যযুগ শাস্ত্রশাসনের যুগ–পোপের সর্বময় প্রভুত্বের যুগ। বুদ্ধিবিচার, অনুভূতি-কল্পনা প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের প্রতি এ-যুগ আস্থাহীন। জগত ও জীবনের প্রতি এ-যুগের বিস্ময়-দৃষ্টি নেই, বরং এ সবকে তা পতনের ফাঁদ বলেই গণ্য করে। সৌন্দর্য ও প্রেম, এ সব তো শয়তানের কারসাজি, সুতরাং এদের জব্দ করা আর শয়তানকে জব্দ করা এক কথা। তাই চলল আত্মবিকাশের পরিবর্তে নিদারুণ আত্মনির্যাতনের পালা। আর এই নির্যাতনে-নির্যাতনে ক্ষীয়মাণ মানবাত্মা পরিণামে বিদ্রোহী হ'য়ে প্রশ্ন করলে : এ কি সত্যি? এই জগত ও জীবন, এই প্রেম ও সৌন্দর্য এ সব কি সত্যই মিথ্যা? এই সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি তাকে নিয়ে গেল সত্যের সোনার সিংহদুয়ারে, সে বুঝতে পারল জীবন-চর্চাই জীবনের উদ্দেশ্য, আর প্রেম-সৌন্দর্য-কল্পনা ও বিচার-বুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক যুগের সুপ্রভাত। মানবমহিমা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়ে এই উজ্জ্বল প্রভাতের সৃষ্টি করল।

জীবনপ্রীতির এই সোনার ফসল ফলল গ্রীক জ্ঞানচর্চার ফলে। গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের গোড়ার কথা যে দেহকেন্দ্রিক জীবনপ্রীতি, এ এক রকম সাধারণ সত্য। কিন্তু তাই বলে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ফিরে পাওয়াকেই রিনেসাঁস বললে ভুল করা হবে, যেমন ভুল করা হবে উপায়কে লক্ষ্য বা লক্ষণকে আসল বস্তু বলে গ্রহণ করা হলে।

অতএব পুরাতনে ফিরে যাওয়াই রিনেসাঁস নয়, জীবনপ্রীতি তথা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনাপ্রীতিই রিনেসাঁস। ওয়ালটার পেটার বলেন : রিনেসাঁস কথাটা আজকাল কেবল শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য-প্রীতি না বুঝিয়ে এমন এক জটিল আন্দোলন বুঝায়, গ্রীক-জ্ঞানপ্রীতি যার একটা দিক বা লক্ষণ মাত্র। তাঁর মতে রিনেসাঁসের যুগ বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর প্রতি আগ্রহশীল এক উদার জীবনের যুগ। কী পুরাতন, কী নতুন, বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর খোঁজে এ যুগ চঞ্চল। অবশ্য গ্রীসের প্রতি এ যুগের দৃষ্টি বিশেষ ও অধিক। তার হেতুও আছে ; জীবন-প্রীতির এমন উজ্জ্বল সূর্য গ্রীস ছাড়া আর কোথাও উদিত হয় নি! তাই জ্বলন্ত আদর্শের জন্য সে-দিকে না তাকিয়ে তার উপায় ছিল না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রিনেসাঁসের সূত্রপাত ধরা হয়, আর ইটালিকে তার জন্মভূমি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তার পূর্বেও রিনেসাঁসের খোঁজ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকের ফরাসী দেশেও রিনেসাঁসের মতো

একটা কিছু ছিল।* শাস্ত্রশাসনমুক্ত, হৃদয় ও প্রেমের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা জীবন-দর্শন এ-যুগের আঁধার আকাশে রাত্রিশেষের শুকতারার মতো উজ্জ্বল। প্রভেন্স কবিতায় তার দৃষ্টান্ত মেলে।

পণ্ডিতপ্রবর আবেলার্ডের প্রেমকাহিনী আর আমিস্ ও আমিলের প্রাবাদিক বন্ধুতার গল্প হৃদয় ও বুদ্ধির মুক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ; অকাসিন্ ও নিকোলেতের প্রেমকাহিনীও তাই। প্রথম দুটি বীর্যে আর তৃতীয়টি মাধুর্যে মণ্ডিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর আলোকপন্থীদের যে-কঠোর বিরোধিতার ভিতর দিয়ে গিয়ে বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে হয়েছিল মধ্যযুগের আবেলার্ডকে তার চেয়ে কম বিরোধিতার ভিতর দিয়ে যেতে হয় নি। আলোকপন্থীদের আলোর পিপাসায় যে দুঃখের আবির্ভাব, আবেলার্ডের জীবন সেই দুঃখে জর্জরিত, তবু অপরাজিত মন নিয়ে ঝড়ঝাপটা-বিধ্বস্ত মহীরুহের মতো তিনি দণ্ডায়মান। প্রেম ও জ্ঞানের এমন সুন্দর সমন্বয় স্বল্পই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী তিনি, প্রেমের জন্য নির্যাতনকে পরম বরণীয় বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত নীতিবিরোধিতা মধ্যযুগীয় রিনেসাঁসের একটি বিশেষ লক্ষণ। হৃদয় ও বুদ্ধির মুক্তির তাগিদে ধর্ম ও নীতির বেড়া অতিক্রম আলোকপন্থীরা জীবনপ্রীতিরই নিদর্শন বলে গ্রহণ করলেন। মানা নয়,–জানা, বোঝা ও জয় করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। ইন্দ্রিয়সুখ ও কল্পনাবিলাসের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, আর তাঁদের প্রেম যেন একটা অদ্ভুত পৌত্তলিকতা, একটা ভিন্ন ধর্মের রূপ গ্রহণ করলো। আবার ফিরে এলেন ভেনাস, ফিরে এল দেহ-কেন্দ্রিক সৌন্দর্যের পূজা। এই নীতিবিরোধিতা (অ্যান্টিনোমিয়ানিজম্) সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় অকাসিস ও নিকোলেতের গল্পে। অকাসিসকে যখন নরক যন্ত্রণার ভয় দেখান হয়েছিল, তখন তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যই বুদ্ধি ও বীর্যে ভাস্বর। প্রেম-প্রবণ, সজাগ-ইন্দ্রিয় সেই যুবক স্বর্গের পথে একদল জরাজীর্ণ নিরানন্দ পুরোহিত ছাড়া আর কিছুই দেখতে না পেয়ে পণ্ডিত, বিলাসী ও রসিকদের সঙ্গে নরকের পথানুসরণই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। জীবনকে প্রচলিত নীতির ঊর্ধ্বে তুলে ধরার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

মানব-কল্পনা ও খ্রীষ্টানধর্মের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ; আর তা দেখতে পাওয়া যায় আমিস্ ও আমিলের গল্পে। খ্রীষ্টানসন্ন্যাসী রচিত এই গল্পে মর্ত-মানবের স্বর্গীয় বন্ধুতার এমন সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে যে, লোকেরা এই দুই বন্ধুকে শহীদরূপে গণ্য না করে পারে নি। মানবীয় কল্পনা এখানে পবিত্র ধর্মের শ্রদ্ধালাভ করেছে। দুই বন্ধু খ্রীষ্টানজগতে সাধুকল্প পুরুষরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টানধর্ম ও মানব-কল্পনার সুন্দর সাধনাই যেন এই গল্পের উদ্দেশ্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীয় রিনেসাঁসেও সেই একই ব্যাপার। নানা আপাতবিরোধী

* শুধু মধ্যযুগীয় ফরাসি দেশেই যে রিনেসাঁসের পূর্বাভাস দৃষ্ট হয় তা নয়, ইল্যান্ড ও ইটালিতেও তার পরিচয় মেলে। প্রতি দেশেই যেন কয়েকটি কোকিল বসন্তের অগ্রদূতের মতো শীতের মরসুমেই গেয়ে উঠতে চেয়েছিল, দু'একটি ফুল আগেভাগেই ফুটে উঠে অনাগত বসন্তকে অভিনন্দিত করতে চেয়েছিল। (এরা যেন সেই অগ্রদূত যাদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ওরে চাঁপা ওরে উন্মত্ত বকুল।') ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংল্যান্ডে রোজার বেকন আধুনিক বিজ্ঞানের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, আর তারও আগে ইটালিতে ফ্লোয়ার যোয়াচিম্ মানবাত্মার ভবিষ্যৎ বিজয়ের কথা প্রচার করতে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁর সেই বিখ্যাত মরমী উক্তি : The Gospel of the Father was past, the Gospel of the son was passing, the Gospel of the spirit was to be ; যেন প্রকৃত রিনেসাঁসেরই আবাহনী।

ভাবকে একত্র করে সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা একটি উদার বহুভঙ্গিম সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস এ-যুগের বিশেষ কীর্তি। পূর্বে গ্রীকদেবতাদের প্রতি তাকান হ'ত যে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে, গ্রীকসাহিত্যচর্চার ফলে তা ধীরে ধীরে তিরোহিত হল এবং গ্রীকদেবতা তথা গ্রীক পুরাণ ধর্মের বিষয়বস্তুরূপে না হ'লেও শিল্প ও কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে সমাদৃত হ'ল। তবে শিল্পের প্রতি পঞ্চদশ শতকের শ্রদ্ধা এত বেশী ছিল যে শিল্পের বস্তুকে ধর্মের মর্যাদা দিতে এ-যুগ কুণ্ঠা বোধ করে নি। জ্ঞানী ও রসিকগণ ধীরে ধীরে গ্রীক ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'তে থাকেন। পরিশেষে তা একেবারে তিরোহিত হ'ল এবং দুই ধর্ম কালভেদে একই মানব-মনের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে গৃহীত হ'ল।

আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ধর্মে ধর্মে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করেন এবং ধর্ম ব্যাপারটা যে অন্যান্য ব্যাপারের মতো ক্রমবিকাশের ফল এ-কথায় সায় না দিয়ে পারেন না। মানব-মনের সৃজনশীলতাই ধর্মের গোড়ায়। অতএব এই রহস্যময় সত্তার ভিতরেই প্রাচীন ও নবীন ধর্মের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়–যেমন শৈশবের কল্পনা আর পরিণত বয়সের চিন্তা খুঁজে পাওয়া যায় একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতায়। (সাহিত্য-কাব্যকেও প্রাচীন ও নবীন দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়, কিন্তু তা বলে তারা সত্য-সত্যই আলাদা নয়–একই মনের সৃষ্টি বলে। বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের ভিতর ঐক্য সুস্পষ্ট।) তাই উদার অ-ছুঁৎমার্গী রিনেসাঁসের কাজ হল খ্রীষ্টানধর্ম ও গ্রীকধর্মের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক খুঁজে বের করা–বিরোধমত্ত হয়ে এককে অপর থেকে দূরে ঠেলে ফেলা নয়। মধ্যযুগ অন্ধতার দরুন যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গীন উঁচিয়েছিল, এ যুগে তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না, উদারতার আবহাওয়ার দরুন সকলে যেন ঘেঁসা-ঘেঁসি করে চলতে শিখেছে, আর তারি ফলে কৌণিকতা মসৃণতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই সহানুভূতি, মনুষ্যত্বে এই অপরিসীম শ্রদ্ধা, এ-ই রিনেসাঁসের গোড়ার কথা। ভেদনীতি নয়, মিলন-নীতির উপরই এর প্রতিষ্ঠা। মানবমন এককালে যা আত্মপ্রকাশের উপায় রূপে গ্রহণ করেছিল, যা থেকে তা আনন্দ-বেদনার প্রেরণা পেয়েছিল, তা তুচ্ছ ও বাজে নয়, তার মধ্যেও খুশী হবার জিনিস রয়েছে, এই প্রত্যয়ে এ-যুগের আত্মা উজ্জ্বল। স্বাতন্ত্র্য ধ্বজা এ-যুগের আকাশে ওড়ে নি ; এ-যুগ বিলিয়ে দেওয়ার যুগ–সত্যের কাছে, সৌন্দর্য্যের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যুগ। যা ভালো, তা গ্রহণ করো, আপন-পরের চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না–এ-ই এ-যুগের মর্মবাণী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য এ-যুগের ছিল না, আর সেজন্য তাকে দোষও দেওয়া যায় না, কেননা তা নিতান্ত হালের জিনিস। তবু একটা মিলনাত্মক প্রেরণায় মুসার সঙ্গে হোমার ও প্লেটোর ঐক্যসাধনের জন্য এ-যুগের আত্মা ব্যাকুল। ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্যে নানা ব্যাপারে গোঁজামিল দিতেও তা কুণ্ঠাবোধ করে নি। এ-যুগের আত্মার বাণী যেন, 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, ভয় নাই, ভয় নাই।' মিরানডোলার পিকো এই মিলন-প্রচেষ্টার জীবন্ত প্রতীক। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল 'To bind the ages each by natural piety.' আপাত বিরোধ সত্ত্বেও গ্রীকধর্মের সঙ্গে যে খ্রীষ্টানধর্মের মিল রয়েছে, উভয়ই রহস্যাভিসারী মানব-মনের সৃষ্টি, পিকোর চিন্তার গোড়ার কথা তা-ই, খ্রীষ্টানোপযোগী অধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কম ছিল না, তথাপি প্রাচীন দেবতাদের ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মানব-মনের আলোক পিপাসা থেকে সৃষ্ট বলে তাঁরা তাঁর কাছে আলোকেরই দূত। গ্রীকদেবতাদের পেছনে যে-কল্পনার সত্য রয়েছে, তা তিনি মনে–প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

পিকোর রচনার উদ্দেশ্য, মানবপ্রকৃতির মহিমা ও মানুষের সৌন্দর্য প্রচার। মধ্যযুগে মানবপ্রকৃতির প্রতি যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পিকোর রচনা যেন তারি যোগ্য প্রতিবাদ। তারি

ফলে রিনেসাঁসের যুগে দেহ, বুদ্ধি ও কল্পনার সহজ-স্বীকৃতি। প্রাচীন গ্রীসে এই স্বীকৃতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে বলে তিনি তার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট। মিলনের দূত তিনি, তাই প্রাচীন গ্রীস ও খ্রীষ্টানজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য 'হেপ্টেপ্লাস' বা 'ডিসকোর্স অন দি সেভেন ডেজ অব ক্রিয়েশন' রচনা করলেন। প্লেটোর 'টিমিয়াসের' সঙ্গে মুসার 'জেনেসিসের' যে সাদৃশ্য রয়েছে, এ পুস্তকে তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। এরূপ প্রয়াসের ফলে রিনেসাঁসের যুগে দুই ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে যেমন এক নব পুষ্পের সূচনা হয়েছিল, গ্রীক ও খ্রীষ্টান পুরাণের সংমিশ্রণেও তেমনি এক নব পুরাণের সৃষ্টি হল। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের শিল্পে বিপরীতের যে সুন্দর সংমিশ্রণ পিকোর জীবন তারই বাস্তব প্রতিলিপি, আর এখানেই তার জীবনের মূল্য। জ্ঞানের জন্যই তিনি জ্ঞান খোঁজেন নি, বরং জ্ঞানে জ্ঞানে মিল রয়েছে, নির্বুদ্ধিতার ফলে মানুষ তা ভুলে গেছে, এই সত্য প্রমাণিত করবার জন্যই তাঁর জ্ঞানান্বেষণ। পিকো সত্যকারের হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী, কেননা "... The essence of humanism is that belief of which he seems never to have doubted, that nothing which has ever interested living men and women can wholly lose its vitality—no language they have spoken, nor oracle beside which they have hushed their voices, no dream which has once been entertained by actual human minds, nothing about which they have ever been passionate, or expanded time and zeal."

রিনেসাঁসের মর্মকথা এই মানবতা। শুধু পিকো নয়, পঞ্চদশ শতকের অপরাপর জ্ঞানীগুণীর ভিতরেও তা পুরামাত্রায় বিদ্যমান। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিন্‌সি প্রভৃতির রচনায় হিউম্যানিজমের প্রেরণা সুস্পষ্ট। উইন্‌কেলম্যান্ অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সন্তান, তিনিও পুরাদস্তুর হিউম্যানিস্ট্। গ্যেটে তাঁর এই গুরু সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি পুরাপুরি প্যাগান ছিলেন, আর খৃষ্টানজগত সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। ঈশ্বরের আদেশ নয়–মানব-মন, মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি, মানবদেহ গ্রীক সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আজীবন তার চর্চায় রত থাকেন। তাই পরবর্তীকালের লোক হ'লেও এই শিল্প-জহুরীকে রিনেসাঁসের শেষ ফল ব'লে গণ্য করা যায়।

আমাদের দেশের প্রতি এখন তাকান যাক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রিনেসাঁসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগ মুসলমানের সমৃদ্ধির যুগ (এখানে মুসলমানের সম্বন্ধেই শুধু বলা হচ্ছে), তাই তাদের সীমাহীন কৌতূহল। জোয়ারের নদীর মতো এখন তারা কেবলই মানুষকে আপন করতে চাচ্ছে। (ভাঁটার নদীর ভিন্ন ধারা, সে কেবলই ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বলে সঙ্কুচিত হ'য়ে সরে যায়।) হিন্দুর রামায়ণ-মহাভারত মুসলিম নওয়াব ওমরাহ্‌দের মনে যে সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল তার কাছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকখানি ঋণী। স্রষ্টার গৌরবের অধিকারী না হ'লেও, পালকের মর্যাদা তাদের দেওয়া যায়। রিনেসাঁসের জন্য যে উদারতা বর্তমান, এ তারি নিদর্শন। 'গোরক্ষ বিজয়' রচয়িতা ফয়জুল্লার অন্তরে যে ভিন্নধর্মী গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য সাড়া জাগিয়েছিল, মানব-মহিমার অন্তর্গত বলে তা রিনেসাঁসের পর্যায়ভুক্ত। অহঙ্কার পীড়িত মানব-মন (সে অহঙ্কার ব্যক্তিগতই হোক, আর জাতিগতই হোক) অপরের মাহাত্ম্য ও কীর্তি উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফয়জুল্লা যে পেরেছিলেন এতেই বুঝতে পারা যায়, প্রেমের প্রসাদে অহমিকামুক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। শুধু ফয়জুল্লা নয়, অন্যান্য কবি ও গীতিকারের রচনায়ও এর নিদর্শন প্রচুর। হিন্দু দেব-দেবী রাধাকৃষ্ণ, কামরতি প্রভৃতির নাম তো

সকলের কাব্যেই বর্তমান। কবি বলে কল্পনার বস্তুর মর্যাদা দিতে তাঁরা শিখেছিলেন। ছুৎমার্গী তাঁরা ছিলেন না–বৈশিষ্ট্যের তুষার প্রাচীর তাঁদের প্রেমের উত্তাপে গ'লে যাচ্ছিল।

রিনেসাঁসের দুটি দিক বুদ্ধি ও হৃদয়। এ-যুগে বুদ্ধির সাধনা বিশেষ হয় নি, কিন্তু প্রেমের সাধনা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রূপকে বহু কবি আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আউল-বাউলের রচনায় বিবাগী মনের যে বেদনা তা সত্যই মহান, আর আজও তা বহু ভাবুকের অশ্রু-নির্ঝর। ধর্মের সম্পর্ক বর্জিত নিছক মানবীয় প্রেম-কাহিনী রচনার পথ-প্রদর্শকও মুসলমান। দৌলত কাজি, আলাওলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা থেকেই 'টেল ফর টেলস্ সেকে'র শুরু। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে যে মানবমহিমা গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিল নীচে দুটি পদে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোর পরে পয়গম্বর না জন্মিবে আর॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন।
শাস্ত্রসব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দি-আ।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়ি-আ॥

*

আমার হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে যুগ যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, উপায় কি করি?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারো না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই॥

মিলন-স্পৃহার তাগিদে ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টাও এ যুগে কম হয় নি। প্রেমের যাদুতে পরকে আপন করবার জন্য এ যুগ ব্যাকুল।

পূবেতে বন্দনা করি পূবে ভানুশ্বর।
এক দিকে উদয় ভানু, চৌদিকে পশর॥
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী-সাগর
যেখানে বাণিজ্য করে চাঁদ সদাগর॥
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস পর্ব্বত॥
যেখানে পড়ি আছে আলীর মালামের পাথর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
উদ্দেশে বাড়ায় সালাম মোমিন মুসলমান॥
সভা করি বসছ ভাইরে হিন্দু-মুসলমান ;
সভার চরণে আমি জানাই সালাম॥

একই সভায় হিন্দু-মুসলমান আসীন। অতএব কেবল মুসলমানের কথা বললে চলে না, হিন্দুর কথাও বলতে হয় ; নইলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সালাম জানান অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কবি তাই আগে থাকতে বিশ্বাস সৃষ্টি করে পরে সালাম জানিয়েছেন।

কিন্তু এই প্রেম, চিন্তার এই স্বাধীনতা বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি, পরাজয়ের বিষাদের ছায়ায় মুসলমান যে শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলে, শুধু শাস্ত্রকেই

জীবনের একমাত্র নিয়ামক বলে গ্রহণ করা হ'ল বলে আনন্দ বিদায় নিলে, রুক্ষতা প্রবল প্রতাপান্বিত হ'য়ে জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করলে। (আজো তার প্রতাপ কমে নি, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্য থেমে গেছে, কিন্তু বুদ্ধি ও কল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই সমান চলেছে।) স্বাতন্ত্র্যের অবতারণা বৈশিষ্ট্যের তুঙ্গ প্রাচীর তুলে আলাদা হ'য়ে বাস করাই জীবনের চরিতার্থতা মনে করলেন, আর তারি ফলে মানসিক ছুৎমার্গ সমাজে শিকড় গেড়ে বসল।

ওহাবী মনোভাবের কথা বলছি। এ কেবল গোসা করতে, কেবলি আলাদা হ'তে শিখেছে, প্রেমের অপরিমেয়তায় জীবনের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে শেখে নি। অবশ্য এ মুসলমানকে যোদ্ধৃবেশ দিয়েছে ; বীরত্বপ্রেমিকরা এই জন্য তার প্রতি বিস্মিত-দৃষ্টি। কিন্তু এই যোদ্ধৃবেশের পেছনে কোনো বড় লক্ষ্য নেই বলে মোটের উপর তা অসার্থক। স্বাধীন দেশে মুসলমানের ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর মুখে হাসি ফুটুক (প্রতিবেশীর মুখে হাসি না ফুটলে মুসলমানের মুখে হাসি ফুটতে পারে না, কেননা ভাগ্যের একই তরীতে তারা ভাসমান), মুসলমানের জীবন সার্থক হোক, ফুলে ফুলে সুশোভিত হোক, এই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে তার যুদ্ধোদ্যম নয়, ইসলামকে অবিকৃত অপরিবর্তিত রাখতে হ'লে স্বাধীনতার প্রয়োজন, এই চিন্তাই তার প্রেরণাকেন্দ্র। সুতরাং তা থেকে কোনো বড় কিছু আশা করা অন্যায়। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম, চিন্তা-জগতের এই প্রাথমিক সাধারণ সত্যই মর্মগত হয় নি ব'লে তা ব্যর্থতারই আরাধনা করেছে।

তার পরে ইংরেজী শিক্ষার যুগ। কিন্তু সানন্দচিত্তে গৃহীত হয় নি বলে সংস্কৃতি-জগতে তাও বন্ধ্যা প্রমাণিত হ'ল। নব-শিক্ষা মানে নব-বিশ্বাস। মুসলমান নব-শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সন্দিগ্ধ চিত্তে—কেবল টিকে থাকবার জন্যে। সুতরাং কতিপয় চাকুরে সৃষ্টি ছাড়া তা আর কিছুই করতে পারলে না। বুদ্ধি-অনুভূতি-কল্পনা, সাহিত্য-শিল্প-আনন্দ তখনো মুসলমানের মর্মগত হয় নি। সে কেবলই বৃদ্ধের মতো লাঠিতে ভর দিয়ে জীবনের ভার বয়ে চলেছে। সংস্কৃতির এই শীতের দেশে হঠাৎ এলেন নজরুল ইসলাম। বসন্তের মত্ততার মতো তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রিনেসাঁসের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর 'বিদ্রোহী' মানব মহিমারই কাব্য। বন্ধন-জর্জর মানবাত্মার যন্ত্রণা এখানে বিদ্রোহের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। জরাজীর্ণ দৈন্য দুর্দশাময় পুরানো পৃথিবী ভেঙে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রয়াস যে মানব মহিমার চূড়ান্ত, তা সহজেই স্বীকার্য। বাঁচবার স্বাদ আমরা প্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই লাভ করি ; জীবনের নিয়ামক যে জীবন নিজেই, আর কিছু নয়, শাস্ত্র-সংহিতা সেখানে শুধু মন্ত্রণা দিতে আসতে পারে, এ-বোধ সর্বপ্রথম নজরুলের কাব্য থেকেই আমরা পাই। উপদেশ দিয়ে নয়, উচ্ছল সজীব জীবনের প্রতীক হ'য়ে তিনি তা প্রমাণিত করলেন। জীবনের আগ্রহে জীবনের প্রতিকূল আইনকে আমল দিতে তিনি চান নি—তাকে বন্ধনের রজ্জু ব'লেই মনে করতেন। যে প্রচলিত নীতিবিরোধিতা (অ্যান্টিনোমিয়ানিজ্‌ম) রিনেসাঁসের একটি বড় নিদর্শন, নজরুলের জীবনে ও কাব্যে তা সুপ্রচুর। আবেলার্ড, পিকো প্রভৃতি যে-বিরোধিতার ভিতর দিয়ে গিয়ে আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন নজরুল ইসলামেও তা বর্তমান। ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নজরুলের কাব্যে সুস্পষ্ট। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা তো রচনা করেছেনই, ভাবসৌকর্যের জন্য একই রচনায় হিন্দু-প্রতীক ও মুসলমান মহাপুরুষের নাম গ্রহণ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এটা চিত্তের বীর্যশালিতারই পরিচায়ক।

হিন্দু ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখবার এই যে প্রয়াস, এর জন্য রিনেসাঁসকামী কোনো কোনো লেখক দুঃখ ও লজ্জা বোধ করেন। তাঁদের কথা : রবীন্দ্রনাথ মুসলমানী ব্যাপার

নিয়ে কোনো কবিতা লিখলেন না, অথচ নজরুল ইসলাম কিনা বেহায়ার মতো (কথাটা অবশ্য তাঁরা ব্যবহার করেন না, কিন্তু মনের কোণে ও রকম একটা কথা থেকে যায়।) বহু হিন্দুয়ানী রচনা লিখলেন। এতে তাঁদের জাতীয়-সম্মানবোধ ক্ষুণ্ন হয়, তাঁদের মাথা নু'য়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, তাঁরা যে মনোভাবের দ্বারা পীড়িত, সে হচ্ছে প্রেস্‌টিজ-বোধ, আর এ প্রেস্‌টিজ-বোধ থেকে যে জগতে কত অনাচার হয়েছে ও হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রসঙ্গতঃ আজকাল লোকেরা প্রেস্‌টিজের যতটা পূজা করে, ডিগ্‌নিটির ততটা পূজা করে না। তার ফলে জগতে অত্যাচার-অবিচার ও কলঙ্ক-কুশ্রীতায় পরিপূর্ণ। সত্য কি মিথ্যা, এ প্রশ্ন আজ বড় নয়, সম্মান রক্ষা হবে কি হবে না এ-প্রশ্নই বড়। এরি ফলে কয়েকটি বিভ্রান্তিকর শব্দের সৃষ্টি : ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স, সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স ইত্যাদি। বুলির মতো এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু মনের ব্যাপার বলে এদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া কঠিন। মুশকিল এই যে, যাকে সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স বলা হয় তার নীচে ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স লুকিয়ে থাকে, আর প্রেম আর সত্যানুসরণকে যে অনেক সময় ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স বলে গাল দেওয়া হয়, এতো প্রায় সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। অতএব ইন্‌ফিরিওরিটি সুপিরিওরিটি প্রভৃতি কমপ্লেক্‌সের আবর্তে পড়ে সত্যমিথ্যার প্রশ্নকেই বড় ক'রে তোলা দরকার। কেননা তা-ই আমাদের জীবনকে সারল্য তথা শক্তিমণ্ডিত করতে সক্ষম।

নজরুল ইসলাম যে হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন, আর রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লিখলেন না, তার কারণ সোজা ; হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুল তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই। প্রাণের যোগ নেই বলে বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একপ্রকার জলবায়ুর মতোই সহজ। তা বোঝা কঠিন নয়, তাকে জানতে হয় না, সে নিজেই নিজেকে জানিয়ে যায়, আর আমরা জেনেও টের পাইনে যে জেনেছি। এই দিনের আলোর মতো সহজ সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন, মাটির বাঁধনকে স্বীকার করতে চান না, শুকিয়ে মরা তাঁদের ভাগ্যলিপি। (ইউরোপীয় রিনেসাঁসকে এক হিসেবে মাতৃভূমির সাধনার সঙ্গে পিতৃভূমির সাধনার সংমিশ্রণ-প্রয়াস বলা যেতে পারে।) হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য, এ-দুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়–কেননা, হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়। অথচ সে-মিলনের জন্য বারবার হিন্দুর দিকেই তাকান হয়েছে ; বলা হয়েছে হিন্দু বড় ভাই মুসলমান ছোট ভাই, সম্প্রীতির কথাটি বড় ভাইয়ের তরফ থেকেই আসা উচিত। কিন্তু প্রশ্নটি আসলে সম্প্রীতির নয়, উত্তরাধিকারের, আর উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়–মাতৃ-সম্পত্তি ও পিতৃ-সম্পত্তি উভয়েরই সে ওয়ারিস্‌। মুসলমান যদি এই দুই উত্তরাধিকার স্বীকার করে, তবে তার দ্বারা এক বড় সৃষ্টি সম্ভব–আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নব সংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারে। এ গৌরব মুসলমানের জন্যই অপেক্ষা করছে, তবে সে তা চায় কিনা, সেটাই প্রশ্ন। প্রতিভার স্বাদ পেতে হলে এই মিলন-সাধনা তথা জীবন-সাধনার সাধক হওয়া দরকার। বিরোধ অত্যন্ত সোজা, মিলন কঠিন, কঠিনের সাধনাই প্রতিভাবিকাশের একমাত্র পথ, তা ভিতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, নিদ্রার অবকাশ দেয় না। (বিরোধ বলতে আমি অপর সম্প্রদায় বা অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ বুঝেছি, নিজের সম্প্রদায় বা নিজের সঙ্গে নয়। নিজের জাতির সঙ্গে বিরোধ অত্যন্ত কঠিন, মহাপুরুষের জীবনেই তা দৃষ্ট হয়।)

হিন্দুর উত্তরাধিকার যে অনেকখানি মুসলমানেরও উত্তরাধিকার তার প্রমাণ, হিন্দুর অনেক কিছুই আমরা জানি, বুঝি ও উপভোগ করি এবং এই জন্য দুঃখও প্রকাশ করি। এই জানার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. সব মুসলমান আরব কি ইরান তুরান হতে আসে নি। অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশজন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে।

২. বিদেশাগত বাকি পঞ্চাশজনের প্রত্যেকে যে স্বদেশ থেকে পত্নী নিয়ে এসেছিলেন এমন মনে করা বাতুলতা। অন্তত বিশজন দেশী পত্নী গ্রহণ করেছিলেন।

৩. হিন্দুধর্ম উৎসবময়, আর উৎসব ছোঁয়াচে। হিন্দুর নানা উৎসবের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে যাত্রা-পাঁচালী, কবিগান ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে মুসলমান বেমালুম হিন্দুধর্মের অনেক কিছু জেনেছে ও পেয়েছে।

৪. কাল্‌চারের ব্যাপার হয়ে হিন্দুধর্ম সাধারণতা লাভ করেছে, আর তারি ফলে তা মুসলমানের মনে প্রবেশপথ খুঁজে পেয়েছে। সাহিত্য তথা আনন্দের বস্তু হয়ে (কাব্য কাহিনীময় বলে) তা আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করেছে, আর আমরা বেদরদীর মতো দ্বার রুদ্ধ করে থাকতে পারি নি। (মুসলমান ধর্মও সাহিত্য তথা আনন্দের ব্যাপার হয়ে হিন্দুর অবচেতনে স্থান নিতে পারত, কিন্তু সে প্রচেষ্টা আজো বিশেষ হয় নি। আরবি ও ফারসি ভাষার সিন্দুক হতে মাতৃভাষার সূর্যালোকে ইসলামকে মুক্তি না দিলে তা সম্ভব হবে না। সেজন্য ইসলাম-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রীতিও প্রয়োজনীয়। কেননা, রোগী-প্রীতি ব্যতীত চিকিৎসকের সার্থকতা অসম্ভব। কিন্তু যে-রূপ আরবি-ফারসী মিশ্রিত রচনার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তাতে সে-ভরসাও হয় না। মনে হয়, রচনাগুলো কেবলি আরবী-ফারসী জানা মুসলমান পাঠকের জন্য লেখা হচ্ছে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের জন্য নয়।)

এই সব কারণে হিন্দুর উত্তরাধিকার অনেকটা মুসলমানেরও উত্তরাধিকার। অসূয়াপরবশ হয়ে মুসলমান জোর করে তা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তা হলেই তা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আজো বাঙালি মুসলমান খাঁটি মুসলমান হয় নি। এ দুঃখের ভিতরেই আমার কথার সত্যতা জাজ্বল্যমান।

নজরুল ইসলামের হিন্দুয়ানি রচনা লিখবার কারণ এইখানে। এ তার উত্তরাধিকার প্রমাণিত করে, ব্যভিচার নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করে আরবদেশে জন্মগ্রহণ করতেন ও আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন তো আরবেদেশের 'রেস-কাল্‌চারের' প্রভাব এড়িয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। মুসলমান না হলেও মুসলমানির প্রভাবযুক্ত তিনি হতেনই, এ এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে, এ নিয়ে তর্ক চলে না, যেমন তর্ক চলে না নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব নিয়ে।

নজরুল ইসলাম রিনেসাঁসের প্রেরণা : বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচনার মারফতে তা আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ইসলামী রচনার জন্য তাঁকে 'রেনেসাঁ গুরু' মনে করা ছেলেমি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁরা এরূপ বলেন, তাঁরা রিনেসাঁস কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। রিভাইভালইজ্‌মকে তাঁরা রিনেসাঁস বলতে চান। (রিভাইভালইজ্‌ম ও রিনেসাঁসের পার্থক্য কি, এ প্রশ্ন অনেকে করেন। উত্তরে বলতে পারা যায় : রিনেসাঁস মূল্যবোধ, রিভাইভালইজ্‌ম

অহমিকা-বোধ, রিনেসাঁস সাধারণ মনুষ্য-প্রীতি, রিভাইভালইজ্‌ম্‌ বিশেষ বৈশিষ্ট্য-প্রীতি। অবশ্য রিনেসাঁসের জন্য বিশেষ জাতি তার নিজের সৌন্দর্যের দিকেও তাকাতে পারে, সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু শুধু সেদিকেই তাকানোর প্রবৃত্তি অন্যায়। কেননা সেটা সৌন্দর্য প্রেরিত নয়, অহঙ্কারপ্রেরিত। আর অহঙ্কার যে বহুল, সে জানা কথা।)

প্রাণের অন্ধ আবেগে জরুল যা করতে চেয়েছিলেন 'মুসলমান-সাহিত্য-সমাজ' (ঢাকা) তারি জাগ্রত প্রচেষ্টা। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এর লক্ষ্য। সচেতনভাবে দলবদ্ধ হয়ে সমাজের কর্মকর্তারা বুদ্ধির মুক্তির যে-আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন, তা সত্যই অপূর্ব–শুধু মুসলমান সমাজের নয়, বাংলার সংস্কৃতি-আন্দোলনে এর এক বড় স্থান। মানুষের জীবন ছিল এর সামনে ; জীবনের বহু-ভঙ্গিম বিকাশকে সম্ভব ক'রে তোলাই ছিল এর স্বপ্ন। রিনেসাঁসে বড় হয়ে উঠেছিল যে জীবন–পরকালমুখী ধর্ম-সাধনা নয়, ইহকালমুখী জীবন সাধনা, মানে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়াস, সাহিত্য সমাজেরও লক্ষ্য ছিল তাই। জীবন সুন্দর হোক, ঐশ্বর্যময় হোক, তার বিকাশের অন্তরায় দূরীভূত হোক, এ-ই ছিল তার অন্তর্নিহিত কামনা। জ্ঞান, প্রেম ও বুদ্ধির সন্নিপাতে জীবনের যে ঐশ্বর্যময় জয়যাত্রা তার স্বপ্নে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের চিত্ত আন্দোলিত হয়েছিল। সেজন্য কোনো ইজ্‌মের তাবিজে বিশ্বাসী না হয়ে গভীর জীবনানুভূতির আশ্রয় গ্রহণই এঁরা কল্যাণপ্রদ মনে করেছিলেন।

ধর্ম উপেক্ষা করা নয়, বুঝা ও উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। ধর্ম যে মানবকল্যাণের এক অনুপম নিদান, প্রেমে-পুণ্যে জীবনকে ধন্য করার উপায়, অন্ধ অনুসরণের ব্যাপার নয়, এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন সমাজের কর্মকর্তারা। অথচ সে-জন্য তাঁদের নিন্দিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছিল ; সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার সাক্ষী হয়ে তা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে। এই বিরোধিতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তাঁরা মানব মহিমারই জয় ঘোষণা করলেন।

এটি রিনেসাঁসের লক্ষণ। রিনেসাঁসের অপর লক্ষণ যে মিলনপ্রয়াস, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে মিলন সাধনের শুভচেষ্টা, সেও এই আন্দোলনের বিষয়বস্তু। ছুৎমার্গী বৈশিষ্ট্যের বাণী প্রচার না করে তা মিলনের বাণীই প্রচার করেছিল। বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে দিয়ে দেশকে প্রেমের ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।

(সাহিত্য-সমাজ সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এই প্রবন্ধে সকল কথার ঠাঁই হতে পারে না। তাই সংক্ষেপে সেরে নিলাম।)

এর আরব্ধ কাজ শেষ হতে পারে নি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে। তা না হলে এ বাঙ্গালীর জীবনে সোনা ফলাতে পারত। মুসলিম-সমাজে যদি কখনো সত্যিকারের রিনেসাঁসের আবির্ভাব হয়, তবে উপলব্ধ হবে যে তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজ'। পঞ্চদশ শতাব্দীর রিনেসাঁস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে : The Renaissance of the fifteenth century was in many things, great rather by what it designed than by what is achieved, 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজ' সম্বন্ধেও তা বলা যেতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা' আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতকে তা পূর্ণ হয়েছিল। বাংলার মুসলমান-সমাজে সেই 'অষ্টাদশ শতাব্দী' এখনো দূরে, কেননা পথে বহু অন্তরায়। দ্বন্দ্বের যুগ রিনেসাঁসের যুগ নয়, কারণ তাতে বুদ্ধির অপ্রমত্ততা রক্ষা করা কঠিন। বিদ্বেষাশ্রিত মন নিয়ে মানুষ কখনো সভ্যাভিসারী হতে পারে না। সত্যানুসরণ নয়, কেবলি শত্রুপক্ষের চালচলনের দ্বারা তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই

জন্য উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ রিনেসাঁসের যুগ হতে পারে না। অসহিষ্ণুতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলে অনেক সময় তা মনের উপর জবরদস্তি করে থাকে। আর রিনেসাঁস আর যাই হোক, জবরদস্তি বা অসহিষ্ণুতা নয়। অনেক সময় শত্রুর দুর্বলতা তার কাছে মনোহর মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়, আর অসহায়ের মতো সে তার অনুসরণ না করে পারে না। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার প্রমাণ প্রচুর।

বাংলা সাহিত্য যদি হিন্দুয়ানি ও সংস্কৃত শব্দে বোঝাই হয়ে থাকে, তবে সেখানে তার দুর্বলতা, শক্তি নয়। হিন্দুর অহঙ্কার তাতে স্ফীত হতে পারে, কিন্তু রসিকের রসতৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারে না। কিন্তু দ্বন্দ্বের যুগের চিন্তাশীল মানুষকে সেই দুর্বলতার অনুসরণে উৎসাহিত করেন–যা বর্জনীয় তা-ই গ্রহণীয় বলে প্রচার করেন। তিনি বলেন : হিন্দু যে ওরূপ করেছে, তাতে তার অন্যায় হয় নি, মুসলমান যে করে নি সেইটেই তার অন্যায়। কী চমৎকার যুক্তি। বাংলা সাহিত্য মোটের উপর উন্নত ও প্রগতিশীল হলেও তার বেশীর ভাগই যে বোঝা ও বাজে, তা অনস্বীকার্য। অথচ এই বোঝা ও বাজের অনুসরণ করতে তাঁর উপদেশ।

হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে সাহিত্য ভারাক্রান্ত করা অন্যায়। কেননা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তা সেখানে মাঝে মাঝে আসতে পারে, কিন্তু সর্বময় প্রভু হয়ে তাকে গ্রাস করতে পারে না। আর মনে রাখা দরকার 'আনি'র প্রভাব থেকে জীবনকে রক্ষা করা যখন সাহিত্যের, বিশেষ করে, আধুনিক চিন্তাসাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য তখন তা নিয়ে কোন্দল অনাধুনিকতারই প্রমাণ। 'আনি'র প্রভাবে নিয়ে যাওয়া আর জীবনকে কারাগারে বন্দী করা যে এক কথা, চিন্তাশীলের তা বুঝা উচিত। তবে না বুঝলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না (বুঝলে অবশ্য প্রশংসা করা যায়), কেননা তিনিও অন্যান্য মানুষের মতো যুগের সন্তান এবং অস্থির যুগে মতির প্রশান্তি রাখতে পারে কম লোকেই।

এই অস্থির দ্বন্দ্বময় যুগে রিনেসাঁসের সাধনা সহজ ব্যাপার নয়। রিনেসাঁসের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। কেননা, তা জীবনসূর্যের উপাসনা আর চিন্তামুক্ত না হলে তা সার্থকভাবে করা যায় না। মেঘলা দিনে সূর্য-উপাসনা চলে না, আর এ-যুগ সত্যই মেঘলা যুগ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর নেই। শুধু রাজনৈতিক বিরোধ নয়, এ-যুগের অর্থনীতি বা অর্থনীতিহীন যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে, তা দূরীভূত না হলে রিনেসাঁস তথা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার সাধনা অসম্ভব।

অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয় নি বলে মানবসভ্যতা বারবার ভেঙে পড়েছে, এবং এবারও ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। সুতরাং তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। Man does not live by bread alone, he needs spiritual food, এ-ধরনের বড় বড় কথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু 'ব্রেডে'র চিন্তা থেকে মানুষকে রেহাই দেবার চেষ্টা হয় নি একবারও। সুতরাং স্পিরিচুয়ালিটি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে কথার কথা। ব্রেডের ব্যাপারটি

রিনেসাঁস বহুভঙ্গিম জীবন–একটি আদর্শের পিঁজরায় পুরে' তোতাপাখিপনা শেখান নয়। বিচিত্র জীবনের ডাকে মানুষ বিচিত্র পথের পথিক হয় ; তাই সহজ-সরল পন্থা জাতিগত বা সম্প্রদায়গত না হ'য়ে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। মুক্তি আসে নানা মূর্তি ধরে–একজনের পক্ষে যা মুক্তির সরল পথ অপরের কাছে তা সরল না-ও মনে হতে পারে। প্রবণতার বিভিন্নতাই এর হেতু। একই ব্যাপারে সকলের মনে সাড়া জাগ্‌বে, এমন আশা করা ভুল। ইরানের নার্গিসনয়না সাকির বিরহে কেউ দেওয়ানা হতে পারে, আবার কারো পক্ষে কালিদাসের নিপনিকা চতুরিকার শোকে ম্রিয়মান হওয়া স্বাভাবিক। এই যে বিভিন্ন রুচি, একে শুধু রক্ষা করা নয়, পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা এবং এদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করে ঐক্য স্থাপন করা–এ-ই রিনেসাঁসের মূল প্রবৃত্তি, এর ব্যতিক্রম আর যা-ই হোক, রিনেসাঁস নয়।

সুব্যবস্থিত করে এই ফাঁকি থেকে যারা মানুষকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন তাঁরা রিনেসাঁসের তথা বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতির জয়যাত্রার পথই প্রশস্ত করছেন। তাঁদের হাতে হাত মেলাতে না পারলেও কণ্ঠে কণ্ঠ মেলান দরকার।

রুটির কথায় বর্বরতার গন্ধ পেয়ে যে সকল উন্নাসিক নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁদের জানাতে চাই, রুটিকে প্রধান বলে স্বীকার করা হয় নি বলেই তা বারবার সভ্যতাকে আক্রমণ করেছে। সেজন্য বর্বরতার গুটিকায় তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়েছে। তার প্রতিকার টিকা। বর্বরতাকে প্রথমেই মৃদুভাবে মেনে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে সে-টিকা।

সমাজতন্ত্র তারি আয়োজনে ব্যস্ত, তাই বর্বরতার বাড়াবাড়ি থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা তারি হাতে।

পৃথিবীর যে-দুঃখের কথা বলেছি তার কারণ অর্থনীতি, এ-বিষয়ে চিন্তাশীলরা একমত। কিন্তু অর্থনীতি বিজ্ঞানের এলাকার, সাহিত্যের নয়। তাই তা নিয়ে আলোচনা না করে বর্তমান অর্থনীতির পেছনে যে মনস্তত্ত্ব রয়েছে, অথবা তা থেকে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কেননা, মনস্তত্ত্ব সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ের এলাকাভুক্ত।

একটুখানি তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের ভিতরের মানুষটি কুঅভ্যাসবশতঃ নিজেকে খুশী করার নামে অপরকে অসুখী করতে চায়। (আমরা অট্টালিকা নির্মাণ করি নিজেরা সুখে থাকার জন্য নয়, অপরকে ঈর্ষান্বিত তথা দুঃখিত করার জন্য) সমকক্ষের কালো মুখেই আমাদের আনন্দ। এই বিকৃত দৃষ্টির ভদ্র নামই 'কম্পিটিশন' বা প্রতিযোগিতা। প্রয়োজন না থাকলেও ছিনে-ছুনে কেড়ে-কুড়ে সিন্দুক ভর্তি করার এই কদর্য স্পৃহা একে বর্বরতা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। নির্বোধ অথবা নিষ্ঠুর বলে (এ দুটো অপবাদের একটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে) আমরা বুঝতেই পারি না যে, সিন্দুকে কেবল অর্থকেই বন্দী করে রাখা হয় না, মানুষের স্বাস্থ্য ও পরমায়ুকেও বন্দী করে রাখা হয়। তাই পৃথিবী মরণে-মরণে ও অস্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে ছেয়ে যায়।

এই দুর্ভোগ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। পুরানো দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা প্রতিযোগিতা তথা অপরকে পরাজিত ও দুঃখিত করা, নব দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়ার কথা নিজেকে খুশী করা। আর পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সখ্য পানই নিজেকে খুশী করার উপায়। এ যুগ তাই সখ্যরস আস্বাদনের জন্য এত ব্যাকুল।

দুঃস্থ পৃথিবীকে সুস্থ করাই এখন বড় কথা। বুদ্ধি-মুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে রিনেসাঁস এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করতে পারে। মুমূর্ষু পৃথিবী শুশ্রূষা চাচ্ছে, দানবের অত্যাচারমুক্ত হতে চাচ্ছে। এ-যুগের দুঃখ-ব্যথা, কলঙ্ক কুশ্রীতা চপেটাঘাত করে কবি-শিল্পীদের আত্ম-রতিবিরত করছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো সৌন্দর্যধ্যানী-কণ্ঠে দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আকুল আহ্বান। শিল্পী ও কবি মন নিয়ে আজ পৃথিবীকে ঢেলে সাজান দরকার। পৃথিবী আমাদের সমগ্র প্রতিভা চাচ্ছে–আমাদের কবিতার খাতা হতে চাচ্ছে–বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনা সমস্ত তার জন্য উজাড় করে দিতে হবে।

বুদ্ধিকে নিজের কাজে না লাগিয়ে নিজেকে বুদ্ধির কাজে লাগাবার যুগ এখনো আসে নি। তারি পথ নির্মাণে আমাদের প্রতিভা নিযুক্ত করা দরকার। তবেই প্রকৃত রিনেসাঁস তথা হিউম্যানিজ্‌ম সম্ভব হবে, সুন্দরের দানে জীবনের আনন্দভাণ্ডার পূর্ণ হবে। *

---

* হিউম্যানিজমে তেমন বিশ্বাসী নন কিন্তু রিনেসাঁস-প্রয়াসী একদল লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁদের প্রচেষ্টা যেন ডেনমার্কের রাজকুমারদের বাদ দিয়ে 'হ্যাম্‌লেট' অভিনয়ের মতোই হাস্যকর। তাঁদের মতে রিনেসাঁস হচ্ছে বাঁচার জন্য একটি নবজাত শিশুর চিৎকার। কিন্তু তা সত্য নয়, রিনেসাঁস বাঁচার জন্য শিশুর চিৎকার নয় ; সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ ও বন্ধনমুক্তির জন্য তরুণের দাবী।

মেরুদণ্ড

If the wicked flourish and the fittest survive, Nature must be the God of rascals,–G.B.S.

যেদিন 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'–এই সাধারণ সত্যটি দার্শনিকের কণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর সর্বনাশের সূত্রপাত। কেননা, মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণরাজিকে অবহেলা করে নিকৃষ্ট শক্তিসমূহের পূজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে, আর শুধু বাঁচার কথাটা বড় হয়ে উঠল বলে সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ মানুষের দৃষ্টিসীমা থেকে অনেক দূরে সরে গেল। সে বুঝতে পারলে, এ-সব গৌণ ব্যাপার, বাঁচার জন্য এ-সবের কোনো প্রয়োজন নেই, যদি পাওয়া যায় ভালো। অধিকন্তু না দোষায়–না পাওয়া গেলেও তেমন দুঃখ নেই।

দার্শনিকের চেষ্টা হয় অনেক সময় 'ম্যাচ এডো এবাউট নাথিং', অথবা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ ও গবেষণার ফলে তাঁরা যে সত্যে এসে পৌঁছোন, অনেক সময় তা' মামুলি সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দর্শনের সমর্থনে তাই হয়ে ওঠে সকলের শ্রদ্ধেয়–সাধারণ ব্যাপারটাও অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়। 'ফিট' লোকেরাই সব সময় বেঁচেছে ও বাঁচবে এ কথাটা বলার জন্য দার্শনিকের গবেষণার প্রয়োজন হয় না, সামান্য পর্যবেক্ষণশীলেরাও তা' বলতে পারে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তের জন্য দার্শনিকের কোনো কৃতিত্ব নেই ; তাঁর কৃতিত্ব সত্যে পৌঁছার জন্য তাঁর যে আয়োজন তাতে, উপাদান-সংগ্রহ ও বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারে মানুষ হঠাৎ-সৃষ্ট জীব নয়, জীবপরম্পরায় ধারাবাহিক পরিণতি, এই সত্যের উদ্‌ঘাটনে।

অথচ মানুষ সেইটেই বড় বলে গ্রহণ করল–নাচুনে বুড়ি ঢোলের তালি পেলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়, মানুষও তেমনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের ভিতরের যুদ্ধংদেহি ভাবটিকে আঁকড়ে ধরল–তেল-সিঁদুর দিয়ে দেবতার মতো তার পূজা শুরু করলে। নিজেরা যা স্বভাবতঃই ভালোবাসে দার্শনিকের সমর্থনে, তাই তাদের কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল ; আর দার্শনিকরা যা ধরতে ছুঁতে পান না ; মানবজীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধ্যান-কল্পনা প্রেম-সৌন্দর্যের কদর কমতে লাগল। এ সব কী? বিজ্ঞান তো এ সব ঠাহর করতে পারে না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়ে উপায় কী/ সত্য তাই ; বিজ্ঞানের সহায়তায় যাচাই করতে গেলে মূল্যের তো কথাই নেই, এ সবের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কেননা, মানুষ যেখানে প্রকৃতির সৃষ্টি সেখানেই বিজ্ঞানের অধিকার, যেখানে সে নিজের রচনা সেখানে বিজ্ঞান বেকার। প্রেম, সৌন্দর্য ইত্যাদি মানুষের নিজের সৃষ্টি বলে বিজ্ঞান এদের সম্বন্ধে নির্বাক অথবা সন্দিহান। কিন্তু এদের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা, তথা সভ্যতার সাধনা। 'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতি এই সাধনার পরিপন্থী, কেননা তা' শুধু বাঁচবার জন্য প্রয়োজনীয় নখদন্ত ও নখদন্তের স্থানীয় বন্দুক-বোমা-সঙ্গীনকেই বড় করে তোলে–উদার বুদ্ধিকে বর্জন করে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে শেখায়। ফলে মানুষের অধোগতি ঘটে।

মানুষ শুধু ঊর্ধ্বতনে তৃপ্ত থাকতে পারে না, বিকাশই তার জন্য প্রয়োজনীয় আর তাতেই মনুষ্যত্বের জয়। ঊর্ধ্বতনের জন্য অত্যধিক উদ্বেগ বিকাশের প্রতিকূল। কেননা তা' শুধু সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি-আশ্রিত সন্দেহ ও ঘৃণা-বিদ্বেষকে বড় করে তোলে, আর সন্দেহ-বিদ্বেষ বিকাশের সহায় নয়, অন্তরায়। সে-জন্য প্রয়োজনীয় উদার বুদ্ধি-লালিত আনন্দ আর প্রেম-আলোক আর মাধুর্য। কথায় বলে সাবধানের মার নেই, কিন্তু আসলে অতি সাবধানেরই আত্মিক মৃত্যু ঘটে। ভয়ার্ততার ফলে তার আত্মা সংকুচিত ও মলিন হয়ে যায়। আত্মরক্ষার তাগিদে যে জীবনের অধোগতি ঘটে, অন্ততঃ উন্নয়ন হয় না, উদ্ভিদজগতের দিকে তাকালে তা' সহজে উপলব্ধি করা যায়। পশুদের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকার উদ্দেশ্যেই কোনো কোনো বৃক্ষ তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত দেহ নিয়ে অঙ্কুরিত হয়। বেল ও লেবু পাতার উগ্রগন্ধ ও তাদের দেহে কাঁটার উৎপত্তি পশুদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকার তাগিদেই। এমন যে গোলাপ, এককালে সেও বন্য পুষ্প ছিল, গায়ের কাঁটা দেখলেই তা' টের পাওয়া যায়। মানুষের হাতে পড়ে এখন সে সভ্য-ভব্য হয়েছে। এখন সে দুর্বল, অসহায়-বেড়ার ভিতর ছাড়া বাড়তে পারে না। সভ্য-ভব্য মানুষও একপ্রকার দুর্বল মানুষ-রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান ছাড়া বাঁচতে পারে না। গোলাপের জন্য যেমন বেড়া, মানুষের জন্য তেমনি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রছাড়া মানুষ সভ্য-ভব্য হয়ে বাঁচতে পারে না। রাষ্ট্র যেমন মানুষকে রক্ষা করে, রাষ্ট্রকে রক্ষা করাও তেমনি মানুষের কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিন রাষ্ট্র বলে : আমিই সব, আমাকের রক্ষা কর ; তোমাদের নিজের দিকে তাকাবার দরকার নেই, আমার পূজা করাই তোমাদের জীবনের সার্থকতা, সেদিন সত্যই মানুষের দুর্দিন, সেদিন মানুষের সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়।

গোলাপের কাছে যদি 'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতি বারবার আওড়ান যায়, আর বলা হয় যে, গরু-ছাগলরা তাকে গ্রাস করবার জন্য চারদিকে ওৎ পেতে আছে, তো পাপড়িগুলি কাঁটায় পরিণত হয়ে গোলাপের গোলাপত্ব নষ্ট হতে বিলম্ব হবে না। অচিরেই তার সৌন্দর্য যাবে ধসে, আর তার কদর্যতা ও কাঠিন্য মাথা উঁচিয়ে আত্ম-ঘোষণা করবে।

মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। সংকীর্ণতা মনুষ্যত্ব-গোলাপের পাপড়িগুলিকে কাঁটায় পরিণত করে। সংকীর্ণতার গোড়ায় ভয়-খেয়ে ফেলবে এই শঙ্কা 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' নীতি এই ভীতির পরিপোষক। তা শত্রুর কথা মনে করিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় না ; আর শত্রুকে না ভুলতে পারলে সুন্দর হওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে কালো রঙ্গে চিত্রিত করে দেখলে তাদের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে-সে কালোর প্রভাবকালিমা লেপনকারীর চরিত্রেও লাগবে। অপরকে ভালো ভেবেই আমরা ভালো হতে পারি, খারাপ ভেবে নয়। বাঘ বা সাপের সঙ্গে বাস করছি এই সচেতনতা মনুষ্যত্বের পরিবর্তে পশুত্বকেই বাঁচিয়ে রাখে। কূটবুদ্ধি ও হ্রস্বদৃষ্টি রাজনীতিক তা বুঝতে পারেন না বলে ভিন্ন সমাজের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তকে বড় করে তুলে নিজের সমাজের ক্ষতিই করেন, কল্যাণ নয়। মানুষকে ভালো ভাবতে হবে নিজের ভালোর জন্যই ; নিজের ভিতরের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলিকে সক্রিয় রাখবার এই একমাত্র উপায়। ভয় ও সন্দেহ জীবনের পক্ষে মারাত্মক, এই বিশ্বাস না থাকলে জীবন অসুন্দর হয়ে পড়ে, খোশমেজাজ ও বহাল তবিয়ত নষ্ট হয় ; আর তা নষ্ট হলে মানুষের ভালো কাজেরও মূল্য দেওয়া যায় না। উত্তেজনার বশে কৃত মহৎ কাজেরও মূল্য কম। তাই 'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতি জোরে-শোরে প্রচার না করাই ভালো। যদি একান্তই বলতে হয়, তবে তা যেন দুর্বলের কানে কানে বলা হয়, সবলের কানে কানে নয়। সবলকে তা' ক'রে তুলবে অত্যাচারী ও স্বাধিকার-প্রমত্ত—অত্যাচারের দার্শনিক সমর্থন পেয়ে সে শক্তির অপব্যবহার করবে।

মানুষের জন্য বড় নীতি প্রেমের নীতি, হিংসা বা বিদ্বেষের নীতি নয়। যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন মতবাদ এই প্রেমের নীতিতে অবিশ্বাসী ক'রে মানুষকে সর্বনাশের পথে চালায়। প্রয়োজনীয় মন্দ-ব্যাপার (Necessary evil) যখন জীবনের সারবস্তু (Summum bonum of life) হয়ে উঠে, তখন জীবনের আর কিছুই থাকে না–প্রকৃত ঐশ্বর্যের ব্যাপারে তা একেবারেই ফতুর হয়ে পড়ে। বাঁচার সাধনা আর ঐশ্বর্যের সাধনা এক নয়, ঐশ্বর্যের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। ছোট জিনিসের দাবীকে না দমালে বড় জিনিসের দাবী বড় হ'য়ে উঠতে পারে না। বাঁচার সাধনার আধিক্যের ফলে মানুষের ভিতরের ছোট মানুষটিই প্রাধান্য লাভ করে, বড় মানুষটি নষ্ট হয়ে যায়। সেবার অভাবে দেবতা অন্তর্হিত হন, মন্দির খালি পড়ে থাকে।

'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ অর্থ-প্রতিপত্তির লোভ। চরিত্রকে কলুষিত করতে এর মতো আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। এই লোভের হাতে যারা ধরা দেয়, তাদের অবস্থা সত্যই মারাত্মক হয়ে পড়ে। অচিরেই তারা জীবন-ধনে বঞ্চিত হয়ে দীন হয়ে পড়ে। তাদের না থাকে সৌন্দর্যবোধ না থাকে আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা। তাদের জীবন হয়ে পড়ে ফাঁকা, আর সেই ফাঁক পূর্ণ করবার জন্য তাদের অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা আরও বেড়ে চলে। ফলে ধন যত বাড়ে জীবন তত নির্ধন হতে থাকে, সিন্দুক যত ভর্তি হয়, অন্তর তত শূন্য হতে থাকে। এই শূন্য জীবন নিয়ে অর্থ-প্রতিপত্তির জোরে তারা সমাজের নেতা হয়ে দাঁড়ায়, আর নিজের শূন্যতা তথা কদর্যতা (কেননা, বাগান খালি থাকে না, ফুল গাছ না থাকলে কাঁটা গাছ থাকে) সমাজ-দেহে সংক্রমিত ক'রে সমাজের অশেষ ক্ষতি করে।

শ্রেষ্ঠতার আরাধনাই মানুষের কর্তব্য, নিকৃষ্টতার পূজা নয়। আর শ্রেষ্ঠতার আরাধনার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় প্রকৃত অনুরাগ। অনুরাগই কঠিন ব্যাপারকে সহজ করে তোলে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহকে ভালোবাসলেই নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের দাবী কমে আসে, নইলে তাদের জুলুমের অন্ত থাকে না। বড় কিছুকে ভালো না বাসলে ছোট কিছুর অত্যাচারে জীবন জীর্ণ হয়ে আসে–ভালোবাসাকে বড় না জানলে ঘৃণা-বিদ্বেষের জয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতি প্রয়োজনের ভাওতায় বড় জিনিসকে ছোট, আর ছোট জিনিসকে বড় করে তুলে মানুষের অশেষ অকল্যাণ করে। সৌন্দর্য ও আনন্দের উপর জোর না দিয়ে টিকে থাকার প্রবৃত্তির উপর জোর দেয় বলে তা জীবনের কদর্য ক্ষুধাকেই বড় করে তোলে। সুতরাং 'আগে টিকে থাকা পরে সৌন্দর্য' এই নীতির প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো ; কেননা, তাতে শালীনতার ও শোভনতার দাবী নীচে পড়ে যায়, আর বর্বর অধিকারবৃত্তি লেলিহান জিহ্বা মেলে ধেই-ধেই নৃত্য করতে থাকে। তাকে সংযত করতে পারে সৌন্দর্য-প্রেম, অন্য কিছু নয়। নীতির শাসন এখানে ব্যর্থ। 'যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন' নীতি মানুষকে ইতরতা থেকে মুক্ত হতে দেয় না, ছোট-খাটো স্বার্থের নিগড়ে বেঁধে রেখে তাকে নীচমনা করে গড়ে তোলে। ছোট ভাব সব সময়ই বড় ভাবকে ব্যর্থ করেছে ও করবে। অতএব, বড় ভাবের প্রতি বিশেষ অনুরাগ না থাকলে তার কোনো ভরসা থাকে না। সত্যের জয় হবেই এ কথা ভুল, জয় হোক না হোক, সত্যের জন্য প্রাণপাত করা উচিত, এ-কথাই ঠিক। মিথ্যা আশায় সত্যের জয় কমে আসে–পরাজয়ের লক্ষণ দেখলে মন দ্বিধান্বিত হয়।

দর্শন সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে তার আর একটি নজীর সম্প্রতি আমার চোখে পড়েছে। দার্শনিক যখন বলেন, মানুষের বিকাশের পশ্চাতে অর্থনীতিই প্রধান, তখন তিনি সাধারণ সত্যই প্রচার করেন ; কিন্তু দর্শনের সমর্থনে এই সাধারণ সত্যই মহামূল্য হয়ে দেখা দেয় এবং একে অতিক্রম করার শক্তি যে ব্যক্তি-মানুষের কাছে, মানুষ তা' ভুলে

যায়। ফলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সংকুচিত হয়ে আসে–মানুষ মহৎ ও সুন্দর জীবনের দায়িত্ব অস্বীকারের পথ খুঁজে পায় এবং অপরের মহত্ব ও সৌন্দর্যকে ছোট করে দেবার সুযোগ লাভ করে। এতে তার ক্ষতি হয় বিস্তর–বাস্তব-উত্তীর্ণ হওয়ার আত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হয় বলে তার স্বাধীনসত্তা কিছুই থাকে না, সে অবস্থার দাসমাত্র হয়ে পড়ে। এক প্রকারের নিরুদ্বেগ জীবন সে লাভ করে বটে, কিন্তু এই নিরুদ্বেগতা নিষ্প্রাণতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। মনের কান্না তার থেমে যায়, আর এই মনের কান্নাই যে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা, তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। অথবা মনের কান্নাও থামে না, তার উদ্দেশ্যই শুধু পরিবর্তিত হয়–অর্থ সৌন্দর্য ও আনন্দের স্থান দখল করে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে কি একটা শক্তির অপমৃত্যু ঘটে। এই শক্তি আর কিছুই নয়, সৌন্দর্য ও আনন্দের ক্ষুধা। এর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিকশক্তি রহিত হয়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

সৃষ্টির গোড়ায় বুভুক্ষা বা বেদনা। বেদনার ফলেই অসম্ভব সম্ভব হয়। দার্শনিকের শিক্ষার ফলে কী করে এই বেদনার মৃত্যু হয়, ইদানীং তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। আমার তরুণ বয়সে জনৈক কিশোর বয়স্ক ছাত্রকে আমার খুব ভালো লাগত। তিনি মাঝে মাঝে মুসলমান সমাজের মানসিক দীনতা সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করতেন, আর যাঁরা সেকালে এই দৈন্য দূর করার আন্তরিক চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করতেন। তাঁর মুখে কবি-সাহিত্যিকদের কথাই ছিল, রাজনীতিকদের কথা নয়। তিনি বলতেন, রাজনীতিকরা অধিকার আদায় করে বটে, কিন্তু সুন্দর ও আনন্দিত জীবনের প্রেরণা দেন কবি-সাহিত্যিকরা; তাই তাঁরা সমাজের প্রকৃত স্রষ্টা, মানুষের অন্তরে তাঁদেরই সিংহাসন। তবে মাঝে মাঝে যে রাজনীতিকরা বড় হয়ে ওঠেন, তার কারণ সমাজের রুগ্ন অবস্থা; পীড়িতের কাছে ডাক্তারই বড়, বন্ধু নয়। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় এর বিপরীতটাই ঠিক। আধুনিক কালে যে রাজনীতিকরা পৃথিবীতে বড় স্থান লাভ করেছেন, তার কারণ পৃথিবীর পীড়িত অবস্থা। এক হিসাবে দেখতে গেলে সমাজের আভ্যন্তরীণ বিকাশের বাহ্যিক প্রকাশ বলে রাজনৈতিক আন্দোলন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার–সমাজ যে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ নয়, তারই লক্ষণ। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে যে রোগী ডাক্তারকেই বড় করে তোলেন, বুঝতে হবে তিনি চিররোগী। তাঁর মুক্তির উপায় স্বল্পই। চিররোগ প্রায়ই মানসিক ব্যাধি। অতএব, বন্ধু-বান্ধবের প্রীতিকর সঙ্গই তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়–বোতল বোতল ঔষধ সেবনে ফায়দা পাওয়া কঠিন। যে জাতি বা সমাজ কবি-সাহিত্যিক ও সৌন্দর্য-শিল্পীদের অবজ্ঞা ক'রে কেবল রাজনীতিকদের বড় করে দেখে, চিররোগীর ন্যায় তারও মুক্তি সুদূরপরাহত। *

রাজনীতিজ্ঞের প্রিয় হওয়ার একটি কারণ, মানুষের ঝগড়াটে মনোবৃত্তি। মানুষ স্বভাবতঃই কোন্দলপ্রিয় ; রাজনীতি কোন্দলপ্রিয়তার খোরাক যোগায়। ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা সমাজ সহ্য করে না, চোখ রাঙিয়ে তা দমাতে চায় ; কিন্তু বিজাতির প্রতি ঈর্ষায় সমাজের বাহবা পাওয়া। ব্যক্তির প্রতি গালাগালি পাপ, বর্বরতা ; কিন্তু বিজাতির নিন্দা পরম শ্লাঘার ব্যাপার। রাজনীতি এই ঈর্ষা ও নিন্দার পথ খোলাসা করে দেয় বলে মানুষের জীবনে তার এত প্রভাব। মানুষ মনুষ্যত্বের বড়াই করে বটে ; কিন্তু আসলে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেই বেঁচে যায়। যুদ্ধের নামে ছেলে-বুড়ো সকলেরই উল্লাস। রাজনীতিও এক প্রকারের যুদ্ধ–স্নায়ুর সংগ্রাম। তাই মানুষের কাছে যুদ্ধের

---

* রুগ্ন অবস্থায় মানুষের কুপথ্যে রুচি হয় ; প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগেও কুপ্রবৃত্তি বড় হয়ে ওঠে। তাই সামাজিক সমর্থন লাভ করে নিষ্ঠুরতাকে নগ্নমূর্তিতে রাজপথে বের হতে দেখা যায়।

মতো রাজনীতিরও আদর। সাধারণ অবস্থায় মানুষের গায়ে কাদা কি থুথু দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রবল রাজনীতির যুগে তা সহজেই করা যায়। রাজনীতির যুগে অসুবিধা হয় শুধু চিন্তাশীলদের। মোটা সুরের সঙ্গে মিহি সুর মিলাতে পারেন না বলে তাঁদের অস্বস্তির অন্ত থাকে না। লম্বা লোকেরা হাঁটু ও কোমর ভেঙ্গে বেঁটে হওয়ার চেষ্টা করে শুধু দুঃখই পান। রাজনীতির অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করার একমাত্র উপায় রাজনীতিকে জীবনের সারবস্তু মনে না করে মাত্র বেঁচে থাকার উপায় বলে মনে করা। তা হলেও শাশ্বত নীতির চরণে মাথা ঠেকিয়ে তা সুন্দর ও সংযত হতে পারবে। নতুবা তার কদর্যতার অন্ত থাকবে না। সংসার-ধর্ম সকলেরই পালন করতে হয় এবং করা উচিত ; কিন্তু একটা উঁচু লক্ষ্যের দিকে নজর না রাখলে সংসার হয়ে পড়ে একটা কারাগার–বদ্ধকূপের জলের মতো তা মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

কিশোর বন্ধুটির কথার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি সত্য কথাই বলতেন, কবি-সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাঁরাই জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বাঁচিয়ে রাখেন। গৃহনির্মাণে গৃহস্বামীর যে স্থান রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারেও কবি-সাহিত্যিকদের সেই স্থান। গৃহস্বামীর ইচ্ছা, অভিরুচি, খেয়াল ও কল্পনার খোঁজ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার গৃহের প্লান বা পরিকল্পনা তৈরী করেন ; পরে ওভারশিয়ার, রাজমিস্ত্রি ও যোগালির সহায়তায় গৃহনির্মাণ কার্য সমাধা করেন। রাষ্ট্রও এ-ভাবেই গঠিত হয়। রাষ্ট্রে বাস করে 'জীবন'। জীবন মূক ; তার প্রতিনিধি কবি ও সাহিত্যিক–জীবনের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সাধ ও গভীর অভীপ্সা এঁদের মারফতেই অভিব্যক্ত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাবীররা এঁদের জীবনবোধের সহায়তা নিয়ে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। তার পরে আসেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ; ছোট-বড় কর্মীদের সহযোগিতায় তাঁরা গড়ে তোলেন জীবনের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রসৌধ। কবি-সাহিত্যিকের জীবনবোধের দিকে না তাকালে তা হয়ে পড়ে শ্রী-মাধুর্যহীন কাজ-চলা গোছের ইমারত। তাতে সাধারণ জীবন তথা ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে ভালোই, কিন্তু সুন্দর জীবন যাপন হয়ে পড়ে অচল।

এ-সম্বন্ধে আরেকটি কথা মনে রাখা ভালো। সৌন্দর্যের সাধনা পূর্ণাঙ্গ চেহারার সাধনা, শুধু শিরদাঁড়ার সাধনা নয়। তাই চেহারা সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন মেরুদণ্ড সম্বন্ধে ততখানি নই। আমাদের খাওয়া-পরা বিলাস-ব্যসন সমস্ত কিছু এই চেহারার সৌন্দর্যের জন্যই। অবশ্য খাওয়া–দাওয়ার ফলে শিরদাঁড়াও শক্ত হয়। কিন্তু সেদিকে আমরা সজাগ নই, আমাদের সচেতনতা কেবল চেহারা নিয়ে। আর চেহারার সৌন্দর্য কেবল খাওয়া-পরার উপর নির্ভর করে না, সেজন্য ভাবসাধনারও প্রয়োজন। এমনকি সৌন্দর্য সাধনার ব্যাপারে খাওয়া-পরার চেয়ে ভাবসাধনার দানই বেশী; আর এই ভাবসাধনার প্রবণতা মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেয়ার দিকে যতখানি, সিধা রাখবার দিকে ততখানি নয়। তথাপি সাধনাকেই আমরা ভালোবাসি। বিশ্রী চেহারার দৃঢ়মেরুদণ্ড মানুষের চেয়ে সুন্দর চেহারার দুর্বল মেরুদণ্ড মানুষই আমাদের প্রিয়–ক্ষীণকায় শিল্পবীরের সঙ্গেই আমরা হাত মিলাতে চাই, বিপুলকায় মল্লবীরের সঙ্গে নয়। এখানেই মানুষের মনুষ্যত্বের জয়, কেননা এখানেই সে তার আত্মার মূল্য দেয়।

ব্যক্তির জীবনে শিরদাঁড়ার যে স্থান, জাতির জীবনে রাজনীতির সেই স্থান। শিরদাঁড়া ছাড়া ব্যক্তি চলতে পারে না। আর রাজনীতি ছাড়া জাতি অচল। তথাপি মাত্রাজ্ঞানহীন মেরুদণ্ডের সাধনা যেমন ব্যক্তির পক্ষে মারাত্মক, মাত্রাজ্ঞানহীন রাজনীতির সাধনাও তেমনি জাতির পক্ষে অশুভকর। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে আত্মা বিকৃত হয়ে যায়। জাতি যদি কেবল রাজনীতির সাধনা করে তো তার মেরুদণ্ড ষাঁড়ের মতো শক্ত

হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাটিও ষাঁড়ের মতোই কদর্য হয়ে ওঠে। রাজনীতিসর্বস্ব যণ্ডামার্কা জাতিরা মৌতাতের জন্য মানুষের মতো কোলাকুলি বা করকম্পন না করে ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি করে। ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হয়ে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়–মানুষের জীবনে মূল্যবান বলে আর কিছু থাকে না। প্রতিকার স্বরূপ মনে রাখা দরকার, মেরুদণ্ড বাঁচার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র ; রাজনীতিও জাতির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য–লক্ষ্য সৌন্দর্যধ্যান ও আনন্দ সাধনা। লক্ষ্যের স্থান উপলক্ষ্য তথা দেবতার স্থানে বাহনকে বসিয়ে পূজা করলে কালের হাতে শাস্তি পেতে হয়, আর যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিতর দিয়ে আমরা সেই শাস্তিই পেয়ে থাকি।

উপরে যে বন্ধুটির কথা বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় কিছুদিন আগে। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ল' ও অর্থনীতিতে এম,এ পড়ছেন। দেখলুম, তাঁর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে–আত্মতুষ্টি আর স্ফূর্তি বেদনার স্থান নিয়েছে। তবু সমব্যথী পেয়েছি ভেবে আমার স্বভাব অনুযায়ী তাঁকে সমাজের মানসিক দৈন্যের কথা বললুম– সমাজ যে প্রগতিশীল হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ঝাঁঝাল সুরে ইঙ্গিত করলুম ; কিন্তু তাতে তাঁর পূর্বপরিচিত সংবেদনশীল চিত্তের সাড়া পেলুম না। বরং আমার কথায় একটুখানি হেসে নিশ্চিন্তে সিগারেট টানতে টানতে ও পান চিবুতে চিবুতে বললেন : সমাজের দোষ কি? এখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজ যে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তার কাছে এর বাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। অর্থনীতিই তো জীবনের ভিত্তি ; কাজেই আফসোস করে লাভ নেই।

আমি নৈরাশ্যমিশ্রিত সুরে বললুম : কিন্তু সেই অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে কি? কতিপয়ের বড় হওয়ার দিকেই তো সমাজের দৃষ্টি, সাধারণের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার দিকে নয়।

তিনি আশ্বাসের সুরে বললেন : হ্যাঁ হচ্ছে বৈ-কি? এই যে লোকেরা চাকরী পাচ্ছে, এতেই সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি : কিন্তু খুব আশানুরূপ এগিয়ে যাচ্ছে কি?–অন্ততঃ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে?

তিনি : হ্যাঁ, যাচ্ছেই তো। হিন্দুসমাজ কি আর একদিনে এতদূর এগিয়েছে? আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। আমরাও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব। রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয় নি, মনে রাখবেন।

আমি আর কিছু না বলে সিগারেটটি জ্বেলে ধীরে ধীরে টানতে লাগলুম, আর মনে মনে ভাবলুম : লোকটা, ভাগ্যবান, লেখাপড়ার ফলে বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমি বদনসীব, আমার আর মুক্তি হল না। বেদনা থেকে মুক্তি আর আত্মিক মৃত্যু এক নয় কি? সহজ নিশ্চিন্ত জীবনের মূল্য কতটুকু। অসম্ভবের ক্ষুধা না থাকলে জীবনে আর থাকে কী? বন্ধুর মসৃণ জীবনের ক্রমবিকাশটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল: এম-এ ডিগ্রি, বি-সি-এস পরীক্ষা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এম-এল-এ অথবা মন্ত্রীকন্যা, এস.ডি.ও, ম্যাজিস্ট্রেট, তার পরে সকলের যা হয় তাই। সেই শেষ অনিবার্য পরিণতি, আর বিস্মৃতি। মানে 'তরক্কী' যাকে বলে, তার সবটাই তিনি করবেন, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি কতটুকু করবেন, তা বুঝতে পারলুম না।

মানুষ সব জায়গাতেই অর্থনীতির হাতে বন্দী, শুধু এই সৌন্দর্য ও আনন্দের ব্যাপারেই সে মুক্ত। এর জন্য প্রয়োজনীয় কেবল প্রকৃত ক্ষুধা, আর কিছু হলে ভালো, না হলেও চলে। একবার যার অন্তরে এই ক্ষুধা জেগেছে, সেই তার স্বাধীনতা উপলব্ধি করেছে–

এক অ-বস্তু-নির্ভর আলোকে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যাঁরা দু'দিক সামলাতে চান–শ্যাম ও কুল উভয় দিক রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, বুঝতে হবে, তাঁদের জীবনে সত্যিকারের ক্ষুধার অভাব–সৌন্দর্যের ডাকে তাঁদের আত্মা উতলা হয় নি। এই ক্ষুধা, যাদুমন্ত্রের মতো এ এক অদ্ভুত জিনিস। যে অনুভব করল, সে বেঁচে গেল ; আর যে অনুভব করতে পারল না, সে হতভাগ্য, এক অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হল। তার কাছে তাই বড় হয়ে ওঠে অর্থ আর আচার পূজা–নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার সবচেয়ে বড় উপায়।

উপরের দার্শনিক মতবাদ সৌন্দর্য ও আনন্দের ব্যাপারে ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়ে নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দেয় বলে তাকে সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ অবস্থার দাস নয়, প্রভু–এই এটাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় আশ্বাসের কথা। সাধারণভাবে মানুষের দৈন্য-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা ভালো। কিন্তু অর্থ না হলে সৌন্দর্য ও আনন্দচর্চা চলতে পারে না এবং তা ধনেরই একটা Bye-product-এর মতো মারাত্মক ধারণা আর নেই।

সৌন্দর্যের কথা মনে রাখলে খাওয়া-পরার কথা আপনা-আপনি এসে পড়ে, কিন্তু খাওয়া-পরার কথা মনে রাখলে সৌন্দর্যের কথা মনে না-ও আসতে পারে। আর সৌন্দর্যপ্রেমই খাওয়া-পরার ব্যাপারে সংযম ও শালীনতা এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু নিজের তৃপ্তির দিকে নজর রাখলে চলবে না, সকলেরই তৃপ্ত হওয়া দরকার–একমাত্র সৌন্দর্যপ্রেমই তা আমাদের শেখাতে পারে। কেননা, প্রকৃত সৌন্দর্য-প্রেমিকের কাছে মানুষের হাসিমুখের মূল্য অনেক।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্র

রাষ্ট্র সমাজের দেহ, আত্মা নয়। আত্মা ব্যক্তি। ব্যক্তি মানে সকল মানুষ নয়, কতিপয় ব্যক্তি–যাঁরা প্রতিভা ও সাধনার বলে নিজেদের সুমানসিকতার প্রতীক করে তুলতে পেরেছেন তাঁরা। তাঁদেরই মনের রঙে সমাজ-মন অনুরঞ্জিত হয়, সূর্যের রঙে যেমন অনুরঞ্জিত হয় মেঘ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা অথবা আকবরের দরবারে নওরতন রাজতন্ত্রের সৃষ্টি নয়, বিশেষ সৃষ্টি। আকবরের কাছে যা বড় হয়ে উঠেছিল আলমগীরের কাছে তা বড় হয়ে ওঠে নি বলে তাঁর আমলে দরবারে নওরতনের মতো সভ্যতাসূচক কিছুই চোখে পড়ে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের পার্থক্যের জন্য নয়, ব্যক্তিরুচির বিভিন্নতার দরুনই এই প্রভেদ। আমাদের এ-কালের শান্তিনিকেতনেও ব্যক্তি-মন বড় হয়ে উঠেছে, যুগ বা রাষ্ট্র নয়। শান্তিনিকেতন যুগের ঠেলায় তৈরি হয় নি যেমন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ; কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের মুক্তিকামী কবিমানসের সৃষ্টি। একটি মানুষেরই স্বপ্ন রয়েছে এর পেছনে। তাজমহল মোগলজাতির সৃষ্টি নয়, সম্রাট-কবি শাহজাহানের সৃষ্টি–তা শাহজাহানের প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির মর্মরীভূত রূপ।

তাই সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিই বড়, সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রের কাজ যেখানে ফুরোয় ব্যক্তির কাজ সেখানে শুরু হয়। ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের তাগিদে আবদ্ধ না থেকে সুমানসসৃষ্টিকে জীবনের লক্ষ্য করে তোলে তবেই সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে, নইলে নয়। কোনো প্রকারের রাষ্ট্রের কল–সে গণতন্ত্রই হোক আর সমাজতন্ত্রই হোক–সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না। তা মানুষের আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা রাখে, যান্ত্রিক উপায়ে তৈরি হয় না। সুমানসসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি। এর মানে এ নয় যে, সমাজতন্ত্রের কোনো দরকার নেই–তা না হলেও চলে। বরং এই বলতে চাচ্ছি যে, সমাজতন্ত্রের খুবই দরকার, তা না হলে মানুষের আটপৌরে জীবন তথা খোরপোশের সুবন্দোবস্ত হয় না, এবং ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারলে অপ্রয়োজনের জগতে প্রবেশ করা যায় না, আর অপ্রয়োজনের জগতে প্রবেশ করতে না পারলে সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্ভোগ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। সমাজতন্ত্র ক্ষুৎপিপাসার সমস্যাটির সমাধান করে দিয়ে মানুষকে অপ্রয়োজনের জগতে নিয়ে যেতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রের এত প্রয়োজন।

কিন্তু সৌন্দর্য ও আনন্দের জগতে ব্যক্তিই বড়। সেখানে রাষ্ট্রকে বড় ক'রে তুললে ভুল করা হবে। আত্মউৎকর্ষের জন্যই মানুষের জন্ম হয়েছে, রাষ্ট্রপূজার জন্য নয়। রাষ্ট্রপূজা আত্ম-উৎকর্ষের কথা ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখে। বড় সৃষ্টি মাত্রেই ব্যক্তিত্বের দান, এ কথা মনে রাখা দরকার। সত্য ও সৌন্দর্য ব্যক্তির চোখেই ধরা পড়ে, দলের চোখে নয়। দল ব্যক্তির মারফতেই সত্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। তাই রাষ্ট্রের স্টিমরোলার চালিয়ে ব্যক্তিকে নির্বিশেষ করে তোলার চেষ্টা অন্যায়। খাওয়া-পরার জগতে যথাসম্ভব সাধারণতা বা সাম্য স্থাপিত হোক, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না, কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সাম্যকামনা মৃত্যুকামনারই শামিল। আকাশে সুর ভরা থাকলেও বাঁশির রন্ধ্রেই সেই সুরের

প্রকাশ। তেমনি সত্য সৌন্দর্য বিশ্বে ছড়িয়ে থাকলেও ব্যক্তির মারফতেই তারা আত্মপ্রকাশ করে। তাই ব্যক্তির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই সমাজ গড়ে তোলা দরকার। সমাজ বা রাষ্ট্র কাণ্ড, ব্যক্তি শাখা, আর সেই শাখাতেই ফোটে সভ্যতার ফুল। কাণ্ড পুষ্টি লাভ করুক, তাতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু তার উদ্দেশ্য যদি না হয় শাখায় ফুল ফুটিয়ে তোলা তো সে পুষ্টতাকে বন্ধ্যাত্ব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে একটি কথা মনে রাখলে : সত্য এক নয়, বহু ; আর বহু সত্যের সামঞ্জস্য বিধানেই জীবনের চরমোৎকর্ষ। A truth-কে The truth–একটি সত্যকে একমাত্র সত্যে পরিণত করার মূল প্রবৃত্তি থেকে যে শোচনীয় মানসিকতার সূত্রপাত হয় বহু পূর্বেই G.B.S. আমাদের সে-সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। সমাজতন্ত্র সামাজিক সত্য, আর মুক্তি ব্যক্তিক সত্য। সামাজিক সত্য যদি একগুঁয়ের মতো ব্যক্তি-সত্যের ধার বেয়ে না চলে তো তা মানুষের মুক্তির উপায় না হ'য়ে বন্ধনের রজ্জু হ'য়ে দাঁড়ায়। আর ব্যক্তি-সত্য তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একেশ্বরতা উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া কিছুই নয়। তাই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। সামঞ্জস্যের সাধনা কঠিন, কিন্তু কঠিনের সাধনাই মনুষ্যত্ব। একটি মত নিয়ে পড়ে থাকলে নিশ্চিন্ততার আরাম পাওয়া যায় ; কিন্তু নিশ্চিন্ততার একঘেয়ে আরাম নয়, চিন্তার বিচিত্র জ্বালাই মানুষের জন্য কাম্য। নিশ্চিন্ততার আরামের অপর নাম মৃত্যু।

সমাজতন্ত্র না হলে মানুষ বাঁচে না ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকলে মনুষ্যত্ব মরে যায়। তাই চীনদেশীয় ভাবুক লিন্‌ইউটাং totalitarian state বা সমূহবাদী রাষ্ট্রকে এত ভয় করেছেন। তাঁর মতে সভ্যতা বিধ্বংসের ব্যাপারে মতবাদের একেশ্বরতা ধ্বংসপ্রতীক আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক। মতবাদ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে, আর যন্ত্র দিয়ে আর যাই করা যাক্ সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। একটি জাতিকে যদি মেরে ফেলতে চাও তো তাকে একটি বুলি শেখাও ; সেই বুলি আওড়াতে আওড়াতে সে হয়তো বিশ্ব জয় করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও মেরে ফেলবে। বৈচিত্র্যহীনতায় তার জীবন মরুসদৃশ হবে–কোনো-প্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি বা সৌন্দর্যের তাগিদ সে জীবন অনুভব করবে না। লিন্‌ইউটাঙের মতে এই ধরনের সর্বনাশক যুগে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ভবঘুরেই আমাদের একমাত্র ভরসা ; মানুষের মুক্তিকামনাকে সে-ই বাঁচিয়ে রাখতে পারে আর কেউ নয়। More than ever I believe that Great Vagabond who proudly refuses to give an inch of his liberties will be the saviour of the world.–বাড়িয়ে বলা কথা মনে হলেও এই উক্তিটির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। সেই সত্যটির প্রতি আজ আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। নইলে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া হ'বে আমাদের ললাট-লিপি।

সামাজিক মুক্তির এক পথ–বৈজ্ঞানিক পথ, আর বিজ্ঞান colourless রংছুট। ব্যক্তির মুক্তি কিন্তু রংছুট নয়, তাতে ব্যক্তি-মনের রং লাগে। ব্যক্তি যে কোনো পথে মুক্তি খুঁজে পাবে সরকারি গলায় কেউ তার নির্দেশ দিতে পারে না। সে-পথ ব্যক্তির নিজের পথ। তার ভাবনা-কল্পনা, বুদ্ধি, অনুভূতি, শিক্ষা-দীক্ষা তাকে সে-পথের খোঁজ দেয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি' দেখা দিতে আসে জনে জনে
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।

তখন তাকে কেবল কবিত্ব ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যক্তিমুক্তির কোনো ধরাবাঁধা সরকারি পথ নেই; তা আত্মসৃষ্ট, সুতরাং বিচিত্র-গতি। সভ্যতার পুনঃ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে আজ এই কথাটা ভালো করে মনে রাখা দরকার।

মানুষ জাতি হিসেবে চরিত্রহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। সুতরাং অর্থনীতির হাতকড়া পরিয়ে তাকে বন্দী করা হোক। তাতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। বরং মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই তাতে খুশী হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের কণামাত্র সুযোগও যেন মানুষ না পায়। কেননা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের এত ছড়াছড়ি সত্ত্বেও সে যে অন্ধের মতো কেবল লোভ ও মাৎসর্যের সেবা ক'রে চলেছে তার হেতু এই অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, এই নৈরাজ্যের দরুনই উক্ত রিপুদ্বয়ের 'সেবাইৎ' নিযুক্ত করে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেইজ্জত করেছে। তাই এখানে কড়া শাসনের প্রয়োজন। Sacrilege বা পবিত্র বস্তুর অপব্যবহারের শাস্তি মানুষকে পেতেই হ'বে; নইলে তার নিস্তার নেই।

কিন্তু ব্যক্তিমনের প্রকাশের ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি না থাকাই ভালো। এখানে নৈরাজ্য তথা উচ্ছৃঙ্খলতা যদি নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, অর্থাৎ তাতে যদি অমৃতের স্পর্শ না লাগে তাতে কারো কিছু আসবে যাবে না, আর যদি লাগে তো তাই হ'বে সভ্যতাসৃষ্টির চমৎকার উপাদান। সভ্যতা একপ্রকার মানসিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি, এ কথা মনে রাখা দরকার। অমৃতের আকাঙ্ক্ষা ব্যাপারটাই কি একটা ব্যক্তিতান্ত্রিক তথা দলছাড়া ব্যাপার নয়?

নিজের দিকে নজর রেখে কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। জীবনের সাধারণ কাজ-কারবার থেকে শুরু করে খাওয়ার টেবিল পর্যন্ত যদি আমাকে আইন-কানুনের রজ্জুতে বেঁধে দেওয়া হয় তো আমি আপত্তি করব না। আমাকে যা খেতে দেওয়া হবে তা-ই খাব, যা করতে বলা হবে তা-ই করব। যে সমাজের সেবায় আমি বেঁচে আছি–জীবনের বিচিত্র স্বাদ গ্রহণ করছি, সে-সমাজের ঋণ আমাকে শোধ করতেই হ'বে। নইলে নীতির সমর্থনের অভাবে জীবন দুর্বল হ'য়ে যাবে। আর দুর্বল জীবন নিয়ে পৃথিবীতে কোনো আত্মাই লাভ করা যায় না–না জীবাত্মা, না পরমাত্মা। তাই নিজের অন্তরাত্মার পরিপুষ্টির দিকে তাকিয়েই আমাকে সমাজের সেবা ক'রে যেতে হ'বে।

কিন্তু আমার পড়ার ঘরে যেন কোনো প্রকার ফতোয়া জারি করা না হয়। একটা পাঠ্যের লিস্টি টাঙিয়ে দিয়ে যেন আমাকে স্কুলের ছাত্র বানিয়ে দেওয়া না হয়। এখানে আমার সম্রাটত্ব, আমার রুচির একচ্ছত্রত্ব বজায় থাক। বারো আনা জীবন আমি সমাজকে দিলাম, চার আনা আমার নিজের থাক–একান্তভাবে নিজের থাক। এই চার আনা জীবনেই আমি আমার পরম সত্তাকে উপলব্ধি করব। তাতে যে শুধু আমার নিজেরই লাভ তা নয়, সমাজেরও লাভ। কেননা, আত্মসাক্ষাৎকার বা বিশ্বসাক্ষাৎকার এখানেই ঘটে। দলে যখন থাকি তখন দলকেও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না, বিশ্বের তো কথাই ওঠে না। একলা যখন থাকি তখনই বিশ্বকে পাওয়া যায়। তাই আমার এই একলা থাকার ঘরটি–পড়ার ঘরটি বিশ্বসঙ্গমের সহায়ক বলে নবনবসৃষ্টির সূতিকাগার। এখানে আমার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকতে দাও–বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে আমাকে উত্যক্ত কোরো না।

শিল্প-সাহিত্যের জগৎ ব্যক্তিমনের আত্মপ্রকাশের জগৎ। সুতরাং তা কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের অধীনে আসতে পারে না। ফতোয়া দিয়ে আর যাই হোক, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। তাই জি. বি. এস. যখন বলেন, অন্যান্য ব্যাপারের মতো

শিল্প-সাহিত্যের জন্যও মন্ত্রী দরকার তখন আমরা তাঁর কথায় সায় দিতে পারিনে। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মানে শিল্পের সজীবতানাশ ও বৈচিত্র্যহানি। হয়তো নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে উজিরবাহাদুর তার নিজের রুচিটি, অথবা আরো সত্য করে বলতে গেলে, রাষ্ট্র তার উপরে যে রুচিটি চাপিয়ে দিয়েছে সেটি [...] শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ফলে শিল্পের প্রাণ যে 'ভাইট্যালিটি' বা সজীবতা তা নষ্ট হয়ে যাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যও অন্তর্ধান করবে। কেননা, ফরমাশী রচনা কখনো বলিষ্ঠ রচনা হ'তে পারে না, আর ফরমাশ বৈচিত্র্যের ধার ধেরে চলে না–তা হয় একরঙা, এক তরফা।

প্রথম প্রথম হয়তো কোনো কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন লেখক বা শিল্পী লোভের হাতে ধরা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'বে ব'লে মনে হয় না। যখন তারা দেখবে যে তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের শিল্পীরাও পুরস্কৃত হচ্ছে, তারা উঁচুদরের শিল্পী হয়েও অপুরস্কৃত থেকে যাচ্ছে, তখন তাদের পক্ষে মাথা খাড়া রাখা কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে। টাকার ফাঁদ বড় ফাঁদ। সে ফাঁদে তারা ধরা দেবেই।

এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বড় সৃষ্টি হয়েছে আত্মার তাগিদেই হয়েছে, বুদ্ধির তাগিতে হয় নি। বুদ্ধি আত্মার তাঁবেদারি করেছে। এখন থেকে রচনা আত্মার তাগিদে রচিত না হয়ে বুদ্ধির তাগিদে রচিত হতে থাকবে। কেননা, কেনাবেচার জগৎ আত্মার জগৎ নয়। বুদ্ধির জগৎ। তাই শিল্প-সাহিত্যের জগৎটি অনিয়ন্ত্রিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। নইলে ক্ষতির সম্ভাবনা। ফরমাশের প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যে মোল্লাকির প্রাদুর্ভাব ঘটবে, আর মোল্লাকি ধীরে ধীরে সৃজনীবুদ্ধির রক্ত শুষে নেবে।

স্বেচ্ছাচারের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র দরকার। নইলে তার নিজের এলাকার বাইরেও তা আক্রমণ চালাতে বাধ্য হবে। আর তা হবে মারাত্মক। শিল্প-সাহিত্যের জগতে স্বেচ্ছাচার হয়ে থাকে একটা খেয়ালের ব্যাপার, তাই তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। সামাজিক স্বেচ্ছাচারে কিন্তু ক্ষতির অন্ত থাকে না। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই স্বেচ্ছাচারে যদি অমৃতের স্পর্শ লাগে তবে তাই হয় সভ্যতার উপাদান, আর যদি না লাগে তো তা'তে কারো কোনো ক্ষতি হয় না।

ব্যক্তিমুক্তি মানে বুদ্ধি, অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার মুক্তি। এই মুক্তির দ্বারটি খোলা রাখা দরকার; নইলে জীবনের পরম ঐশ্বর্য উপলব্ধি হয় না বলে সভ্যতার আমদানী ব্যাহত হয়। কোনো কোনো ধর্মের প্রতি নজর দিলেই এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় চমৎকার সামাজিক বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো ধর্ম সংস্কৃতিসৃষ্টির উপায় হিসেবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তথা ব্যক্তিস্বাধীনতায় অবিশ্বাসই তার কারণ। এসব ধর্মের অধীনে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় নি তা নয়; কিন্তু যখনই হয়েছে তখনই ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। Militia দিয়ে দুর্দিনে মানুষকে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু বড় কিছু সৃষ্টি করা যায় না। নিজেদের Militia-য় পরিণত করছে বলে ঐ সকল ধর্ম মানুষকে উৎকর্ষ সাধনের প্রেরণা দিতে পারে নি। ভাবের চেয়ে আইনকে, প্রবণতার চেয়ে পদ্ধতিকে বড় করে দেখেছে বলে তারা মানুষের আন্তরিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের এই ব্যর্থতা থেকে সমাজবিদ্‌দের শিক্ষা নেওয়া দরকার। নইলে

তারাও পুনরায় এই ভুলটি ক'রে বসতে পারে।

ব্যক্তিসৃষ্টির জন্যই সমাজসৃষ্টি। সমাজসৃষ্টির ধরাবাঁধা পথ থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিসৃষ্টির কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই। প্রথম দিকে বিদ্যালয় কিছুটা সহায়তা করে বটে, কিন্তু সে সামান্য। আসল কাজটুকু ব্যক্তির নিজেরই করে নিতে হয়। স্বশিক্ষিত না হলে সুশিক্ষিত হওয়া যায় না–এ কথায় সন্দেহ প্রকাশের যো নেই। তাই ব্যক্তিমুক্তি তথা চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার প্রয়োজন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল করার অধিকার না থাকলে নব নব সত্যের মুখ দেখা যায় না। কেননা, দেখতে পাওয়া গেছে, আজকে যা মিথ্যা বলে নিন্দিত কালকে তাই সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। মহাপুরুষের প্রায় সকলেই Heretic বা প্রচলিত মতে অবিশ্বাসী। তাঁদের পথটি যাতে কণ্টকিত না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। নব নব ভাব ও চিন্তার স্পর্শে তাঁরাই জগৎকে সঞ্জীবিত রাখেন।[১]

১. চট্টগ্রাম প্রদর্শনী কর্তৃক আহূত সাহিত্য সম্মেলনীতে পঠিত।

সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

সাহিত্য-জগতে সাধারণতঃ তিন প্রকার লেখক দেখতে পাওয়া যায়। এক প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন নিজেকে খুশী করবার জন্য–নিজের মনের খেয়ালে। আরেক প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন সমঝদার পাঠকের বাহবা পাওয়ার জন্য–তাঁদের মনোমত ক'রে। আর তৃতীয় প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন দশজনকে খুশী করবার জন্য–দশজনের মর্জি মাফিক।

প্রথম প্রকারের লেখকদের লেখা পড়ে এই মনে হয় যে, তাঁদের মনে আনন্দের আবেগ আছে এবং তা প্রকাশ করবার জন্যও তাঁরা উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কি ক'রে যে সে-আনন্দ যথাযথভাবে ছবির মতো ক'রে প্রকাশ করতে হয়, তার নিয়ম-কানুন তাঁদের ভালো জানা নেই। মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য যে এল্‌জাবরার ফরমুলার মতো কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে, তা বলা আমার অভিপ্রেত নয়। সে-নিয়ম লেখকের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি থেকেই সঞ্জাত, বাইরের থেকে লাভ করা অসম্ভব। তবু সাজাবার-গুছাবার জন্য দরকারী যে architectonic skill বা মিস্ত্রিবুদ্ধি, এই ধরনের লেখকদের লেখায় তা নিতান্তই বিরল। কারণ, জগত ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য সব চাইতে আবশ্যকীয় যে দু'টি জিনিস–তিতিক্ষা পর্যবেক্ষণ–তাদের ধার ধেরে চলা এঁদের পক্ষে অনেকটা কষ্টসাধ্য। আপন প্রাণের উদগ্র সুরা পান ক'রে এঁরা চলেন হাওয়ার বেগে–চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার সময় কোথায়? অনায়াস-শক্তিকে আয়াসের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নেবার সংযম এঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাই বিধিদত্ত শক্তির কাঁচা মালই এঁরা সরবরাহ করেন, তা আর পাকা ক'রে তুলতে পারেন না। মানে, এঁদের সৃষ্টি বিধাতারই সৃষ্টি, এঁদের নিজের কিছু নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, কেবল সুকণ্ঠ হলেই ভালো গান গাওয়া যায় না, কেবল স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাও ভালো সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। উভয়ের জন্যই প্রস্তুতি দরকার–গানের বেলা কণ্ঠের আর সাহিত্যের বেলা মনের।

অবশ্য অনেকে ব'লে থাকেন যিনি যতো আর্টের চর্চা করেন, তাঁর সাহিত্য ততো মূল্যবান। কথাটায় আমি তেমন সায় দিতে পারিনে। কেন, বুঝাবার চেষ্টা করছি।–প্রাণের জাগরণে মনের খুশীতে অনেকেই নাচে। কিন্তু সবার নাচাই কি আর নাচা হয়? অথচ নাচা ভালো হচ্ছে না বলে এও বলা চলে না যে, তারা ভালো নাচতে পারছে না, কেননা, তাদের মনে আনন্দ নেই। –মনের আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু তা বাইরে সুপ্রকট করবার জন্য দরকার যে নৃত্যজ্ঞান, তার অভাব তাদের যথেষ্ট। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, প্রাণের আনন্দ ও নৃত্যজ্ঞান এ দু'য়ের মিলনেই সৃষ্ট হয় সত্যিকারের নৃত্য–একটির অভাবে আরেকটি পঙ্গু থেকেই যায়। নৃত্যের জন্য দরকারী যেমন নৃত্যজ্ঞান, সাহিত্যের জন্য আবশ্যকীয় তেমনি সাহিত্য-পদ্ধতি–আর্ট। আর্টবিহীন সাহিত্য–যতোই প্রাণের প্রাচুর্য থাক না তাতে–কখনো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য ব'লে গৃহীত হতে পারে না। সাহিত্যের সাহিত্যত্ব নির্ভর করছে শুধু মনের আনন্দ ও অনুভূতির প্রকাশের উপর নয়,

প্রকাশের ভঙ্গির উপর, কায়দার উপর। আর এই ভঙ্গির সৌষ্ঠব সাধনের জন্য দরকার আর্টের, বুদ্ধির অথবা পূর্বে যাকে বলছি architectonic skill তার।

দ্বিতীয় প্রকারের লেখকদের পানে তাকালে মনে হয়, এঁদের প্রাণশক্তি প্রথম প্রকারের লেখকদের মতো প্রবল নয়, কিন্তু মাথাটা একেবারে পাকা। কি ভাবে সাজালে গুছালে লেখাটি সমঝদার পাঠকের বাহবা পেতে পারে, সে-সম্বন্ধে এঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এঁদের লেখা প্রায়ই বেশ যথাযথ ও ঠিকঠাক হয়ে থাকে, এবং এই অতিরিক্ত যথাযথতার জন্যই তা perfect ও শ্রীসম্পন্ন হতে পারে না।[১] লিখনভঙ্গির কারসাজির দ্বারা এরা পাঠকের মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চালাকির দ্বারা মানুষের বাহবা আদায় করতে পারা গেলেও মানুষকে সত্যিকার আনন্দ দেওয়া যায় না। তাই ফরাসী সাহিত্যিক জুবেয়ার বলেছেন : Beware of tricks of style, স্টাইলের চালাকিতে ভুলো না। সাহিত্যের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিফ-হাল হলেও প্রতিভাবানের যে স্বাভাবিক শক্তি–যা লেখাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে–তা হতে এঁরা বঞ্চিত। ইংরেজি সাহিত্যে Pope ও Dryden-এর মধ্যে এ ধরনের লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম ধরনের লেখকরা যেমন হার্টের পূজারী দ্বিতীয় ধরনের লেখকরা তেমন আর্টের পূজারী, আর তা এত বেশী যে, এঁদের লেখা পড়লেই নাসিকা কুঞ্চিত করে বলতে হয়–Too artistic। এই দু'দল নিজ নিজ মতের চরমে গিয়েছেন। দ্বিতীয় ধরনের লেখকরা বুদ্ধির এতটা চর্চা করেন যে, প্রাণকে–চিত্তের স্বাভাবিক সরসতাকে, এঁরা আমলই দিতে চান না। কিন্তু বুদ্ধি-সৃজিত প্রাণবর্জিত সাহিত্য থিয়েটারের অভিনেতার অনুভূতিহীন অভিনয়ের মতোই কৃত্রিম। অভিনয় যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়, সত্যিকারের দরদের স্পন্দন এর পেছনে নেই। অভিনেতা হয়তো হাসছেন, কাঁদছেন, দুঃখ প্রকাশ করছেন ; কিন্তু হাসা, কাঁদা অথবা দুঃখের সত্যিকার অনুভূতি নেই তাঁর প্রাণে। প্রাণবর্জিত বুদ্ধি-সৃজিত সাহিত্যেও, প্রথমে না হোক, শেষে চোখে পড়ে একটা কৃত্রিমতা। রবীন্দ্রনাথ লিপিকার এক জায়গায় বলেছেন– "... প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে উঠে।"–কথাটা ভেবে দেখবার মতো।

বুদ্ধির পূজারী সাহিত্যিকরা মূর্তি গড়তে পারেন মন্দ নয়, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন না মোটেই। প্রথম দর্শনে মূর্তিগুলো সুন্দর দেখালেও পরিণামে বুঝতে পারা যায় প্রাণশক্তির অভাবে এরা নির্জীব, সুতরাং হয়তো অসুন্দরও–অন্ততঃ সজীব মানুষের তুলনায়। মানুষের চেহারায় নিয়তই যে ইঙ্গিতের লাবণ্য ফুটে উঠে পুতুলের চেহারায় তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পুতুল হাজার হলেও পুতুল। হার্টের পূজারীরা আবার সৃষ্টি করতে পারেন কিছুটা সজীব মূর্তি; কিন্তু তাও পূর্ণাবয়ব নয় বলে সর্বাঙ্গ-সুন্দর নয়। সাহিত্য সুন্দরের প্রকাশ। সুতরাং সজীব হলেও এঁদের রচিত সাহিত্য সমঝদার পাঠকের নিকট খুব বেশী আদরলাভ করে না। উপরোক্ত দু'ধরনের সাহিত্যের মধ্যে কারো কিছু মূল্য থাকলে তা প্রাণপ্রধান সাহিত্যেরই, এ-কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কবিতার বেলা প্রাণের প্রাধান্যই স্বাভাবিক। কারণ–

---

১ জুবেয়ার বলেছেন : "অতিমাত্রায় ঠিকঠাকের ভাবটা ভালো নয়,–কি সাহিত্যে কি আচরণে শ্রীরক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক"–আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।

—রবীন্দ্রনাথ

তবে আমরা এই মাত্র বলতে চাই যে, প্রাণশক্তি যদি একটু নিয়ন্ত্রিত না হয়ে দেখা দেয়, তবে তা যেন কেমন একটু বুনো বুনো ঠেকে।

তৃতীয় ধরনের লেখকদের লেখা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেননা এঁদের লেখা যে লেখাই নয় সে-সম্বন্ধে হয়তো সকলেই একমত। সাহিত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। সাহিত্যিক কখনো দশজনের একজন নন, দশের মধ্যে এগার। Emerson বলেছেন : He (poet) is isolated among his contemporaries, by truth and by his art, but with this consolation in his persuits that they will draw all men sooner or late... অবশ্য দশজনকে নিয়েই সাহিত্যিকের কারবার আর দশের আনন্দ ও বেদনাবোধই তার মাল-মশলা। কিন্তু তাই বলে তিনি দশের সঙ্গে এক হয়ে যান না,–একটি বিশিষ্ট মন, বিশিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে বিরাজ করেন সাধারণের মধ্যে। সাহিত্যে সেই বিশিষ্ট মনেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের সমস্ত বেদনা নয়,–বিশেষ বিশেষ বেদনা, সমস্ত আনন্দ নয়,–বিশেষ বিশেষ আনন্দ, সমস্ত আশা নয়,–বিশেষ বিশেষ আশা সাড়া জাগায় তাঁর প্রাণে। এখন এই যে নির্বাচন, এর হেতু কি? কেন অন্য সব বাদ দিয়ে এই জিনিস তিনি বেছে নেন, তাঁর আলোচনার বিষয়রূপে? উত্তর অত্যন্ত সহজ। এই বেছে নেওয়া, এত নির্বাচনের পেছনে আছে তাঁর রুচি, তাঁর ক্ষমতা ও স্বভাব ; আর বলাবাহুল্য এ সবেই তো রূপ পরিগ্রহ করে মানুষের ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের মূল্য কতো বেশী W.H. Hudson-এর একটি উক্তি থেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায় : "Literature, according to Matthew Arnold's much discussed difinition, is a criticism of life ; but this can mean only that it is an interpretation of life as life shapes itself in the mind of the interpreter ... The French epigram hits the mark—"art is life seen through a temperament, "for the mirror which the artist holds up to the world about him is of necessity the mirror of his own personality."

– সাহিত্যে যদি বস্তুতই একক হয়ে দেখা দিত, যদি জগতের সুখ-দুঃখ নিয়েই তার একমাত্র কারবার হত, তা হলে সাহিত্যের এত বৈচিত্র্য, এত রকমারিত্ব আমরা দেখতে পেতাম কি-না, সন্দেহ। কেননা, জগত সেই এক, মানুষের সুখ-দুঃখের ধারাও এক, সুতরাং তার প্রকাশও এক হবে, তা তো সুনিশ্চিত। কিন্তু তা হয় না। কারণ জগত এক হলেও যে-চক্ষু দিয়ে তাকে দেখা হয়, তা বিভিন্ন।

কিন্তু তৃতীয় ধরনের লেখকদের লেখায় এই বিশিষ্ট মন বা দৃষ্টির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। তাঁরা সাধারণত লিখে থাকেন দশজনের মন ভোলাবার জন্য–তাদের মন জুগিয়ে। তবে সত্যিকার সাহিত্যে যে সাধারণের কাছে কোনো appeal বা আবেদন নেই, তা নয়। জুবেয়ার বলেছেন–'লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে যেন বাছা বাছা কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি অথচ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি না'[২] অর্থাৎ লিখবার সময় মনে রাখা উচিত আমার এক লেখা সাধারণের কাছে পেশ করছি, অথচ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীরও অনুমোদন চাই। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের

২ . জুবেয়ার–আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

লেখকদের লেখায় সাধারণের কাছে appeal থাকলেও বিশিষ্টমণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণের চেষ্টা নেই ; আর এই জন্যই তা যথার্থ সাহিত্য-পদ-বাচ্য হতে পারে না। এঁদের লেখার পেছনে প্রাণের তাগিদ কি নামের আশা, কোনোটাই আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব অর্থের আশাই এঁদেরকে লেখায় প্রবৃত্ত করে। অন্তত বিয়ের প্রীতি উপহারের জন্য লেখা রঙচঙে বইগুলি দেখলে তাই মনে হয়।

অতএব, বুঝতে পারা যাচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের লেখকরা কিছুটা সাহিত্য সৃষ্টি করলেও তৃতীয় ধরনের লেখকের লেখা মোটেই সাহিত্য হচ্ছে না। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্ট হয় তখনি যখন এক অপূর্ব ইন্দ্রজালস্পর্শে মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও আনন্দ, হার্ট ও আর্ট একত্রে মিলিত হয়।[৩] এই মিলন সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। একে বাস্তব করে তুলতে হলে প্রথম ধরনের লেখকদের করতে হবে কিছুটা বুদ্ধির চর্চা, আর দ্বিতীয় ধরনের লেখকদের করতে হবে প্রাণের। এ দুয়ের মিলনেই সৃষ্ট হবে 'A thing of beauty,' সুতরাং 'A joy for ever'। প্রাণ অন্ধ, তাই সহায়তা গ্রহণ করতে হয় বুদ্ধির ; আমার বুদ্ধি নিশ্চল, তাই বাহনরূপে গ্রহণ করতে হয় প্রাণশক্তিকে। –এ সব হয়তো কোনো নতুন কথা নয় ; নিতান্তই পুরোনো। তবু সাহিত্য-চর্চার, শুধু তাই নয়, সত্যিকার জীবনচর্চার গোড়ার কথাও হয়তো এই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, খুব সাধারণ হলেও কথাটি সম্বন্ধে আমরা সব সময় সজাগ থাকিনে।

২

উপরোক্ত খেয়ালপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য থেকে সাহিত্য-জগতে দুটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে'–Realism ও Idealism–আদর্শবাদ আর বাস্তববাদ। এই দু'মতের মধ্যে প্রায়ই লড়াই লেগে আছে, আর সে-লড়াইয়ে বড় বড় সাহিত্যরথীরা যোগ দিয়ে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন। দেখতে জমকালো হলেও অন্যান্য তর্কের মতো এ তর্কও শূন্য প্রসব করে। প্রত্যেক দলই মনে করেন,–আমাদেরই জিত, বিরুদ্ধ পক্ষ এবার চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছে। আর এই ফাঁকে আসল তর্কটি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় সর্বপ্রথম এ তর্কটি আমদানি করেন স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, যখন ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ধর্ম ও দেশ-চর্চাকে বস্তুবিহীন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ডা: রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সুরে সুর ধরেন।[৪] তখন সবুজপত্র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি চমৎকার কথা বলেন। কথাটি প্রণিধানযোগ্য।–'Realism-এর পুতুল নাচ ও idealism -এর ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ ও জড় মিলিত হয়েছে, সে-কারণে যা হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেও একাধারে Realist এবং Idealist–কি বহির্জগত, কি মনোজগত দুয়ের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।[৫] বস্তুত মানুষের জীবনে কল্পনা ও বাস্তব ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সুতরাং সাহিত্যেও তাদের একটা সমন্বয় কামনা করা

৩ শুধু বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য কাগজের ফুল, শুধু প্রাণপ্রধান সাহিত্য বনফুল, আর বুদ্ধি ও প্রাণমিশ্রিত সাহিত্য বাগানের ফুল –মানুষ আর প্রকৃতি সেখানে হাত ধরাধরি করে চলে।

৪ তাঁদের বস্তুতন্ত্রতার আদর্শে আর অতি আধুনিকদের বস্তুতন্ত্রতার আদর্শে অনেক প্রভেদ। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন, সেই সাহিত্য যাতে দেশোন্নতির কথা প্রচুর। আর এঁরা বুঝতে বা বুঝাতে চাচ্ছেন : nakedness-prudery বা অরুহীনতা।

৫ সবুজ পত্র – মাঘ, ১৩২১।

স্বাভাবিক। দেহহীন আত্মার বন্দনা অথবা আত্মাহীন দেহের জয়গান, উভয়ই সমান বিসদৃশ। মনে হয়, সাহিত্যকে realistic ও idealistic এই দুভাগে বিভক্ত করে না দেখাই ভালো।

সাহিত্য যতদিন জীবনের আলেখ্য হবে এবং যতদিন কলের দ্বারা লিখিত না হয়ে সজীব মানুষের দ্বারা লিখিত হবে, ততদিন তাতে কম বেশী আদর্শবাদিতা থাকবেই। নামজাদা realistic সাহিত্যগুলিও এক হিসেবে idealistic সাহিত্য,–এক নবতন্ত্রের idealism-এর সূত্রপাত হয়েছে এদের মধ্যে। এমন যে শরৎচন্দ্র, যাঁকে আমরা বাংলা সাহিত্যে realistic সাহিত্যের গুরু বলে মানি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিই কি আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করে? রাজলক্ষ্মী, বিজয়া, পার্বতী আর কমলকে কি আমরা সচরাচর যেখানে সেখানে দেখতে পাই ? আর শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি কি আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী ?–আসলে শরৎবাবু ফটো তোলেন নি, ছবিই এঁকেছেন। তবে সে ছবিকে যথাসম্ভব বাস্তবতা দিতে, মানে, life-like করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

G.B.S.-এর মতে realistic সাহিত্যের গুরু Ibsen-এর নাটকের মূলকথা হচ্ছে–'His attacks on ideals and idealism.' কিন্তু কথাটায় কি সম্পূর্ণ সায় দেওয়া যায়? Ibsen-এর মানসকন্যা নোরাতেও তো আদর্শবাদের ছাপ কম লাগে নি। সতী-সাধ্বী পতিব্রতা নারীর চিত্র তিনি আঁকেন নি, বিদ্রোহিনী আত্মসম্মানজ্ঞানও তো এক নবতন্ত্রের আদর্শবাদ। মনে হয় Shaw 'আইডিয়াল' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। হয়তো প্রাচীন মামুলি বুলিগুলোই তাঁর কাছে ideal। কিন্তু যুগে যুগে নানা প্রয়োজন অনুযায়ী নব নব আদর্শের সৃষ্টি হওয়াও তো কিছু অসম্ভব নয় ; ইতিহাসের পাতায় তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। Shavianism-ও কি একটা ideal নয়? অন্যান্য আদর্শের মতো Shavianismও তো কম সম্মোহনের সৃষ্টি করে না। Shaw-এর মতবাদের জালে আটকালে মুক্তি পাওয়া যে কতদূর দুরূহ ভুক্তভোগীর তা অবিদিত নেই।[৬] আসলে ideal-কে ছাড়তে গেলেও ideal আমাদিগকে ছাড়তে রাজি কি-না সন্দেহ। Idealism চাইনে realism চাই, এ-ও তো একটা ideal। আদর্শ কি? জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ যা একান্ত করে আঁকড়ে ধরা যায়, ভাবরূপে যা নিত্য আমাদের শ্রদ্ধা ও ধ্যানের বস্তু হয়ে ওঠে, তাই তো আদর্শ। সুতরাং এই আদর্শ থেকে মুক্তি পাওয়া যে অনেকটা অসম্ভব, সামান্য চিন্তাশীলেরও তা ভেবে দেখা কষ্টসাধ্য নয়।

অতি আধুনিক লেখকরা প্রায়ই Realism-এর বাহাদুরি করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিই কি বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়? বুদ্ধদেব বসুর নিরঞ্জন রায়ের মতো নার্ভাস নিরীহ অথচ দুর্জয় সাহসী লোক, যিনি over nothing যুদ্ধ করতে পারেন এবং যুদ্ধ করতে করতে অসম্ভব রকম হাঁপিয়ে ওঠেন, বর্তমান জগতে কটি মেলে আমার জানা নেই। 'নিরঞ্জন দৈবাৎ মধ্যযুগ থেকে ছিটকে এসেছে, বিংশ শতাব্দীতে ও anachonism'–বজ্রধরের এই উক্তি মোটেই ফেলনা নয়। যতদূর মনে হয়, এই অসাধারণত্বের জন্যই গল্পটি জমেছে ভালো। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন–'যতই আমরা Realism-এর বড়াই করিনে কেন, অসাধারণ মানুষকে নিয়েই গল্প হয়।'–এখন এই যে অসাধারণত্ব, এ তো লেখকেরই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তব জগতে এর প্রতিরূপ পাওয়া দায়। অতনু মিত্র আর অমিতা চন্দর মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছেলে-মেয়েও হয়তো বাস্তব জগতে বিরল নয়। কিন্তু এমন সুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতা তো

---

৬ অনেকের ধারণা Shaw আইডিয়েলের ধার ধেরে চলেন না। Shaw-র নিজের ধারণাও হয়তো তাই। কিন্তু তাঁর নোবেল প্রাইজের inscription-এ আমরা দেখতে পাই : 'For his literary works, which is characterised by idealism and by humanity, ... ।' সুইডিস একাডেমীর সদস্যরা কি তবে বাতুল? Iconoclast-ও যে অনেকাংশে iconoclater এ কথাটা অনেক সময় আমাদের স্মরণ থাকে না। মূর্তিভঙ্গকারীরাও যে অনেক সময় নতুন মূর্তি সৃষ্টি করেন, উন্মাদনার আতিশয্যে তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না।

কোথাও দেখতে পাইনে। এই যে বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে পুস্তকের চরিত্রের বিভিন্নতা, এই তো কবির মানসসৃষ্টি, আর এইখানেই লেখকের আদর্শবাদিতা। তবু যে আমরা Realism-এর বড়াই করি তার কারণ, বর্তমানে আমরা অনেকখানি য়ুরোপিয় মতবাদের দ্বারা সম্মোহিত। Realism চাই, এ-কথাটির দ্বারা যদি বুঝান যায়,–শুধু সৌন্দর্যে চলে না সত্যের প্রয়োজন, তা হলে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তবু মনে রাখা উচিত– সাহিত্যের জন্য শুধু লজিকই নয়, ম্যাজিকেরও দরকার।

৩

সাহিত্যে বর্তমানে আরেকটি সুর শুনতে পাওয়া যায়। সে হচ্ছে cynicism-এর সুর, নৈরাশ্যের সুর। এ অতিরিক্ত আশাবাদেরই reaction বা প্রতিক্রিয়া। মানুষ অসম্ভব রকম আশা করতে করতে যখন দেখতে পায়, সে-আশা মোটেই ফলবতী হচ্ছে না, তখন সম্ভব রকম আশাতেও সে আর আস্থা রাখতে পারে না। ছেলেবেলায় মনে মনে যে ডেপুটি সাজে, বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সামান্য কেরানীগিরিকেও তার ভয় করে চলতে হয়।

মানুষ আশা করেছিল, একটা স্বপ্নরাজ্য, একটা শান্তিপূর্ণ millennium সৃষ্টি হবে এই জগতে। তখন জাতিতে জাতিতে বিরোধ, মানুষে মানুষে শত্রুতা, পুরুষ-নারীতে পার্থক্য, এ সবই লোপপ্রাপ্ত হবে ধরণীর বক্ষ থেকে। ধরা এক শান্তির আগার, এক মিলন-মন্দিরে পরিণত হবে। যাঁরা মানুষকে এই আশায় আশান্বিত করেছিলেন, তাঁরা এই স্বর্ণযুগের লক্ষণ পেয়েছিলেন জগতের কলঙ্ক কুশ্রীতার মধ্যেই। তাই তাঁদের একজনের মুখে ফুটে উঠেছিল–If winter comes, can spring be far behind?' কিন্তু এই যে Winter এলো আর যাবার নাম করল না, মৌরসী স্বত্ব নিয়ে বসে গেল চিরদিনের জন্য। Spring-এরও আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মানুষের কল্পনা গেল ঘুচে এবং আশার রংমহল থেকে খসে পড়ল সে মাটির পৃথিবীতে। আর এর জন্যই মাটির পৃথিবী তার কাছে অত্যন্ত মাটির পৃথিবী মনে হতে লাগল। সাহিত্য লেখকের মানসসৃষ্টি নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার পেছনে যুগ এবং tradition-ও কম কাজ করে না। আশাভঙ্গতা আজ জগতের সর্বত্র এক বিকট মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে, জগতের সুন্দর ভবিষ্যতে সহজে কেউ আর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। সুতরাং সাহিত্যেও তার কিছুটা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে, এ তো স্বাভাবিক।

Cynicism দু'প্রকার। এক প্রকার, সৌন্দর্য ও মহত্ব দেখবার দৃষ্টির অভাব থেকে জাত। আরেক প্রকার, প্রচুর অন্তর-সৌন্দর্যের সঙ্গে বাহ্য কদর্যতার বিরোধ থেকে সৃষ্ট। একদল লেখক আছেন যাঁদের চোখে সৌন্দর্য ও মহত্ব ধরাই পড়ে না ; মানে, তাঁদের দৃষ্টিটাই কুৎসিত, অন্তর সৌন্দর্যহীন। আরেক দল আছেন যাঁদের অন্তর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, চোখেও স্বপ্ননেশা বর্তমান। কিন্তু জগতের হীনতা কুশ্রীতার দ্বারা তাঁদের স্বপ্ন বারবার মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে বলে জগতের উপর তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের স্বপ্নের প্রতিরূপ জগতে দেখতে পান না বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ। প্রথম ধরনের Cynic-রা মানুষের দুর্বলতা, ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের Cynic-দের লেখায় বিদ্রূপের পরিবর্তে একটা সহানুভূতিই ফুটে ওঠে। মানুষ দুর্বল, অসহায় ; তাই তো করুণ রসে অভিসিক্ত করে তাকে দেখতে হয়। আমরা এক অদৃশ্য শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র, নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ে তোলবার ক্ষমতা আমাদের নেই, মাঝে মাঝে ঘটনা বিপর্যয়ের দ্বারা সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যায়,–এ-সবই হচ্ছে তাঁদের লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়।

এতদিন য়ুরোপই cynicism-এর লীলাক্ষেত্র ছিল। Hardy[৭] প্রমুখ লেখকের লেখায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এর ছোঁয়া লেগেছে। এটা রেলগাড়ি, স্টীমারের যুগ। শুধু তাই নয়, দ্রুততরগতি এরোপ্লেনও নানা দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় লাভ করতে আমাদের কম সহায়তা করছে না। সুতরাং তখন যার যার ভাব নিয়ে কোণায় বসে থাকা মুশকিল। যাঁরা নিজেকে জানিয়ে দিতে জানেন, তাঁরা গায়ে পড়ে জানিয়ে দেন–আমরা আছি। আর যাঁদের সে-শক্তি নেই, তাঁরা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠেন–হাঁ আপনি আছেন, আপনাকে মানি। তবু তা ভালো ; নিঃসাড় নিস্পন্দ ঘুম থেকে যে-কোনো রকমের জাগরণ ভালো। হাঁ, যা বলছিলাম ; বাংলা সাহিত্যে cynicism-এর হাওয়া লেগেছে। প্রমাণ : বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। বুদ্ধদেবে তা ঘৃণার ভাব উদ্রেক করেছে, আর প্রেমেন্দ্র মিত্রে কারুণ্যের। বুদ্ধদেব যেখানে নাক সিটকান, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে দুফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করেন, যদিও তিনি জানেন, 'অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না'। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুরটি কী কারুণ্যমণ্ডিত!

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম।
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।
তারি সন্ততি আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি।
মোদের সকল স্বপ্নের গায় না জানি কেমন করি

লেগেছে মলিন ধূলি।
* *
লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ!

আরেকটা নমুনা দেখুন–

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে।
ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুল্‌ল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।
* *

৭. Hardy marks man an insignificant part of the world, struggling against powers greater than himself, -- sometimes against system which he cannot reach or influence, sometimes against a kind of grim world-spirit who delights in making human affairs go wrong"– Long.

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোরে চলবে না
তুই যে মাটি, চিরকালের মাটি –
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে, –
মাটিরে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

Cynical লেখার মস্ত দোষ এই যে, আত্মবিশ্বাস দূর করে তা মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম করে তোলে। মানুষের বড় বড় আশা, বড় বড় আকাঙ্ক্ষা এ সাহিত্যে স্থানই পায় না। এঁদের কারো কারো কাছে মানুষ একটা শরীরী-কল ছাড়া আর কিছুই নয়–তাই এঁদের উক্তি–

সকলে আমরা শরীরী-কল, প্রথা-প্রাচীরের ভাঙি শিকল ;
এই সে গর্ব–মোরা বিফল,–দাহময় মর-দেহ ;
মানি না কিছুই, খুঁজি না মিল, গতিউচ্ছ্বাসে ছুটি ফেনিল,
ভ্রূকুটি-ভয়াল ভালে কুটিল সুতীব্র সন্দেহ।
*
পাপ করি, ভালো লাগে যে পাপ, অনুতম নাই অনুবিলাপ,
প্রেম শুধু ফাঁকি, ফাঁকা প্রলাপ, দৈহিক প্রয়োজন।[৮]

কিন্তু আমরা যে শরীরী-কল নই তার প্রমাণ, আমরা প্রথা-প্রাচীরের শিকল ভাঙতে চেষ্টা করি। কলের পক্ষে তো শিকল ভাঙা না ভাঙা একই–বন্ধন আর অবন্ধন তার কাছে সমান।

Cynical সাহিত্যের গুণ এই যে, এর দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে তার যথার্থ স্থানটি কোথায়। বর্তমানের গলদ-ত্রুটি ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হলে ভবিষ্যতের তাজমহল সৃষ্টির আশা দুরাশায় পর্যবসিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই গলদ-ত্রুটিগুলিকে চিরন্তন প্রমাণ করতে গেলেই যত মুশকিল। একটু আশার রশ্মিপথ না দেখালে মানুষের পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। দক্ষ শিক্ষক ছাত্রকে তার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ করে দেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভালো আশা জাগিয়ে তোলেন তার প্রাণে। আমাদের সাহিত্যে যেন আশার এই ক্ষীণ রশ্মিটি ম্লান হয়ে না যায়, এই আমার কামনা।

Cynic-দের লেখায় বিশ্বপ্রেমের মধুর বাঁশি বেজে ওঠে না, অথচ স্বদেশ প্রেমও তাঁদের তেমন আনন্দ দিতে সমর্থ নয়; বর্তমান তাঁদের কাছে রুক্ষ, অথচ ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্নেও তাঁরা বিভোর নন। ঘর তাঁদের ভালো লাগে না, আবার বাহিরও তাঁদের নাম ধরে ডাক দেয় নি–এমনি নিদারুণ ত্রিশঙ্কু-অবস্থা এই হতভাগ্যদের। এঁরা Browning-এর মতো 'All's right with the world,' অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো 'যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবি ভালো,' বলতে পারেন না। হয়তো এ তেমন অন্যায় কিছু নয়। এই শুভ করে দেখা, সুন্দর করে দেখা নিতান্তই Subjective। অর্থাৎ এ হচ্ছে Browning ও রবীন্দ্রনাথের মানসিক সৌন্দর্যের বাহ্যিক আরোপ। Cynic লেখকরা হয়তো আবার উলটে বলতে পারেন–'যেদিক পানে নয়ন মেলি কালো সবি কালো।' কিন্তু এ-ও বাড়াবাড়ি। জগতে যেমন অবিমিশ্র সৌন্দর্য নেই, তেমনি অবিমিশ্র

৮. অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

কদর্যতাও নেই। মানুষকে দেবতা করে আকাশে উঠিয়ে দেওয়া অথবা দানব করে পাতালে নামিয়ে দেওয়া উভয়ই সমান বোকামি ; কেননা উভয়ই unreal। মানুষ কামসর্বস্ব পশু নয়, আবার প্রেমসর্বস্ব দেবতাও নয়–এ কথা মনে রাখলে আমাদের প্রতিপদে ঠেকতে ও ঠকতে হবে। এই পৃথিবীর নরনারীর বুকে বুকে মদন ও রতির লীলাবাসর পাতা। তাই ধরণীকে উল্লেখ করে আধুনিক কবির উক্তি–

ফুলে ফুলে হেথা ভুলের বেদনা,–নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে হেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বনতাপ।
*
কায়ায় কায়ায় মায়া বুনে হেথা, ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দীঘিতে সাতশ হয়েছে এক আকাশের চাঁদ।
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে বাজে বাঁশী।
*
নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি ইশারায়
লক্ষ যুগের মহাতপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দর বসুমতী,
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়–কাম রতি!
নজরুল ইসলাম

এইখানেই শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা এসে পড়ে। সুতরাং সে-সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা উচিত।

৪

শ্লীল-সাহিত্য, অশ্লীল-সাহিত্য, নীতি-সাহিত্য, দুর্নীতি-সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই। Oscar wilde বলেছেন–"There is nothing as a moral or immoral book, books are well-written or badly written. That is all."–কবি যা লিখেছেন তা সুন্দর হয়েছে কি-না, উপভোগ্য হয়েছে কি-না, তাই দেখতে হবে ; শ্লীল কি অশ্লীল হয়েছে, তা নয়। শ্লীল বিষয় নিয়ে লিখলেও সাহিত্য না হতে পারে, আবার অশ্লীল বিষয় নিয়ে লেখাও সাহিত্যে উঁচু স্থান লাভ করেছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রিক ও হিন্দু পুরাণে অশ্লীলতার নিদর্শন কম নেই। কিন্তু তাই বলে সেগুলি পরিত্যক্ত হয় নি। বরং তাদের মূল্য অনেকটা বেড়ে গেছে। কারণ মানুষকে বড়ো করে না দেখলেও পূর্ণ করে দেখবার চেষ্টা আছে তাদের মধ্যে। দোষে-গুণে দেখাই আসল দেখা। মানুষের একটা দেহ আছে তা অস্বীকার করে লাভ কী? ইন্দ্রিয় মানুষকে কম আনন্দ দেয় না। আত্মা ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়ই আনন্দ অনুভব করে। এখানে Browning-এর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য : ...'nor soul helps flesh more than flesh helps soul.' Wilde-এরও এ ধরনের একটি উক্তি আছে : 'Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the senses but the soul.'–আত্মা যখন নির্জীব ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে তখন সূক্ষ্ম অনুভূতিই তাকে সঞ্জীবিত করে, আবার যখন উগ্র ও প্রমত্ত হয়ে ওঠে তখন আত্মানুভূতিই তাকে শান্ত স্নিগ্ধ করে তোলে। আত্মার পক্ষে নির্জীবতা ও ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উগ্রতা উভয়ই ব্যাধি, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

আমাদের দেশে একপ্রকার লোক আছেন যাঁরা সাহিত্যে sex-এর আলোচনা দেখলেই আঁতকে ওঠেন। আবার আরেক প্রকার লেখক আছেন যাঁরা sex ছাড়া আর কিছুই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় বলে মনে করেন না। এঁরা উভয়ই ভ্রান্ত। কেননা sex-প্রীতি জীবনের একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক দিক ; আর eros-এর মাধুর্য যে জীবনকে রঙীন ও মধুর করে তোলে এ কথা অস্বীকার করতে গেলে জীবনের বাস্তবতাকে অনেকখানি উড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু তাই বলে জীবনের সবখানি জুড়ে eros-ই একক হয়ে বিরাজ করছে না। মানুষের আরো অনেক দিক আছে। সেদিকে কিন্তু sex-প্রধান সাহিত্য-স্রষ্টাদের দৃষ্টি নেই। এই জন্যই এঁদের লেখা অনেকটা অপূর্ণ ও অস্বাভাবিক ঠেকে। Sex-প্রীতিও যেন এঁদের জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত নয়–একটা খেয়াল ও মাতলামির উপর ভর করে আছে। এইখানেই আমাদের আপত্তির কারণ। যে জিনিসটা উপভোগ করা হচ্ছে তার আনন্দের ক্ষণিকতা নিয়েও যেন এঁরা মনে মনে হাসেন। জীবনের পক্ষে এ কতদূর মারাত্মক ভেবে দেখবার বিষয়। কারণ, এ মনোভাব মানুষকে অবিশ্বাসী ও হালকা করে তোলে। Walt Whitman-ও sex নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় হালকামি ও বিদ্রূপের পরিবর্তে একটা স্তবের ভাবই দেখতে পাওয়া যায়। দেহকে তিনি দেখেছেন আত্মার মন্দিররূপে। তাই তাঁর উক্তি : 'I will make the poems of my body and of mortality, for I think I shall then supply myself with the poems of my soul and of immortality,"-এর থেকেই বুঝা যায় তাঁর কাছে শুধু ইন্দ্রিয় উপভোগই নয় ; আত্মার মিলনের সাগ্রহ প্রকাশ।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ;
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।

প্রেম সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর ও সত্য কথা কি হতে পারে, আমার জানা নেই। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সাধারণের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৃশ্যত এক হলেও আসলে অনেকটা পৃথক। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতির পেছনে আছে একটা সৌন্দর্য-সম্ভোগ-স্পৃহা। আর সাধারণের ইন্দ্রিয়-প্রীতি একটা instinct-এরই ব্যাপার। কবিরা ক্ষণিকের উপভোগকে অমরত্ব দান করেন কল্পনা ও স্মৃতির আলোকে মণ্ডিত করে। দেহের দাবী শেষ হয়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যায় না। সাধারণের কাছে তা ক্ষণিকেরই জিনিস, ক্ষণিকেই লয়প্রাপ্ত হয়,–দেহের আনন্দ আত্মার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় না। আমাদের sex-প্রধান সাহিত্যের স্রষ্টারা সাধারণের sex-প্রীতিকেই সাহিত্যে বড় করে দেখাতে চাচ্ছেন। এইখানেই তাঁদের গলদ। কেননা এ মানুষকে যথাপূর্বং তথাপরং অবস্থায় রেখে দেয়–ঊর্ধ্বে টেনে নেয় না। 'কাব্যশাস্ত্র কামশাস্ত্র ন'–এ কথা মনে না রাখলে সাহিত্যিকদের পক্ষে ভুল করা কিছু অসম্ভব নয়।

৫.

সাহিত্যে, বিশেষ করে আমাদের মুসলমান সাহিত্যে, প্রায়ই একটা চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়–ধর্ম-সাহিত্য চাই, মুসলিম-সাহিত্য চাই। কথাটা ভালো। ধর্ম-সাহিত্য যে আমরাও না চাই, তা নয়। কিন্তু ধর্ম শব্দটির দ্বারা তাঁরা কি বুঝতে চান?–মনুষ্যত্ব, বিশ্ববোধ ; সর্বানুভূতি, অন্তর্মুখিনতা, না, আচার-পদ্ধতি ও বিশেষ বিশেষ আদেশ পালন। যদি শেষের কথাগুলির সঙ্গে তাঁরা সায় দেন তবে বলতে হবে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সেগুলির সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। সাহিত্যিক সেগুলি পালন করতেও পারেন,

নাও পারেন ; তাতে সাহিত্যের কিছু আসে যায় না। সাহিত্যের বিকাশের জন্য দরকারী একটি অপ্রমত্ত শুদ্ধ বুদ্ধ-চিত্তের পরিচয় যাঁর লেখায় যতটা পাওয়া যায়, তাঁর লেখা ততটা মূল্যবান বলে গৃহীত হয়। ধর্ম-সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি উদার বিশ্ববোধ ও সর্বানুভূতির সাহিত্য। এ সাহিত্যের যে-কটা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে seriousmindedness, সত্যপ্রিয়তা, আত্মজিজ্ঞাসা, চিরন্তনতা, বিশ্বজনীনতা ও ঈশ্বরানুভূতির নাম করা যেতে পারে। এইভাবে দেখতে গেলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এমার্সন ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যকে ধর্ম-সাহিত্য বলা যেতে পারে। আমাদের সূফী-সাহিত্যও ধর্ম-সাহিত্য। তা আত্মজিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরানুভূতির এক চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু অত্যন্ত subjective বলে এ-সাহিত্য নিজের জন্য এক বৃহত্তর ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে নি।

যাঁরা মুসলমানী সাহিত্য চান তাঁরা আসলে কি বস্তু চান ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। মুসলমানী সাহিত্য বলতে তিনটি জিনিস বুঝায় : মুসলমানরচিত সাহিত্য, মুসলমান-সমাজ নিয়ে লেখা সাহিত্য, আর ধর্ম-প্রধান সাহিত্য। মুসলমানের রচিত সাহিত্যে মুসলমানের সমস্ত লেখাই স্থান পায়–এমন কি যাকে আমরা অনৈলামিক সাহিত্য বলি, তা-ও। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গীতনিচয়, নজরুলের বিদ্রোহী, আগমনী, রক্তাম্বরধারিণী মা পর্যন্ত এর গণ্ডির মধ্যে।[৯] মুসলমান-সমাজ নিয়ে লেখা সাহিত্য সেইগুলিই যেগুলিতে মুসলমান-সমাজের চিত্র যথাযথভাবে ফুটে ওঠে। এ-সাহিত্য অমুসলমান দ্বারাও লিখিত হতে পারে। আবার মুসলমান-ধর্ম-প্রধান সাহিত্য বললে বুঝতে হবে কোরান, হাদিস্ ও ফেকার আলোচনা।

এখন কোন্ ধরনের সাহিত্যকে মুসলমান-সাহিত্য বলা উচিত, আলোচনা করে দেখা দরকার। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের সাহিত্যকেই মুসলমান সাহিত্য বলতে চাই। তৃতীয় ধরনের সাহিত্যকে বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হচ্ছে। কারণ তা আসলে সাহিত্য পদবাচ্য কি-না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে। তবে যে তাকে সাহিত্য বলা হয়, তার কারণ, বাংলাদেশে ছাপার হরফে লেখা বই মাত্রই সাহিত্য। যে আলোচনায় ঘন ঘন Sanction বা অনুমোদনের প্রয়োজন তা নিয়ে, আর যাই হোক, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যিকের স্বাধীন মনন-শক্তি থেকে তিনি বঞ্চিত। শাস্ত্রালোচনাই যদি সাহিত্যের প্রাণ হত, তা হলে রবীন্দ্রনাথ না পড়ে পড়তাম শশীভূষণ তর্কালঙ্কার, আর গ্যেটে, এমার্সন, টলস্টয় না পড়ে পড়তাম মিশনারীদের লেখা–যার দিকে আমরা সাধারণত চোখ তুলেও চাইনে। সাহিত্যের পক্ষে শাস্ত্রানুগত্য নদীর পক্ষে মরুভূমির মতোই ভয়ঙ্কর। কেননা, তা লেখকের স্বানুভূতি নষ্ট করে দেয়,–আর স্বানুভূতিই যে লেখার প্রাণ, এ তো সকলেরই জানা কথা। সাহিত্যিক যে শাস্ত্র পড়েন সে হচ্ছে দিল্-কেতাব, বিশ্বগ্রন্থ। সাহিত্যিক সব সময়ই free-lance। স্বধর্মের হোক আর পরধর্মের হোক, অন্ধতা ও কুশ্রীতা কখনো তাঁর বিদ্রূপবাণ থেকে রক্ষা পায় না। সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান নিজের পানে যেভাবে তাকায় ; সাহিত্যিক হিন্দু বা মুসলমান সেভাবে তাকায়

৯. ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক পুরাণের প্রভাব বাইবেলের চাইতে কম নয়। এ প্রভাব বাদ দিতে গেলেও সাহিত্য অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ধর্মধ্বজীরা তা স্বীকার না করলেও সাহিত্য-রসিকরা তা স্বীকার করতে বাধ্য। আসলে সাহিত্যিকের মন কোত্থেকে আহার গ্রহণ করবে, তা কেউ আগে থেকে বলে কয়ে ঠিক করে দিতে পারে না। তা সাহিত্যিকের মনই খুঁজে নেবে, আর সে ক্ষেত্রে সহায়তা করবে তার temperament বা আভ্যন্তর-প্রকৃতি। কোনো সাহিত্যিকের temperament এমনও হতে পারে যে, symbol ছাড়া তার তৃষ্ণা মেটে না। তখন হিন্দু বা গ্রিক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এ ক্ষেত্রে ফতোয়া-মহার্ণবের নিষ্ঠুর আদেশ, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু তাঁর তৃষ্ণা মিটাতে পারে না।

না। 'সাধারণ (মূলে আছে সাম্প্রদায়িক) হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে জগৎকে এ কথা বুঝাতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান, তার পরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ তার পরে হিন্দু অথবা মুসলমান।"[১০]

সাহিত্যিকের পক্ষে শুধু নিজ সমাজকে নয়–বিশ্বসমাজকে ভালোবাসা উচিত। না বাসলে বিশ্বের কিছু ক্ষতি হয় না, হয় তার নিজেরই। কেননা, সে প্রাণের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। গাছ যেমন চারিদিকে শিকড় দিয়ে মাটির রস টেনে নিয়ে সঞ্জীবিত হয়, মানুষও তেমনি চারিদিকে প্রেমের শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। জগতকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যার বাহুর বিস্তার যতো বড়ো, তার মূল্যও ততখানি।

তবে সাহিত্যে যে শাস্ত্রের স্থান একেবারে নেই তা নয়। শাস্ত্র অর্থাৎ race-culture-এর ছাপ কোনো কোনো সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মিলটন ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। কিন্তু শাস্ত্র সেখানে তার বস্তুরূপ হারিয়ে রস ও ভাবরূপ পরিগ্রহ করেছে। মিলটন খ্রিষ্টানশাস্ত্র হজম করে তার রসটুকু নিয়েছিলেন ; আর রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু শাস্ত্র নয়, হিন্দু আধ্যাত্মিকতা নিয়েই আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্ম এক জিনিস নয়। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হজম করেও অনেকে সাহিত্য-সৃষ্টি করতে পারেন–যেমন সুফীরা করেছিলেন। কিন্তু শুধু এক ধরনের সাহিত্যই মুসলমান-সাহিত্য, অন্যগুলি নয়, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না।

এখানে কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য, মুসলমান-সাহিত্য, খ্রিষ্টান-সাহিত্য–এভাবে ভাগ করে দেখা ভুল। যদি ধর্মই সাহিত্যের ঐক্য ও পার্থক্যের কারণ হয়, তা হলে ফরাসী-সাহিত্য, জার্মান-সাহিত্য, ও ইংরেজী সাহিত্যের সৃষ্টি না হয়ে এক অবিভাজ্য খ্রিষ্টান সাহিত্যের সৃষ্টি হত। কিন্তু তা হয় নি,–শুধু ভাষার পার্থক্যের দরুণ নয়, মূলগত কারণে। উক্ত সাহিত্যত্রয়ের মধ্যে যে প্রভেদ সে শুধু ভাষার নয়, ভাবেরও বটে–ভাষার চাইতে ভাবেরই বেশী। সাহিত্যে জাতির স্বভাব নিয়েই কারবার। ধর্ম সে-স্বভাব গঠনে যতটুকু সহায়তা করে, সাহিত্যে তার ততটুকু অধিকার। বলাবাহুল্য ধর্মের চাইতে দেশ-প্রকৃতিই মানুষের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। বাইরের নীতির চাইতে রক্তের ধারার প্রভুত্বই বেশী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বাঙালিত্ব বর্জন করতে পারেন নি। আমিও দরকার হলে কালকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমার বাঙালিত্ব অপরিবর্তনীয়। ইচ্ছে করলেই আমি ইংরেজ কিংবা ফরাসী হতে পারি না। অতএব, বুঝতে পারা যাচ্ছে ধর্মের চাইতে দেশ-প্রকৃতির, মানে, জাতীয় স্বভাবের প্রভুত্বই জীবনে ও সাহিত্যে বেশী। তাই বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা বাঙালী হিন্দুর সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে যতটা নিকট-সম্বন্ধযুক্ত হবে, অন্য দেশী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে ততটা হতে পারে না।

প্রার্থনা করি : আমাদের সাহিত্য সুন্দর হোক, উদারতা ও বিশ্বজনীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে, সীমাকে নিয়েই অসীম, খণ্ডকে নিয়েই অখণ্ড। তাই সঙ্গে সঙ্গে এ কামনাও করতে হচ্ছে : আমাদের যুগের ও সমাজের স্বাতন্ত্র্যটুকুও যেন ফুটে ওঠে এর মধ্যে–নিতান্ত বেয়াড়া ভাবে নয়, স্বাভাবিক ভাবে।[১১]

---

১০. বাঙ্গালি মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা, নব পর্যায় ২য় খণ্ড।

১১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

নবযুগ

একটি নবযুগ আমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত; মান্য অতিথির মতো সম্বর্ধনা করে না আনলে সে ঘরে আসতে নারাজ। অনাহূত গৃহে প্রবেশ করতে সকলেরই লজ্জা হয়; নবযুগও লজ্জা অনুভব করছে। তার লজ্জা ভাঙানোর ভার আমাদের উপর। কিন্তু যে-অতিথি এল সে শত্রু না মিত্র, প্রকৃত হিতকামী না প্রতারক, তা না জেনে তাকে গ্রহণ করা যায় না। তাই তার যথাসম্ভব পরিচয় নেওয়া দরকার।

আগন্তুক আমাদের পর নয়; মানব সভ্যতার শিশু–অতীত ও বর্তমানের সন্তান। সে নিজ থেকেই আসে, তার সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হয় মাত্র; আর এ-ক্ষেত্রে অবহিত হওয়াই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা। তার কণ্ঠে যে-অস্পষ্ট বাণী তার অর্থ : হে মানুষ, ভয় করো না তোমার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান, অবিনশ্বর ও অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ, তার রক্ষার ভার আমার হাতে! আর সেজন্যই আমার আগমন।

তবে বর্তমান যুগের কি সে-সব রক্ষার ক্ষমতা নেই? শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবানকে ভুলে বর্তমানে আমরা কি শুধু অপকৃষ্টের সাধনা করে চলছি। ব্যতিক্রম হয়তো আছে, তবে মোটের উপর কথাটায় সায় না দিয়ে উপায় কি? মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সৃজনশীলতা আজ শোচনীয়রূপে পরাভূত। ধূর্ততা ও ফন্দিবাজি তাঁর স্থানে সমাসীন। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই নবযুগের আগমন।

পুঁজিবাদ জাঁতার মতো মানুষকে পিষে মারছে–স্বল্পসংখ্যক লোককে শক্তিশালী করে বেশীর ভাগ লোককে তাদের দাস বানিয়ে রাখছে। তাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই ক্ষতি–আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে। একদল অতিভোগের দরুন দৈহিক ও মানসিক স্থূলতা লাভ করছে, আরেক দল খাওয়া-পরার অভাবে কৃশকায় ও ক্ষীণবুদ্ধি হচ্ছে। আর জীবনের আনন্দের প্রস্রবণ যে-সহানুভূতি তা থেকে উভয় দলই বঞ্চিত। অন্য কথায়, উভয়দলই মনুষ্যত্বহীন— বিভ্রান্ত।

সুতরাং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন তা শুধু মজুরের কল্যাণের জন্য নয়–হুজুর-মজুর উভয়েরই কল্যাণের জন্য। এই আন্দোলন সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে সৃজনশীলতা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা দরকার। কারণ সৃজনশীলতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলনের প্রয়োজন।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি নানা কাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে আর এই আত্মপ্রকাশের মধ্যেই সত্যিকার আনন্দ। কবি ও শিল্পীর মধ্যে এই আত্মপ্রকাশের প্রেরণা অধিক বলে তারা সাধারণতঃ আনন্দের অধিকারী। বলাবাহুল্য আনন্দের অর্থ এখানে সুখ নয়, শক্তির উপভোগ–বাধা অপসারিত হচ্ছে এই বোধজনিত উল্লাস। অন্তর্নিহিত এই শক্তিকে যদি কেউ ঈশ্বর বা 'জীবনদেবতা' বলেন, তবে তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই শক্তির কাছে মাথা নত করেই আমরা সুন্দর। এই শক্তির উপলব্ধিতে সমস্ত দীনতা ও মালিন্য দূরীভূত হয়ে ভিতরের জ্যোতির্ময় রূপটি প্রাধান্য

লাভ করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভুবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। মানুষ যেন আনন্দিত মনে গাইতে থাকে :

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর ;
ধন্য হল অঙ্গ মম,
পুণ্য হল অন্তর।

কিন্তু এই জ্যোতির্ময়ের আগমন আজ বাধাপ্রাপ্ত। অর্থবণ্টনের অসমতা-হেতু মানুষ আজ হীন-প্রবৃত্তিগুলোর পূজায় রত। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হয়রান মানুষ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছে বলে জীবনের এই মহামহিম রাজাধিরাজটির সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত। তাই তার এই বিকৃত রূপ। সে-জন্য তাকে গাল দিয়ে লাভ নেই। কারণ মানুষ অবস্থার দাস ; আর বর্তমান অবস্থায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন না করে উপায় নেই। অন্তর্নিহিত শক্তির সাধনা শ্রেষ্ঠ দিক হলেও জীবনধারণ মানুষের প্রধান দিক ; আর প্রধান দিকটিকে খুশী না করে শ্রেষ্ঠ দিকটির প্রতি নজর দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাই রুটি-সমস্যার প্রাধান্য।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বেশীর ভাগ মানুষ পৃথিবীর প্রাচুর্যের মধ্যেও ভুখা–'পানিমে মীন পিয়াসী।' ধনসাম্য এর প্রতিকার করতে পারে, কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য এর গোড়ায়। ধনসাম্য আনতে হলে এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্ভাবনা কম, আর রাষ্ট্র মানুষের ভরণ-পোষণের ভার নেবে। কিন্তু কথাটায় অনেকেই আঁতকে উঠবেন : ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না তো মানুষের বাঁচার প্রেরণা কোথায়? বাঁচার প্রেরণা শুধু সম্পত্তি নয় আরো বড় জিনিস আছে সেই বড় জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুচ্ছ মনে হবে। পৃথিবীর বড় বড় মানুষের জীবনে প্রধান হয়ে উঠেছে সৃজনীশক্তির পূজা, সম্পত্তির পূজা নয়। সাধারণকেও এই শক্তিপূজার মর্ম ও আনন্দ উপলব্ধি করাতে হবে। তা হলেই সে সম্পত্তি-পূজার ব্যর্থতা বুঝবে।

কিন্তু সাধারণে বুঝলেও পুঁজিবাদীরা বুঝবে কি? তা না বুঝুক ; ভিত্তি নড়ে উঠলে চূড়া ধসে পড়বেই। মজুররা এক হলে হুজুররা কাবু হতে বাধ্য। তাই রব উঠেছে ; গরীব ভাইরা সঙ্ঘ-বদ্ধ হও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করো। তোমরা এক জাতি এ-কথা ভুলো না।

ধনসাম্যের চেষ্টা আজ নানাভাবে চলছে। বিশ্বের চিন্তাশীলদের প্রায় সকলেই এর পক্ষে। শুধু তা-ই নয়, কোণের মানুষ কবি ও শিল্পীরাও এর পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কারণ অনুভব ও ধারণাশক্তি প্রখর বলে অন্তর্নিহিত সৃজনী-শক্তির ব্যত্থতা তাঁদের প্রাণে বাজে ; আর তাঁরা বুঝতে পারেন ধনের অসাম্যই এই দুরবস্থার হেতু। খুঁটিনাটি ব্যাপারে অনৈক্য থাকলেও তাঁরা একমত। তাঁদের বিশ্বাস : এই ধনসাম্যের যুগ আসবেই, তবে দুদিন আগে আর পরে। সেজন্য আদর্শকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায়, বরং অন্তরে জোর পাওয়ার জন্য অধিক নিষ্ঠা পোষণ করা উচিত।

ধনসাম্য একদিন স্থাপিত হবেই। তবে তাকে উপায় না করে লক্ষ্য করলে মানুষের সমস্ত চেষ্টা–তা যত মহৎ ও বিচিত্র হোক না–ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ মানুষের গোড়ার কথা সাম্য হলেও চূড়ার কথা অসাম্য, আর সেই অসাম্যই মানুষের ব্যক্তিত্ব। এই তত্ত্বটি উপলব্ধি না করে সভ্যতার মন্দির গড়তে যাওয়া বাতুলতা ; কেননা, তা হলে ভিত্তিই তৈরী হবে, চূড়া চিরদিনের জন্য অনির্মিত থেকে যাবে।

তাই নবযুগের নামটি সাম্যবাদ না দিয়ে ধনসাম্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ বিশেষভাবে আর্থিক জীবনের সমতাই আমাদের প্রয়োজনীয়। অন্য জীবনের সমতা মৃত্যু। আর আমরা মৃত্যুর নয়, জীবনের সাধক। যে সাম্যবাদ মানুষের ব্যক্তিত্বে ও

বুদ্ধির স্বাধীনতায় আস্থাহীন তা ধ্বংসকর–তার সম্বন্ধে চিন্তাশীলদের সতর্ক হওয়া উচিত। মানুষের সৃজন-শক্তির বিকাশের জন্যই অর্থনৈতিক সাম্যের প্রয়োজন–যদি সৃজনীশক্তিই ব্যাহত হয় তবে আর তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? একটি বড় সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য না রাখলে আমূল সমাজ-পরিবর্তনের সাধনা অর্থহীন। তার চেয়ে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই ভালো। সৃজনীশক্তির উৎস বুদ্ধির স্বাধীনতা সম্বন্ধে রলাঁর সতর্কবাণী :

> One's eyes must be blinded by the bandage of Neo-Marxist materialism not to see in the claims of the spirit anything more than a specious pretext hiding bourgeois interest and individualist selfishness. Independence of thought is an essential force in humanity. It will not be intimidated. If you persecute it, you will no doubt get the applause of all the false intellectuals, the cowards of the market-place. But real men of thought would be the heroes of the persecution : its martyrs, if need be. For out of their suppressed conviction a new faith will spring up. Reflect! Do not play with fire! It will consume you!

সৃজনীশক্তির পূজা ধর্মের স্থানটি নিতে পারে ; কারণ মানব-প্রকৃতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তা প্রয়োজনীয় ; আর স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্মরক্ষা। সৃজনীশক্তির উপলব্ধি ব্যতীত সাধুতা, সরলতা ও মনুষ্যত্ব কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়–স্রোতহীন জলরাশির মতো অন্তরপ্রকৃতি পঙ্কিল হয়ে ওঠে। এই পঙ্কিলতার কারণ স্বার্থবুদ্ধি, তথা নিজেকে আলাদা করে বিশ্বকে আত্মীয় করে দেখবার চেষ্টা। নিঃস্বার্থপরতার বাণী এই স্বার্থবুদ্ধি দূর করতে পারে না, বড় স্বার্থের বাণী শোনালেই তা দূর হয়। সূর্যের আবির্ভাবে তার দল যেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়, বড় স্বার্থের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তাও তেমনি লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে;–অন্ততঃ আত্মার বিশ্বমুখিতার পথে তা আর অন্তরায় সৃষ্টি করে না। সৃজনশীলতা সেই বড় স্বার্থ ; তাই তা নবযুগের এক প্রধান পরিচয়চিহ্ন। মুক্তবুদ্ধিতার অভাবে এই চিহ্নটুকু বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কারণ বুদ্ধির পীড়নে মনের লীলাধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, মন ক্রমশঃ বিমর্ষ হয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে মাথা গুঁজে থাকে।

রাসেলের ভাষায় নবযুগের পরিকল্পনাটি এই :

> The world that we must seek is a world in which the creative spirit is alive, in which life is an adventure full of joy and hope, based rather upon the impulse to construct than upon the desire to retain what we possesses or to seize what is possessed by others. It must be a world in which affection has free play, in which love is purged of the instinct for domination, in which cruelty and envy have been dispelled by happiness and the unfettered development of all the instincts that build up life and fill it with mental delights. Such a world is possible ; it waits only for men to wish to create it.[১৩]

১৩. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের দৈন্য

যে হিসাবে ভারতবর্ষকে Empitome of the world বলা যায়, সে হিসাবে বাংলার মুসলমানসমাজকে Empitome of poverty বলা যেতে পারে। কেননা, দুনিয়ায় যত প্রকার দৈন্য আছে, একমাত্র বাংলার মুসলমানসমাজেই তার সার সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হয়। দৈন্যের প্রকার নিরূপণের জন্য যদি কোনো Research scholarship থাকত, তা হ'লে সেই scholarship-এর ছাত্রের জন্য বাংলার মুসলিমসমাজ হতো একখানা made easy, যার দৌলতে সে স্বল্পায়াস ও স্বল্পকালের মধ্যেই উক্ত বিষয়ে বিশেষ রূপে ওয়াকিফহাল হতে পারত। বাস্তবিক নানা দেশ ও নানা কালের দৈন্যের নমুনা পাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশ পর্যটন ও ইতিহাস পঠনের আবশ্যকতা ঘুচিয়ে দিয়ে বাংলার মুসলমানসমাজ তার কাছে এই মহা-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়েই দাঁড়াত।

কিন্তু দুঃখ এই যে, দৈন্যের এত প্রাচুর্যের মধ্যেও মাত্র একটিই আমাদের সকলের চোখে পড়ে–সেটি আমাদের অতি প্রত্যক্ষ আর্থিক দৈন্য। কারণ হয়তো এই যে, মন ও আত্মাকে আমরা ফাঁকি দিয়ে চলতে পারি, কিন্তু পেটকে ফাঁকি দিয়ে চলা অসম্ভব। এর থেকেই বোঝা যায়, সভ্যতার ক্ষেত্রে আমরা কত পেছনেই না রয়ে গেছি। সভ্যতার যা লক্ষণ, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা অথবা মনের আহারের সন্ধানে ধাবিত হওয়া তা আমাদের জীবনে একেবারেই অনুপস্থিত। তবে আর্থিক দৈন্য যে একেবারে অবহেলিত হবার মতো কিছু নয়, সে-ধারণা আমাদের আছে। মানুষের মধ্যে যে-টুকু পশু, সে-টুকু একেবারে অবজ্ঞা করা চলে না; কিন্তু যে-টুকু দেবত্ব, সে-টুকুর পূর্ণ বিকাশের বন্দোবস্ত করা দরকার–এই-ই আমি বলতে চাই। আর্থিক দৈন্যবোধ যে আমাদের জীবনে জেগেছে, তা ভালোই। কিন্তু যতদূর মনে হয়, তার প্রতিকারের উপায় আমাদের কাছে এখনো একটা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে দেখা দেয় নি। দৈন্য সম্বন্ধে আমরা যেন একটা পীড়া আর উদ্বেগই অনুভব করছি ; কিন্তু দৈন্য দূর করবার জন্য তা-ই ত যথেষ্ট নয়, তার জন্য দরকার একটা সুবিহিত পন্থা গ্রহণের। কিন্তু সে-পন্থা এখনো আমাদের করায়ত্ত হয় নি বলেই মনে হয়। হলে বর্তমানে অর্থাগমের জন্য অত্যন্ত দরকারি সমবায়-সমিতি স্থাপন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণ, মোকাদ্দমার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কাজের থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা অত্যন্ত বাজে ও শক্তিক্ষয়কর 'বাজনা-আন্দোলন' নিয়ে এতটা আদাজল খেয়ে মেতে উঠতাম না। সমাজের উন্নতির জন্য আমরা এ পর্যন্ত বাস্তবিকই কোনো সত্যিকার আন্দোলন করি নি। বলকান যুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যে-সব আন্দোলনে হাত দিয়েছি, তার এ য় সবগুলিই সৃজনেচ্ছাহীন প্রতিবাদমূলক আন্দোলন। আশ্চর্য এই যে, এই প্রতিবাদমূলক আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো আন্দোলনে মুসলমানের–বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ততটা সাড়া পাওয়া যায় নি। অথচ প্রতিবাদমূলক আন্দোলনে শক্তিক্ষয় ছাড়া বিশেষ কোনো লাভ নেই।

আর্থিক দুর্গতি দূর করতে হলে আজ আমাদিগকে সত্যিকার সৃজনমূলক আন্দোলনে হাত দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদিগকে সমৃদ্ধিশালী

করে তুলতে হবে ; তাদের জীবনের অলসতা দূর করে তাদেরকে কর্মী করে গড়ে তুলতে হবে ; এক কথায় তাদের অন্তরে জীবনের স্বাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদেরকে জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলতে হবে। জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাই নি বলেই আজ আমরা শ্রম-বিমুখ, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা নব নব বৈভব সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাই নিজের পতনে নিজের দোষ না দেখে অন্য সমাজের কারসাজি দেখি, আর সে-জন্য তাকে গাল দিয়েই সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্য সমাপন করি। কিন্তু আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলমানের উন্নতি ইংরেজের নিকট পেশ অথবা হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা পোষণের মধ্যে নেই, আছে সমাজের জন্য মুসলমানেরই সত্যিকার পরিশ্রমের মধ্যে। বিশ্ব-মুসলিম জাগরণের স্বপ্ন আজ আমাদিগকে নিষ্কর্ম খেয়ালি করে রেখেছে। বাইরের মুসলিম দুনিয়ার চিন্তায় আজ আমরা এমনিভাবে মশগুল যে, স্বদেশের মুসলমান-সমাজকে সুস্থ, সুন্দর ও সব দিক দিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তুলবার প্রয়াস পাবার অবসর আমরা পাচ্ছিনে। স্বদেশের মধ্যে আমরা যেন আছি- নেই অবস্থায় পড়ে আছি। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে মুক্তি না পেলে আমাদের উন্নতি কথার-কথাই থেকে যাবে ; এই মোহ হতে মুক্তি পেয়ে স্বদেশের দিকে মুখ ফেরানোই আজ আমাদের কর্তব্য। একটা বিশেষ জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করলে শক্তির যথার্থ বিকাশ অসম্ভব। আমাদের বেলাও হয়েছে তাই ; সমস্ত বিশ্ব নিয়ে কল্পনা চলবে বলে আমাদের শক্তি পূর্ণভাবে একটা সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে বিকশিত হতে পারছে না। এ সম্বন্ধে তুর্কি-গৌরব মুস্তাফা কামালের উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর উক্তির সারমর্ম : 'Pan-Islamism, Pan-Turanism ইত্যাদি বহু নিষ্ফল স্বপ্ন মুসলমানরা এতদিন দেখে এসেছেন। তাতে মুসলমানজগতের লাভ কিছুই হয় নি, বরং লোকসান হয়েছে অনেক বেশী। এই সমস্ত কথায় ভীত হয়ে মুসলমানের বিপক্ষদল তাঁদের সকল চেষ্টাকেই আঁতুড়ে গলা টিপে মারতে তৎপর হয়েছেন। তা ছাড়া এত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ সম্যকরূপে পরিচালনার ক্ষমতা যে আধুনিক মুসলমানের নেই, এই অত্যন্ত সত্য কথা তাঁরা নিজেরা সহজভাবে স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হয়েছেন। কিন্তু আর এই সব স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। এখনকার সত্যকার প্রয়োজন, মুসলমানেরা যে যেখানে আছেন, তাঁদের প্রকৃত অবস্থা কি, কিসে তাঁদের দুঃখ দৈন্য অবসান হবে, পুনরায় কেমন করে তারা উন্নত হবেন, এই সমস্ত বিষয়েই পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া।'[১]–কামাল পাশার উক্তির এই সারমর্ম আজ যেন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। এই সব কথা থেকে অনেকে মনে করতে পারেন, ভিন্ন দেশের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে অন্যায়, এই আমার কথার উদ্দেশ্য। কিন্তু তা মোটেই নয়। বরং সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বজাতির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়াই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। কেননা, সহানুভূতিই আধ্যাত্মলোকের প্রথম সোপান, আর সমস্ত মানবের মধ্যে, এমনকি স্থাবর- জঙ্গম সমস্ত কিছুর মধ্যে স্বার্থ ব্যাপ্ত করাই আমি পরমার্থ মনে করি। তবে আমি এই মাত্র বলতে চাই, "ঘরে চেরাগ দিয়ে মসজিদে চেরাগ"–ঘরে ঘরে বলা এই কথাটি আজ যেন আমরা ভুলে না যাই। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,' এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে যেন আমরা মুক্তি পাই। আরেকটা কথা, দুনিয়া কিছু নয়–সব ফাঁকি। মুসলমানের জন্য দুনিয়ার দুঃখ-ভোগই কাম্য। কেননা তাই স্বর্গ-সুখ, ভোগের নিদান, ইসলাম ধর্মগুরুর জীবন ও শিক্ষার একান্ত বিরুদ্ধে হলেও এইসব কথা বর্তমানে আমাদের জীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে।

১. অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'মোস্তফা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

সুতরাং এই মনোভাবটি দূর করবার জন্যও আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা উন্নতি স্বপ্নে-পাওয়া জিনিসের মতো আমাদের বিনা চেষ্টায়ই আমাদের হাতে এসে পৌছোবে না। মানুষের জীবন বিধাতারই দান। সুতরাং তাকে উপেক্ষা করা আর বিধাতার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা–এক কথারই শামিল।

২.

আর্থিক দৈন্যের পরেই যে-দৈন্য আমাদের চোখে পড়ে, সেটি আমাদের শিক্ষার দৈন্য। হয়তো এই কথাটিই প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করিয়ে অনেকে বলতে চাইবেন, আমি পূর্বে বলেছি–সভ্যতার যা লক্ষণ মানসিক আহারের অনুসন্ধানে ধাবিত হওয়া, তা আমাদের মধ্যে নেই–এ কথাটি অত্যন্ত মিথ্যা। কিন্তু আশা করি, সামান্য চিন্তাশীলের বুঝতে দেরী হবে না,–এই যে আমাদের শিক্ষার স্পৃহা, মানসিক আহার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি বলেই তার জন্ম নয়, শিক্ষাটা অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই তার আবির্ভাব। পেটের তাগিদেই আজ আমাদের শিক্ষার চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে, মনের তাগিদে নয়। "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে,"–এই বাক্যটি হয়তো ছেলেদের মন ভুলানোর জন্য খুবই দরকারী। কিন্তু "লোখাপড়া করে যে, ডিপুটিগিরী পায় সে,"–এই বাক্যটির সাহায্য ব্যতিরেকে যে আজো মুসলমান সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রে নামান যায় না ; এতেই বোঝা যায়–ভারতীয় জীবনের শৈশব এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

শিক্ষার দুটি আদর্শ আছে–একটি প্রয়োজনের, আর একটি অপ্রয়োজনের। প্রথমটি ক্ষুদ্র আদর্শ, কেননা অর্থসমৃদ্ধির দ্বারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করাই তার লক্ষ্য ; দ্বিতীয়টি বৃহৎ, কারণ মানুষের মনোবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়াই তার কার্য। আমার মনে হয়, প্রথম আদর্শটি সামনে রেখেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই বৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ আজ আমাদের সমাজে দেখতেই পাওয়া যায় না। বছর বছর আমরা গ্রাজুয়েট্স পাচ্ছি মন্দ নয়, কিন্তু তারা সেই জাতের শিক্ষিত, যাদের দেখে Sir P. C. Roy বলেছেন, 'Degree is a cloak to hide one's ignorance.' ছাত্র হিসাবে তারা খারাপ, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় (আর তা আমার মুখে শোভাও পায় না।) কিন্তু তাদের দেখে মনে হয়, ক্লাসে খুব ভালো হয়ে চলে কোনোপ্রকারে একটা চাকরি বাগানই যেন তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহৎ ও বৃহৎ জীবন যাপনের জন্য দরকারী যে পীড়া আর বেদনা, শিক্ষা যেন তাদের জীবনে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি।

শিক্ষার মহৎ আদর্শে আমাদের প্রাণ নেচে ওঠে না। শিক্ষার কার্য হচ্ছে, জীবনের সর্বপ্রকার সামর্থের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া–মানুষের সুপ্ত বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন করা। মানুষ স্বভাবতঃই দ্বিজ। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সমস্ত কিছু শুধু বিধাতারই সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের বেলা এ কথা খাটে না। মানুষ বিধাতার সৃষ্টি তো বটেই, কিন্তু সে নিজেও নিজেকে কিছুটা সৃষ্টি করে। পশুর যেভাবে জন্ম সে-ভাবেই তার মৃত্যু। কিন্তু মানুষ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা নিজেকে কিছুটা পরিবর্তন করে নেয়। পশুর কোনো দায়িত্ব নেই, মানুষের দায়িত্ব আছে। সে-দায়িত্ব তার নিজেকে সৃষ্টি করার দায়িত্ব ; আর নিজেকে সৃষ্টি করার যে পদ্ধতি তা-ই হলো শিক্ষা। সুতরাং যে-শিক্ষা মানুষকে কিছুটা পরিবর্তিত না করে তাকে সাবেক অবস্থাতেই রেখে দেয়, বলতেই হবে, সে-শিক্ষা ব্যর্থ। অতএব মুসলমানসমাজে শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বাইরে আমরা

পুরো সাহেব, কিন্তু মনে আমাদের সেই সাবেক মানুষটিরই বাস। মনের দিক দিয়ে আমরা এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারি নি, কেননা হতে চাই নি। কতকগুলি ছোটখাট পার্থক্য ছাড়া আমাদের শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো প্রভেদই দৃষ্ট হয় না। শিক্ষিতরা পরে হ্যাট-কোট, যায় অফিসে-আদালতে কলম চালাবার জন্য, অশিক্ষিতেরা পরে গামছা-লুঙ্গি, যায় ক্ষেতে-খামারে হাল চালাবার উদ্দেশ্যে। শিক্ষিতেরা খায় কোর্মা-পোলাও-কাটলেট ; অশিক্ষিতেরা খায় কিছু পান্তাভাত নুন দিয়ে। শিক্ষিতেরা পান করে সিগার-সিগারেট, অশিক্ষিতেরা—তামাক-বিড়ি। আর অবসরকালে শিক্ষিতেরা আলাপ করে বিবি সাহেবার সঙ্গে, অশিক্ষিতেরা নিজের গরুর সঙ্গে। এই তো আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে প্রভেদ। এই প্রভেদের বিশেষ কোনো মূল আছে কি?

কিন্তু এই যে আমাদের মানসিক একঘেয়েমিত্ব অথবা অনগ্রসরত্ব একটু বিশেষ-ভাবে খুঁজলেই বুঝা যাবে, শিক্ষিতদের চাইতে শিক্ষা প্রচারকরাই এর জন্য বেশী দোষী। কেননা তাঁরা যে আদর্শ দিয়ে গেছেন, তা নিতান্তই ক্ষুদ্র, হীন বললেও চলে। কোনোপ্রকারে চট-পট করে গড়ে তুলে মুসলমানদিগকে চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত করে তোলাই যেন তাঁদের শিক্ষার আদর্শ ছিল। মনে হয়, এই সহজের ভাবই মুসলমানের সর্বনাশ করেছে—মুসলমানসমাজে বৃহৎ-ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত মানুষের আবির্ভাবের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু চলেছিল এক প্রকার মন্দ নয়। স্কুল-কলেজগুলি মুসলমান ছাত্রে ভরে আসছিল। দেখে প্রাণে আশা হচ্ছিল—হয়তো এইবার মুসলমানের দুর্দশা ঘুচবে। কিন্তু জোয়ারের পরই আবার দেখা দিয়েছে ভাটা! স্কুল-কলেজে পুনরায় ছাত্র-সংখ্যা কমতির দিকে যাচ্ছে—শিক্ষার প্রতি আবার একটা ঔদাস্যের ভাব জাগ্রত হয়েছে। শিক্ষার দিক দিয়ে যে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, তার পেছনেও কারণস্বরূপ আছে—আমাদের শিক্ষাপ্রচারকদের সেই পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র আদর্শ। পূর্বেই বলেছি, মুসলমানদের সরকারী চাকরিজীবী করে গড়ে তোলাই ছিল তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং যতদিন তা হাসিল হচ্ছিল, ততদিন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের খুবই, কিন্তু যেই চাকরির বাজার গেল, রেগে অমনি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দিলাম আমরা পিটটান। আমাদের পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক বটে, যে লোভের বস্তু দেখে দৌড় দিয়েছিলেম তা-ই যখন অদৃশ্য হলো, তখন আর দৌড় কেন? বাস্তবিক, বাস্তব ফল লাভের আশায় শিক্ষাক্ষেত্রে নেমেছিলেম বলেই আজ আমরা শিক্ষার প্রতি এতটা স্পৃহাহীন হয়ে পড়েছি। শিক্ষাপ্রচারকগণ যদি বলতেন—শিক্ষার উদ্দেশ্য ফল চাওয়া নয়, ফলতে চাওয়া, বাস্তব কিছু লাভ করা নয়, অন্তর ও বাহিরকে সুন্দর এবং লোভন করে গড়ে তোলা তা হলে একটু দেরীতে নামলেও, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এত সহজে আমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতাম না, শিক্ষার আদর্শের একটুখানি আস্বাদ পেলেও আমরা শিক্ষার জন্যই শিক্ষাকে জীবনে বরণ করে নিতেম। স্কুল-কলেজে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস পাবার আরেকটা কারণ আমাদের ধর্ম-শিক্ষার বালাই। এই ধর্ম-শিক্ষার জন্য সৃষ্ট New Scheme মাদ্রাসাগুলিই আজ আমাদের শিক্ষার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ভাবটা যেন এই—ধর্মকে বিপন্ন করেও আমরা ইংরেজী শিখতাম, কেননা তাতে জাগতিক লাভের যথেষ্ট আশা ছিল ; কিন্তু যখন সে আশাতেই পড়ল ছাই, তখন আর এ "বেলজ্জত গুনা" কেন? এই মনোভাব থেকেই বুঝা যায়, ইংরেজী শিক্ষার ভীতি আজো আমাদের মন থেকে পুরোপুরি অপসৃত হয়নি। ইংরেজী আইডিয়া আমরা চাইনে, চাই ইংরেজী ভাষা শিখতে। কঠিনতম ইংরেজীতে সাধারণ বাৎচিৎ করনে-ওয়ালাই আজ আমাদের কাছে যথার্থ শিক্ষিত। নব্যতন্ত্রের মাদ্রাসা ইংরেজী আইডিয়া দেয় না, দেয় ইংরেজী

ভাষা শিক্ষা। তাই সেখানেই ছেলেদের পাঠানো শ্রেয় মনে করছি। কিন্তু এই চেষ্টা যে নিতান্তই আত্মঘাতী তা বলা বাহুল্য। আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্ম-শিক্ষা নামে কোনো বিশেষ শিক্ষা নেই, সব শিক্ষাই ধর্ম-শিক্ষা ; যদি শিক্ষাটির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শিক্ষার দ্বারা জীবনকে মহৎ ও সুন্দর করে গড়ে তোলা।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে একেবারে নির্দোষ এ কথা আমি বলতে চাইনে। বর্তমানে আমরা যে-ভাবে শিক্ষা পেতে চাই, তার কিছুটা পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক। স্কুল-কলেজের ছাত্রগুলি যেন দর্জ্জির দোকানের কাপড়ের মতো এক-ছাঁটে-ছাঁটা মানুষ–শিক্ষা যেন তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ-সাধনে মোটেই সহায়তা করছে না। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে, প্রত্যেক মানুষের এমন কতকগুলি স্পষ্ট দিক আছে, যার দ্বারা সে অন্যান্য মানুষের সাথে হুবহু মিলে যায়, আবার এমন কিছু অস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য মানুষ থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রাখে। এই বৈশিষ্ট্যকে আমি মানুষের জীবনে বিধাতার ইঙ্গিত মনে করি, আর এর উৎকর্ষ সাধনেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সাধনা ; কেননা মানুষের জীবনে যা 'অতি', তাই আল্লাহ্‌র বিভূতি। "তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে"–কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তো Delphic Orach-এর মতো শব্দিত হয়ে মানুষের সামনে প্রকাশ পায় না। অতএব কোথায় তা পাওয়া যায়, এ প্রশ্ন উত্থিত হওয়া আশ্চর্য নয়। উত্তরে বলা যেতে পারে, মানুষের জীবনে যা শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, তা-ই বিধাতার ইঙ্গিত, তা-ই তাঁর ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে সফল করে তোলাই, ব্যক্তিগত জীবনে বিধাতার ইচ্ছাকে সাফল্যমণ্ডিত করা। কিন্তু দৃষ্টিমান গুরুর অভাবে এই বৈশিষ্ট্যের নাগাল আমরা সহজে পাইনে–হয়ত অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতেই থেকে যায়। গুরুর আবশ্যক শিষ্যকে কতকগুলি বুলি মুখস্ত করবার জন্য নয়, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিষ্যের আত্মার সামর্থ ও বৈশিষ্ট্যের খোঁজ নিয়ে তাকে স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই। শিষ্যের যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি তার অন্তরেই বিরাজমান। বাইরের গুরুর কার্য এই অন্তর-গুরুর সঙ্গে শিষ্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই ভাবে শিক্ষাপদ্ধতি চললে দেখতে পাব, সব ছেলেরই কিছু-না-কিছু শক্তি আছে, কোনো ছেলেই একেবারে বাজে নয়। সুতরাং শিক্ষা-বস্তুকে নয়, শিক্ষার্থীর অন্তরকে বড় করে দেখে তার ভিতরকার শক্তিকে জাগ্রত করাই যেন আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয়।

৩.

শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে কিছু না বলা অন্যায় মনে করি। আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার দৈন্য যে কত ভয়ানক, আশা করি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখাতে হবে না। স্ত্রী-শিক্ষার দৈন্যের পর্যাপ্তি নিয়ে কোনো তর্ক নেই, আছে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা নিয়ে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ সাধন, মানুষকে উন্নত ও মহৎ করে তোলা, তা হলে পুরুষের জন্য তা দরকারী হলে, স্ত্রীলোকের জন্য হবে না কেন, বুঝা অসাধ্য। স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে আজও আমরা সন্দিহান, এতেই বুঝা যায় অবনতির কোনো অতল-তলেই না আমরা পড়ে আছি। কথা আছে–"আপ ভালা তো জগত ভালা", নিজের জীবন সুন্দর হলে সমস্ত বিশ্বই সুন্দর, আর তা মন্দ হলে সমস্ত বিশ্বই কুৎসিত। Cynicism ক্লেদ-পূর্ণ জীবনেরই ফল। আজ স্ত্রী-

শিক্ষার নাম শুনলেই যে আমাদের চোখের সামনে নানা কদর্য ছবি ভেসে ওঠে, তা বাস্তবিকই ও শিক্ষার মন্দত্বের দরুন নয়, আমাদের জীবন ক্লেদপূর্ণ বলেই। সৎ ও সুন্দর চিন্তা থাকলে হয়তো অন্যরূপ নিয়েই তা আমাদের নয়ন-পথে উদিত হতো।

অনেকে বলে থাকেন ; স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা কখনো অনস্বীকার্য নয়, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা-পদ্ধতি পুরুষের শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া উচিত ; মেয়ে বি-এ, এম-এ, পড়ায় লাভ কি? তারা কি হাকিম আমলা হবে?–এ কথার অর্থ হয়তো এই, সাহিত্য, লজিক, ফিলজফি প্রভৃতি বিষয় পড়বার মেয়েদের দরকার নেই, তাদের দরকার শুধু সূচি-কর্ম, পাক-প্রণালী, প্রসূতি শুশ্রূষা প্রভৃতি গৃহস্থালীর জন্য নিত্য আবশ্যকীয় কেজো-জ্ঞান লাভ করা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর নিকট চিঠিপত্র লিখবার মতো লেখা-পড়া জানা। কিন্তু উত্তরে তাঁদের বলি, শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে তাঁরা অনেকটা দূরে সরে পড়েছেন। শিক্ষার যে আদর্শ–মানুষের অন্তরের সামর্থকে জাগ্রত করা, তা ভুলে গিয়ে মেয়েদের স্বামীর জন্য উপযুক্ত করাই যেন তাঁরা শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেছেন। এই উদ্দেশ্য নেহাতই মন্দ, নিতান্তই ঘৃণ্য। মেয়েদের শিক্ষা মেয়ের মানসিক উন্নতির জন্যই, বরের অভিরুচির জন্য নয়। বরের বাজার সস্তা করবার জন্য যে শিক্ষা, তা মেয়েদের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। সুতরাং সর্বদা বর্জনীয়। মানসিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা পেতে হলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সাহিত্য, লজিক, ফিলজফি প্রভৃতির দ্বারস্থ হতে হবে। এ-সব শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্যই Common– সাধারণ। অবশ্য এ সকল নিছক জ্ঞানলাভেই শিক্ষার শেষ নয়। আমাদের সাংসারিক জীবন যাপনের জন্য সকলেরই কিছু technical education লাভ করা দরকার। তাই আমাদের শিক্ষালয়গুলি থেকে technical education-এর অভাব দূর করা আজ অত্যন্ত দরকারী হয়ে পড়েছে। এই technical education-এর ক্ষেত্রেই থাকবে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার প্রভেদ, অন্যত্র নয়। আর সে-প্রভেদ নিরূপিত হবে, স্ত্রী-পুরুষের শরীর ও মনের গঠন-বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই। অপেক্ষাকৃত সবলদেহ ও রুক্ষপ্রাণ পুরুষের যেমন শোভা পায় না সূচি-কর্ম, তেমনি অবলা কোমল-প্রাণা স্ত্রীজাতির জন্য মানানসই হয় না মিস্ত্রির কাজ। General education-এর বেলা কোনো প্রভেদ না করে technical education-এর বেলা প্রভেদ করলেই যেন স্ত্রী-পুরুষ কেন, সকলের শিক্ষাই সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু কালি-কলম যতই খরচ করি না কাজের দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিজনক ও আদর্শের দিক দিয়ে অত্যন্ত অসুন্দর প্রচলিত পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন না হলে স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের সমাজে কখনো সার্থক হয়ে উঠবে না। পর্দা-প্রথার আওতায় আমাদের মেয়েরা হয়তো "কারো সাতেও নাই পাঁচেও নাই" গোবেচারী ভালো মানুষটি হয়ে উঠতে পারছে, কিন্তু সবল কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্না জাগ্রত নারী হতে পারছে না মোটেই। পর্দাপ্রথার দৌলতে commission-এর পাপ–কিছু করার অন্যায় হয়তো আমাদের মেয়েদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমই, কিন্তু ommission-এর পাপে–কিছু না করার অন্যায়ে তাদের জীবন পূর্ণ। পর্দা-প্রথার উচ্ছেদের দ্বারা মস্তবড় লাভ হবে এই যে, আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণাঙ্গ নারীর আবির্ভাবের পথ খোলাসা করে দিয়ে ommission-এর পাপ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করবে। তবে ভালোর সঙ্গে যেমন কিছু মন্দও জড়িত থাকে, তেমনি ommission-এর পাপের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কিছু commission-এর পাপও সমাজে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু তাতে ভীত হয়ে লাভ কি? গোলাপ তুলতে যাদের আকাঙ্ক্ষা, কাঁটার খোঁচাটুকু কি তাদের সহ্য হবে না? আর চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা মেয়েদের পবিত্রতার বা এমন কি মূল্য আছে? কয়েদীর

নীতিশীলতায় যাদেরই আস্থা থাক না কেন, আমি তাদের দলের নই। সুবিধার মধ্যে থেকে অন্যায় কার্য হতে বিরত থাকা আর অসুবিধার মধ্যে থেকে অন্যায় কার্য হতে বিরত থাকায় আসমান-জমিন ফাঁক। বেড়ার মধ্যে বর্ধিত বৃক্ষ আর বেড়ার বাইরে বর্ধিত বৃক্ষে যা প্রভেদ, পর্দার-মধ্যে-বর্ধিতা নারী আর পর্দার-বাইরে-বর্ধিতা নারীতে তাই প্রভেদ। বেড়ার মধ্যে হয়তো গাছ কোনোপ্রকারে ঠিক থাকতে পারে–মারা যায় না, কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষাকারী বিরাট বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না; বেড়ার বাইরে হয়তো কিছু গাছ গরুতে নষ্ট করে ; কিন্তু যা বেঁচে থাকে, তা হয় একেবারে সবলকাণ্ড বৃক্ষ–যা ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথেও যুদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। পর্দা-প্রথার বেড়ার মধ্যেও তাই সাধারণ নারী খুবই দেখতে পাওয়া যায়,–Towering personality-র নারী দেখতে পাওয়া যায় না মোটেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, সাধারণ মানুষ নয়, Towering personality-র স্ত্রী-পুরুষই একটা জাতির নির্ভর। তাই, নারীর নারীত্বের যথার্থ উদ্বোধনের জন্য এই অতি অনিষ্টকারী পর্দা-প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করা কর্তব্য।

কিন্তু চিন্তার রাজ্যে আমরা এতটা পেছনে পড়ে আছি যে, মনুষ্যত্বের জাগরণ, নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ, এই সব সূক্ষ্ম কথা বলা 'উলু-বনে মুক্তা ছড়ানো'র মতোই নিষ্ফল। তাই একটা মোটা দিক দেখিয়ে সমাজে সাড়া জাগিয়ে তুলতে চাই। আমাদের সমাজ যে আর্থিক দৈন্যে পর্যুদস্ত তা অতি প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে, স্ত্রী-শিক্ষার অভাব আর আমাদের অতি সাধের পর্দা-প্রথা এর জন্য কম দায়ী নয়। আমাদের সমাজের একটা অঙ্গ একেবারে unproductive বললেই চলে। Parasites-এর মতো তা শুধু consume করেই চলেছে–সৃষ্টি করছে না কিছুই। গৃহ-কর্তার সঙ্গে গৃহিণীও যদি কিছু উপার্জন করতেন তা হলে সমাজে অসচ্ছলতা কিছুটা কমে যেত নিশ্চয়ই। স্কুল-মাষ্টারী, মেয়ে ডাক্তারী প্রভৃতি মেয়েদের জন্য কিছুই অসম্মানজনক কাজ নয়, আর তাতে দু'পয়সা পাওয়া যায় বেশ। অতএব, যাতে আমাদের মেয়েরা উক্ত বিষয়সমূহে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে পারেন, তার চেষ্টা করা কর্তব্য।

আর একটা কথা। আমাদের প্রতিবেশীরা যখন স্ত্রী-শিক্ষা খুব তোড়জোড়ে চালিয়েছেন, তখন কি শুধু পুরুষের শিক্ষার দ্বারাই আমরা তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবো? আমার তো তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার একটা মোহ আছে। সেই মোহের দ্বারা সম্মোহিত না হওয়াই ভালো। কেননা, প্রতিযোগিতার আদর্শ ক্ষুদ্র আদর্শ ; তা মানুষকে মনের দিক দিয়ে ক্ষুদ্র করে রাখে। দরকারের খাতিরে সত্যাশ্রয়ী মানুষের চাইতে, সত্যের খাতিরে সত্যাশ্রয়ী মানুষের মূল্য অনেক বেশী। তবে এই সুবিধার ডাকে একটা জাতি যত সাড়া দেয়, নিছক সত্যের ডাকে ততটা সাড়া দেয় না। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। হিন্দু-বাল-বিধবার দুর্দশা দেখে মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহের বৈধত্ব প্রচার করছিলেন, তখন তা তাঁর নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধ সত্যের প্রচারই ছিল। কিন্তু তাঁর ডাকে ততটা সাড়া পাওয়া যায় নি। তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের কাছে তখন তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। কিন্তু যেই সুবিধার ডাক এলো, যেই বলা হলো বাল-বিধবার আধিক্য হেতু আজ হিন্দু-সমাজে লোকসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, সুতরাং বিধবা-বিবাহ অনুমোদনীয়–তখনই হিন্দু জনসাধারণ থেকে সাড়া পাওয়া গেল,–"হাঁ, বিধবা-বিবাহ চাই-ই, বিধবা-বিবাহ কখনো অননুমোদনীয় নয়।" তেমনি ছুঁৎমার্গ সত্যের বিরুদ্ধে সুতরাং বর্জনীয়,–এ কথা বললে ততটা সাড়া পাওয়া যাবে না; যতটা পাওয়া যাবে ছুঁৎমার্গ হিন্দু-সমাজে ঐক্যের প্রতিবন্ধক এবং এই ঐক্যের অভাবেই

হিন্দুগণ মুসলমানের সঙ্গে টিকে উঠতে পারছে না–এ কথা প্রচার করলে। মুসলমানও হয়তো এই হীন সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় মেতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে লেগে যেতে পারে। কিন্তু তার জানা উচিত, তা করলে তার সমূহ ক্ষতি। সুবিধার ডাক নয়, সত্যের ডাকই আজ তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক–সর্বাগ্রে সত্যকেই যেন সে জীবনে কামনা করে। বৃহৎ লক্ষ্য এবং মহৎ আদর্শই একটা জাতিকে উন্নত করে তোলে ; ক্ষুদ্রস্বার্থ তাকে ক্ষুদ্র করেই রাখে। এ সব অত্যন্ত পুরানো কথা। কিন্তু আফসোস এই যে, এ সব প্রচার করতেও আজ আমাদের কালি-কলম খরচ করতে হয়।

শিক্ষার পরে যে-দৈন্যের কথা বলতে চাই, তা আমাদের ধর্মবোধের দৈন্য। এই দৈন্যই আমাদের সর্বপ্রধান দৈন্য, আর এটাই অন্যান্য দৈন্যের কারণ। কিন্তু কথাটা শুনে হয়তো অনেকে চমকে উঠে ভাববেন–শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দ আমরা নির্বিচারে পালন করি, তার জন্য বিচার-বুদ্ধি, যুক্তিতর্ক সমস্ত সানন্দে বিসর্জন দিই, অথচ বলে কি-না আমাদের ধর্ম নেই। কিন্তু একটু রুঢ় হলেও না বলে উপায় নেই ; এ সব অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম নেই, আছে মর্মের উপলব্ধিতে। আমাদের অন্তঃকরণে যে-দুটি ইঙ্গিত উঠেছে–যাদের আমি নাম দিতে চাই হাঁ-মূলক অর্থাৎ আদেশের ইঙ্গিত ; আর না-মূলক অর্থাৎ নিষেধের ইঙ্গিত–তাদের মতানুসারে যাপিত জীবনই যে ধর্ম-জীবন, এ কথা আমরা সম্পূর্ণ রূপেই ভুলে গেছি। আর ভুলে যাবই না বা কেন, হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে যে-ভাবে আমরা শাস্ত্র-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি, তাতে অন্তরের সেই মহা-ইঙ্গিত দুটি আমাদের অনুভূতিতে না আসারই সম্ভাবনা বেশী। বোধ হয়, এই কারণেই ধর্ম-ভীতি আমাদের জীবনে যথেষ্ট বেশী পরিমাণে থাকলেও ধর্মবোধের আমাদের একান্ত অভাব।

ধর্ম বলতে আমি মনে করি, প্রেমপূর্ণ সৎ ও সুন্দর জীবন যাপন করা। প্রত্যেক ধর্ম-শাস্ত্রের ভিতরের কথাটি তাই। কিন্তু ভাব বাদ দিয়ে ধর্মের খোসাটা দেখি বলেই আমরা এ কথাটি বুঝে উঠতে পারিনে। বিচার-বুদ্ধি ধর্মের অন্তরায় নয় বরং তার সহায় স্বরূপ, অবশ্য তার চাইতেও বড় সহায় intuition বা সহজাত বুদ্ধি। এই বিচার-বুদ্ধি আর intuition-এর উৎকর্ষ সাধনের জন্যই যত শিক্ষা-দীক্ষা আর শাস্ত্র-পঠনের আবশ্যকতা। মানুষের অন্তর একটা ভাবের বারুদ ঘর, আর শাস্ত্র সেই বারুদ ঘরে আগুন ধরাবার জন্য দেয়াশলাইর কাঠি, জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠির একটু স্পর্শেই বারুদ ঘরে অগ্নিস্ফুরণ হয় বলে, তাকেই সে প্রকাণ্ড ব্যাপারের কারণ বলা যায় না। এখানে লজিকের ভাষায় দেয়াশলাইর কাঠিটা শুধু inciting cause, আর অন্তরটা হচ্ছে collocation of materials. Inciting cause তো শুধু উসকিয়েই দেয়, collocation of materials-এ-ই গোপন থাকে আসল শক্তি। বারুদ ঘরের মতো অন্তরটাই হচ্ছে শক্তির আড্ডা, আর দেয়াশলাইর কাঠির মতো শাস্ত্র শুধু তা উসকিয়ে দিবারই ক্ষমতা রাখে। অতএব বিচার-বুদ্ধি আর intuition-এর উত্তাপ কমিয়ে দেয়, দিস্তা দিস্তা শাস্ত্র পঠনের দ্বারা অন্তরজগতে ভাব জাগাবার চেষ্টা, কলস কলস জল ঢেলে দিয়ে বারুদ ঘরে আগুন ধরাবার চেষ্টার মতোই ব্যর্থ। বারুদের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিকে জাগ্রত করার জন্যই দেয়াশলাই, আর হৃদয়ের মধ্যে নিদ্রিত সৎ ও সুন্দর প্রবৃত্তিগুলি জাগাবার জন্যই শাস্ত্র। কিন্তু যেমন দেয়াশলাই ছাড়াও বারুদ ঘরে আগুন লাগতে পারে, তেমনি শাস্ত্র ছাড়াও মানুষের সৎ বৃত্তিগুলির উন্মেষ হতে পারে। তবু অন্তরকে না দিয়ে শাস্ত্রকে কেন যে আমরা প্রাধান্য দিই, বোঝা দুষ্কর। শাস্ত্র-পঠনের আবশ্যকতা তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবার জন্যই, তাকে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। মহাপুরুষের জীবনীও এ উদ্দেশ্যেই পঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে, আমরা আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব

তাঁদের পায়ে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি–শাস্ত্র আর মহাপুরুষ অন্তর-বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের হৃদয়ের উপর চেপে বসে আছে। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে মুক্তি না পেলে, আত্মার জাগরণ অসম্ভব। শাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে বলছিনে, মানুষকে শাস্ত্রের কাজে না লাগিয়ে, শাস্ত্রকে মানুষের কাজে লাগাবার কথা বলছি। অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত প্রেম আর সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপী অখণ্ড অদ্বৈতের অনুভূতিই ধর্ম। এই বৃহৎ ধর্মাদর্শটি সামনে রেখেই যেন আমরা সংসার পথে চলি। তা হলেই আমাদের সমাজের সমস্ত কদর্যতা অপসৃত হবে, আর তার স্থানে ফুটে উঠবে এমন এক ঐশ্বর্যময় শ্রী, রকমারিত্ব আর শালীনতায় যা অপূর্ব।

অর্থ, শিক্ষা আর ধর্ম-বোধের দৈন্য ছাড়া আরো দৈন্য আমাদের আছে। কিন্তু তারা উপরোক্ত তিনটি দৈন্যেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র, তাই তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে সাহিত্যিক দৈন্য সম্বন্ধে কিছু না বলা নিতান্তই অন্যায় হবে। সাহিত্য সমাজ-বৃক্ষের মূল নয়, তার ফুল। গাছের পক্ষে যেমন ফুল অতিরিক্ত জিনিস, সমাজের পক্ষেও তেমনি সাহিত্য অতিরিক্ত বস্তু। অবশ্য এই বস্তুর দ্বারাই যে গাছ এবং সমাজের মূল্য নিরূপিত হয়, তা অস্বীকার করার যো নেই। গাছ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেই, আমরা তার থেকে ফুল প্রত্যাশা করতে পারি ; আর সুস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ থেকেই সাহিত্য কামনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান মুসলমানসমাজ যে ভাবে দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে, তাতে তার থেকে সাহিত্য প্রত্যাশা করা অনেকটা জীর্ণ মৃতপ্রায় গোলাপ গাছ থেকে গোলাপ প্রত্যাশার মতোই নিষ্ফল। বর্তমান অবস্থায় আহারের অভাবে যখন সমাজের মন শুকিয়ে উঠছে, তখন তার থেকে সাহিত্য কামনা করা যে কত অসঙ্গত, আশা করি সামান্য চিন্তাশীলেরও তা বুঝতে দেরী হবে না। মুসলমানসমাজ যে সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত হয় নি, তার প্রমাণ, মুসলমানসমাজে যে-কজন সত্যিকার সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাউকেই আমরা দেখতে পারিনে। সত্যিকার সাহিত্য আমরা চাইনে, চাই বাংলা ভাষায় লেখা অতীতের গৌরবগাঁথা-পূর্ণ বিরাটাকায় পুস্তক। কিন্তু সাহিত্য তো এই চর্বিত চর্বনের মধ্যে নেই, আছে প্রতিভাবান লেখকের নিজস্ব মনন ও কল্পনার ঐশ্বর্যের মধ্যেই। সত্য বলতে কি, মুসলমানসমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই 'সাহিত্য' শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁদের অনেকেরই ধারণা, সাহিত্য সত্য জাতীয় উন্নতির জাগরণী গান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা কি সাহিত্যের সত্য পরিচয়? সাহিত্য জাতীয় উন্নতির চেষ্টায় কিছুটা সহায়তা করে বটে, তবে তা গৌণ ভাবে। জাতীয় উন্নতির নিদর্শন হলেও সাহিত্য জাতীয় উন্নতির নিদান নয়। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য–রূপ ও রস সৃষ্টি করা, আর তা সৃষ্টি হয় একটা সহানুভূতি ও প্রেম-পূর্ণ-দৃষ্টিতে জগতকে আপনার করে দেখবার প্রবৃত্তি থেকেই। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ নলিনীকান্ত গুপ্ত একটা মস্ত সত্য কথা বলেছেন,–সাহিত্যিকের মুক্তি জীবনের নবী হওয়ার মধ্যে নেই, আছে সত্যিকার রূপ ও রস সৃষ্টির মধ্যেই। এই রূপ সৃষ্টি, রস সৃষ্টি ততক্ষণ সত্য হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ না সমাজ উন্নত হয়ে উঠে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, কল্পনার ঐশ্বর্যে, রুচির শুচিতায় আর রসের গভীরত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের সমাজ যে এখনো এতটুকু উন্নত হয় নি, আমাদের জীবনের অন্ধতা, বিকৃত রুচি আর নীরসতার প্রতি দৃকপাত করলেই তা সহজে বোধগম্য হবে। গাছের যে উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যগ্র, তাই ফুল হয়ে দেখা দেয়, আর সমাজের যে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি উপছিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল, তাই সাহিত্য শিল্পাকারে প্রকাশ পায়। যে প্রাণশক্তিটুকু একান্তই দরকারী–যে-টুকু না হলেই

নয়–শুধু সে-টুকু দিয়ে গাছের পক্ষে ফুল আর সমাজের পক্ষে সাহিত্য দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং, মুসলমানসমাজে যখন দরকারী প্রাণশক্তিটুকুই নেই, তখন তার সে সাহিত্য কামনা করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। আমাদের মনে রাখা দরকার, সাহিত্য গোড়ার কথা নয়–আগার কথা। সমাজের দিকে চক্ষু বুজে সাহিত্যের দিকে খেয়াল দেওয়া, গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে গাছ থেকে ফুল প্রত্যাশার মতোই ব্যর্থ। তা-ই সাহিত্যিক দৈন্যের জন্য আক্ষেপ নয়, সাহিত্যের বিকাশের জন্য অত্যন্ত দরকারী সমাজসংস্কার আজ আমাদের একান্ত আবশ্যক। আমাদের যে ধারণা–সমাজ-দেহকে অপরিবর্তিত রেখেই আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হব, তা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। অর্থ, শিক্ষা আর ধর্ম-বোধের প্রাচুর্যই আজ সর্বাগ্রে আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। সাহিত্য পরের কথা।

এখানেই প্রবন্ধটি শেষ করতে পারতাম। কিন্তু আর একটি মারাত্মক দৈন্য সম্বন্ধে কিছু না বলে পারছি না। সেটি আমাদের দৈন্যবোধের দৈন্য। ধনের দৈন্য স্বীকার করলেও, মনের দৈন্য আমরা স্বীকার করতে নারাজ। এই পর্যাপ্ত বোধই আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল প্রকার দৈন্য সম্বন্ধে সজাগ নই বলেই আমাদের দুর্দশার সমাপ্তি হচ্ছে না। অভাব জানলেই অভাবের প্রতিকার হয়। কিন্তু অভাব সম্বন্ধেই যখন আমরা নিদ্রিত, তখন প্রতিকারের আশা সুদূরপরাহত। অভাবের তীব্র পীড়া আজ আমাদের অন্তরে জাগুক। তা হলেই আমাদের সমস্ত দৈন্য ঘুচবে, নইলে নয়।*

* ১৮/১/১৯৩১ তারিখে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে পঠিত।

মনুষ্যত্ব

মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা–জীব-সত্তা আর মানব-সত্তা। জীব-সত্তার কাজ প্রাণধারণ–আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। এখানে মানুষ বৈশিষ্ট্যহীন, প্রাণিজগতেরই একজন–অপরাপর প্রাণীদের মতো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ছুটাছুটি করা তার কাজ। কি করে বাঁচা যায় ও সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, সেই চিন্তায় সে অস্থির। কিন্তু প্রাণী হলেও মানুষ অপরাপর প্রাণীদের পশ্চাতে ফেলে এসেছে। বরং নিজের মধ্যে অনুভব করেছে এক নতুন সত্তা। এই নব-অনুভূত সত্তার নামই মানব-সত্তা, আর এখানেই মানুষ অপরাপর প্রাণী থেকে আলাদা। আত্মরক্ষা কি বংশরক্ষা নয়, মুক্তির আনন্দ উপভোগই এখানে বড় হয়ে ওঠে। মুক্তি মানে অস্তিত্বের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি, শুধু তাই নয়, এক নব সূক্ষ্ম অস্তিত্বের উপলব্ধি। ব্যাপারটা আসলে ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক। সাহিত্যশিল্পের মারফতেই এই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তাই তাদের এত মূল্য।

প্রাণধারণের জন্য সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, মনুষ্যত্ব নয়, প্রাণিত্ব ; আর অবসর সময়ে সাহিত্যশিল্পের রস-আস্বাদন, তা যতই অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন, মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব রসের ব্যাপার, তাই রসিকরাই বেশী মানুষ। জাতিধর্ম ও আদর্শ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারেন বলে রসিকরাই মনুষ্যত্বকে সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেন–কোনো বাধাই তাঁদের উপলব্ধি পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে না। (এখানেই মতবাদীর সঙ্গে রসিকের পার্থক্য ; মতবাদী যতই মানুষের উপকারের জন্য চীৎকার করুক না কেন কখনো মনুষ্যকে উপলব্ধি করতে পারে না–মতবাদের নেশাই তার উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর রসিক যত অকাজেরই হোক না কেন, মনুষ্যত্বের পূর্ণ উপলব্ধির সৌভাগ্য তারই।) অপ্রয়োজনের জগৎই মনুষ্যত্বের জগৎ ; এখানেই মানুষ আত্মার লাবণ্য উপভোগ করে। প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ না হলেও প্রাণধারণের ক্ষতি হয় না ; বাঁচার জন্য এরা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু মানুষের মতো বাঁচতে হলে এ সব না হলে চলে না। তাই একান্ত প্রয়োজনীয় না হলেও প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। এ সব নিয়ে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু এ সবের জন্য বাঁচে।

সাহিত্য ও শিল্পের জগৎ প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ। তাই এখানে অস্তিত্ব তথা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের কথা বড় হয়ে ওঠে না, প্রেম ও সহানুভূতির কথা বড় হয়ে ওঠে। প্রেম ও সহানুভূতি আত্মার ইন্দ্রিয়, আর এই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়ই মানুষ মানব-সত্তাকে উপলব্ধি করে।

মনুষ্যত্ব তথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ দিক হলেও প্রাণিত্বকে অবহেলা করা যায় না; বরং মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়েও চলা যায়; কিন্তু প্রাণিত্বকে বাদ দিয়ে চলা কঠিন। তাই মানুষকে প্রাণিত্বের সাধনাই করতে হচ্ছে বেশী। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রাণিত্বের সাধনারই নিদর্শন, আর তারই ফলে মানুষের জীবনধারণ আর

আদিম জৈব ব্যাপার না থেকে ধীরে ধীরে মানবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। 'মানবিক' হওয়ার অর্থ জৈব ব্যাপারটারই মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া নয়, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া–মানবোচিত হওয়া।

মানুষ তার বুদ্ধি ও কল্পনার সহায়তায় জৈব ব্যাপারটি সুনিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছে; সেজন্য পৃথিবী জুড়ে বিরাট আয়োজন চলেছে। খুব আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে নজর না রাখলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত চেষ্টাই ভণ্ডুল হতে বাধ্য। লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি–আত্মার লাবণ্য উপভোগ। শারীরিক চিন্তা থেকে মুক্তি চাই আত্মার জগতে প্রবেশের জন্য, এ কথা মনে না রাখলে জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নীচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

শিক্ষার এই দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নীচের তলায় বিশৃঙ্খলা। জীব-সত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়–উপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরো চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়–এ কথা মানুষকে ভালো করে বুঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে-সেখানে দু'একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই যে-তিমিরে সে-তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে-চেষ্টাও মানুষকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহার-তৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো-হাওয়ার স্বাদ-বঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে গান ধরবে :

আগর ফেরদৌস বরোয়ে জমিন আস্ত
হামিন আস্ত, হামিন আস্ত, হামিন আস্ত।
(স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ধরণীর 'পরে
তবে তা এখানে, এখানে, এখানে।)

কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো-হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা-ই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে-পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দী হবে সহজ দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে তা আমাদের বেশীদূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এই উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার উপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে ; আবার শিক্ষা-দীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে উপরে তুলতে হলে তাকে নীচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার উপর থেকে টানতেও হয়, শুধু নীচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ উপরে উঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই উপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নীচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে উপরের থেকে টানলে নীচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস উপরে উঠানো যায়–কিন্তু শুধু নীচের ঠেলায় বেশীদূর উঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষা-দীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজেই হতে পারে ; অব্যবস্থার মূলে লোভ, আর শিক্ষা-দীক্ষার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে– অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যা-ই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসাবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবানের মূল্য দেওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় ; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো ; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয়। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দুদিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ উপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও উপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে,–পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষা পাখা ঝাপটাবে কিন্তু উড়তে পারবে না।

আত্মার জগতের স্বাদ পাওয়া যায় সাহিত্যে, শিল্পে। তাই সাহিত্য-শিল্পের সহায়তায়ই মানুষের মনের উন্নয়ন সম্ভব হয়। গল্প-উপন্যাস ও কবিতা পড়তে পড়তে কী করে যে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম হয় মানুষ নিজেই তা টের পায় না। এখন থেকে সে রূপ ও রসলোকের অধিবাসী এবং সমস্ত জীবন রাজার মতো শাসন করা তার কাজ। এতদিন তার চালক ছিল ইন্দ্রিয়, এখন চালক হচ্ছে রূপবোধ, রসবোধ–অন্য কথায় মূল্যবোধ। নতুন রাজার শাসন মানতে-মানতে ইন্দ্রিয়গুলিও যে রূপান্তর লাভ করে! এতদিন তারা ছিল একক, এখন তাদের আরেকটি সঙ্গী এসে জুটেছে। এতদিন তারা তাদের আহার্য পেলেই খুশী হতো, এখন থেকে সহজে খুশী হয়ে ওঠা ভার হয়ে উঠলো। সঙ্গীর সত্তাটি যেন অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলতে থাকে : ভাই তোমরা তো খেলে, আমি তো উপোসী রইলুম, কই আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। সঙ্গীটির কথায় তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তাকে উপোসী রেখে তাদের মুখে আর অন্ন রোচে না, ফলে অনেক সময় তাদেরও উপোসী থাকতে হয়। তারা কী করে যেন টের পায় : ভোগের চেয়ে সম্ভোগ বড়, আর একসঙ্গে ইন্দ্রিয় ও আত্মার যে ভোগ তা-ই সম্ভোগ। তাই আত্মাকে বাদ দিয়ে তারা কিছুই ভোগ করতে চায় না। আত্মার সংস্পর্শে এসে তাদের উন্নয়ন হয়, প্রেম ও সৌন্দর্য ব্যতীত ভোগ যে একটা ইতর ব্যাপার, তা তারা উপলব্ধি করতে পারে।

যে-সাহিত্য ও শিল্পের দৌলতে মানুষের এহেন উন্নয়ন, সে-সাহিত্য শিল্পকে প্রচারধর্মী করা হলে তাদের অবনতি ঘটে, আর সাহিত্য-শিল্পের অবনতিতে পরিণামে মানুষেরই ক্ষতি। সাহিত্য-শিল্পের কাজ সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশন, এবং তারই মারফতে ধীরে ধীরে মূল্যবোধ সৃষ্টি। তাই সাহিত্য ও শিল্প যদি অন্নবস্ত্রের সমাধান না করতে পারে, অথবা অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা প্রচার করতে ত্রুটি করে তো তাকে ব্যর্থ বলে নিন্দিত করা অন্যায়। সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশনের অক্ষমতাতেই তার ব্যর্থতা, অন্য কোনোরূপ ব্যর্থতা ধর্তব্য নয়। সাহিত্যের একটি নিজের জগৎ আছে ; সেই জগতের কাজ করে সে যদি অন্য জগতের কাজ করতে পারে তো তাতে কারো আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু নিজের জগতের কাজটি ষোল-আনা করা চাই।

সাহিত্যিক আর শিল্পী আসলে প্রেমিক ; তারা ভালোবেসেছে এই রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী ধরণীকে। প্রেমিক সুদিনে প্রিয়াকে খুশী করতে চায় গান গেয়ে, ছবি এঁকে ; কিন্তু দুর্দিনে মাঝেমাঝে তাকে প্রিয়ার নাড়ী টিপেও দেখতে হয়। এটা তার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তেমনি কালের গরজে যদি সাহিত্যিক ও শিল্পীকে social engineer কি ভিষক হতেই হয়, তথাপি তাদের মনে রাখা দরকার, সেটা তাদের আসল কাজ নয়, আসল কাজ সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশন। দুর্ভাগ্যকে যেন তারা সৌভাগ্য মনে না করে। প্রয়োজনের তাগিদে আসল উদ্দেশ্যটি ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ; তাই লক্ষ্যটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকা দরকার। অস্তিত্বের স্থূল চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে অনুভূতি ও কল্পনার সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে যাওয়াই কাজ ; তাই, উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয় বলে যে-রচনায় অস্তিত্বের চিন্তা বড় হয়ে ওঠে সে-রচনা–তাতে যতই মস্তিষ্কের ঘি ঢালা হোক না কেন–উঁচু শ্রেণীর রচনা হতে পারে না। ঘড়াঘড়া ঘি ঢাললেও শাক শাকই থেকে যায়, পোলাও হয় না। যে-রচনা জীবনের অমৃতত্ব সম্বন্ধে সচেতন না করে মানুষকে ইতর জীবনের নাগপাশে বন্দী করে রাখে, তাকে কিছুতেই সার্থক রচনা বলা যায় না।

সাহিত্য ও শিল্পের ফলে মানুষের এহেন উন্নয়ন হয়, এ কথা ঠিক কিন্তু শরীর-চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে সহজে সাহিত্য-শিল্পের জগতে প্রবেশ করা যায় না। তাই নিচের তলার ঘরটি ভালো করে গুছিয়ে নেওয়া দরকার। মানুষের চেহারার দিকে তাকালেই মনে

হয়, কী একটা অসামঞ্জস্যের পীড়ায় যেন তার জীবন দ্বিধান্বিত-জীবনের অটুটভাব সে হারিয়ে বসেছে ; অখণ্ড আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। সে যেন চেহারা দিয়েই গাইতে থাকে ঃ

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুই তারে,
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।

অনেকে সমস্যাটির সমাধান করতে চান সরু তারটি ছিঁড়ে দিয়ে। কিন্তু সেটি সার্থক সমাধান নয় ; মোটা তারটিকে সরু তারটির উপযুক্ত করে তোলাই সার্থক সমাধান। সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা দরকার যেন তা সুকুমার জীবনের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। তা হলেই আমরা উপলব্ধি করব, 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-নীতি অতীত কালের মন্ত্র, আর পেছনে ফেলে আসা প্রাণীযুগের মন্ত্র আওড়িয়ে লাভ নেই, লাভ ভবিষ্যৎ জীবনের মন্ত্র আওড়িয়ে ; আর তা হচ্ছে Expression of the beautiful সুন্দরের বিকাশ। সম্মুখের মন্ত্র আমাদের সম্মুখে টেনে নিক, অতীতের মন্ত্র অতীত হয়ে যাক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দই মানুষের মধ্যে মূল্যবান, তাই এদের জয় মনুষ্যত্বেরই জয়, আর এদের সঙ্গে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-নীতির বৈরিভাব সুবিদিত। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাদ পেতে হলে এই সর্বনাশা নীতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই ; নইলে তা মাধ্যাকর্ষণের মতোই আমাদের ইতর জীবনে আবদ্ধ করে রাখবে, উপরে উঠতে দেবে না। Expression of the beautiful-এর মন্ত্র ঊর্ধ্বাকর্ষণের মন্ত্র-তা পঙ্কিল জীবন থেকে ঊর্ধ্বে টেনে নিয়ে আমাদের আত্মিক ক্রমবিকাশে সহায়তা করবে। তারই টানে বর্বরতামুক্ত হয়ে আমরা সুসভ্য হয়ে উঠব। আর সুসভ্যতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য।

সুসভ্যতার জন্য কল্যাণসৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলে কল্যাণই সুসভ্যতা নয় ; তা সুসভ্যতার পাদপীঠ। কল্যাণ প্রাণী-সত্তারই ব্যাপার, আর রূপ-রসের সাধনাই মনুষ্যত্ব তথা সভ্যতার সাধনা। কল্যাণের সাধনা তার সহায়ক, তার বেশী কিছু নয়, এ কথা মনে রাখলে অনেক সময় ঘোড়ার আগে গাড়ি সাজানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রূপলোক ও রসলোকে আমাদের উন্নত করতে পারে শিক্ষা। তাই শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য, এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য মনের চোখ ও রসনা সৃষ্টি করা। যেখানে তা হয় নি সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ। মুনষ্যত্বের সাধনা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনা, আর প্রেম-সৌন্দর্য ও আনন্দের তাগিদেই আমরা লঘুভার হতে পারি। শিক্ষা আমাদের এই প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের সাধনায় তথা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনায় সহায়তা করে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রূপ ও রসের জন্য কল্যাণ, কল্যাণের জন্য রূপ ও রস নয়,-এই বোধ থাকে না বলে শিল্প-সাহিত্যের এত অপব্যবহার ঘটে। শিক্ষার কাজ সেই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

প্রাণীমানুষটির চেয়েও যে একটা বড় মানুষ আমাদের জীবনে রয়েছে, তাকে না জানলে মনুষ্যত্বকে জানা হয় না। শিক্ষা আমাদের এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন রাখে, কিন্তু তাই বলে যে তা আমাদের একেবারে আলাদা করে রাখে, তা নয়। শিক্ষার ফলে আমরা জানি : রস ও সৌন্দর্যের দরুন আমরা প্রকৃতি-জগৎ তথা তরুলতা ও প্রাণীজগৎ থেকে আলাদা, আবার রস সৌন্দর্যের তাগিদে তার সঙ্গে বাঁধা, কেননা প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে না পারলে সৌন্দর্য ও আনন্দ লাভ করা যায় না।

জীবন-বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তাই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটা হয়ে উঠবে

এই ভেবে কোনো মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তোলাবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,–এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আনন্দময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো হালকা মনে করে।

যেখানে কামে-প্রেমে প্রভেদ করা হয় না, সত্যে সত্যে প্রভেদ অস্বীকৃত থাকে ; অর্থাৎ নিম্নস্তরের সত্য বলে কোনো জিনিস থাকে না, যেখানে মুড়ি-মিছরির একদর, সেখানে সুসভ্যতার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আর যেখানে এর বিপরীতটি ঘটে সেখানে তা মুক্ত, স্বাধীন অবাধগতি। তার চলার ভঙ্গীতে ঝলমল করে ওঠে মানুষের দেহমন, হালকা হয়ে যায় জীবনের গুরুভার। সত্যের স্তরভেদে সুসভ্যরা বিশ্বাসী ; তারা জানে সমাজগঠনের নীতি নিম্নস্তরের সত্য, জীবনগঠনের নীতি উঁচুস্তরের সত্য। এবং সমাজগঠনের নীতিকে যে মূল্য দেওয়া উচিত তা তারা দেয়, কিন্তু কখনো তাকে জীবনগঠনের নীতির মর্যাদা দেয় না।

জীবন ও বৃক্ষ

সমাজের কাজ কেবল মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করে নি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতির অহঙ্কার ও ধর্মগত অহঙ্কার–এ সবের লাল নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব-প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাপূর্ণ [নয়], উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ–সূক্ষ্মবুদ্ধি, উদারহৃদয়, গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ–যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটা-সোটা করে গড়ে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসার্থক থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সজীবতা ও সার্থকতার এমন এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়–তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তা হলে বৃক্ষেই মনুষ্যত্বের সাধনার সাদৃশ্য পাওয়া যেত। তপোবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন, বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তো তত স্পষ্ট হয়ে উঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

উত্তরে বলব : চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির

ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তা ছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি আমরা যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাইনে। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপর পক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছে হয় : এইতো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান এক হয়ে গেছে। ফুল ও ফল একই সঙ্গে তার প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষের বেলায়ও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেন নি। বললে ভালো হতো। তা হলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তা হলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম ; পার্থক্য কেবল, তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরী পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : Ripeness is all– পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারাই আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না— জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না। তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

উপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে তাই আমরা লাভবান হতে পারি–জীবনে গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়–প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

স্বাধীনতা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

ইতিহাসের গহনে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁদের মুখে সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে পাঠকগণ অনেক কিছু শুনতে পেয়েছেন। তারপরে ও সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে গেলে পুনরুক্তি দোষ ঘটাবার সম্ভাবনা। তাই ঘটনার মালা গেঁথে পাঠকগণকে উপহার না দিয়ে আমি সাধারণভাবে দুএকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে : সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি-উৎসবের উদ্দেশ্য কি? যদি বলা হয়, সিরাজউদ্দৌলার জীবনে এমন একটি tragic touch বা করুণ দিক রয়েছে যা, সহজেই মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তো ঠিক জবাবটি দেওয়া হবে না; কারণ tragedy-র দিক দিয়ে সিরাজ-চরিত্র ইতিহাসে একক নয়–এমন বহু চরিত্র রয়েছে tragedy-র জন্য যাঁরা পৃথিবীতে চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কই, তাঁদের নামে তো আমরা স্মৃতি উৎসব করিনে!

আমাদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার tragedy-র বিশেষত্ব এই যে, তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও মিশেছে–সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবর্ষেরই পতন। সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাতে শুরু করলে আর স্বাধীনতা হারিয়ে আমরা দিন দিন শ্রীহীন হতে লাগলাম। তাই সিরাজউদ্দৌলা-স্মৃতি-উৎসব আমার কাছে প্রকারান্তরে হারানো স্বাধীনতার জন্য ক্রন্দন-উৎসব। অবশ্যই ক্রন্দনই এ-উৎসবের একমাত্র কথা নয়, এর আনন্দের দিকও রয়েছে ; আর তা এই যে, স্বাধীনতার প্রয়োজন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। এ কথা স্বীকার না করলে সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি-উৎসব একটা ভাবপ্রবণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করছি, এটা আশা ও আনন্দের কথা। কারণ, কোনো জিনিস পাওয়ার আগে তার আবশ্যকতাবোধ প্রয়োজন, নইলে উদ্যমশীলতা জাগে না–মন অনাবশ্যক কিছুর জন্য সংগ্রাম করতে কুণ্ঠা বোধ করে। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা হারানোর কারণটি কি ভেবে দেখা উচিত ; কারণ তাতেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও রক্ষার রহস্যটি নিহিত থাকার সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা হারিয়েছি আমরা জাতীয়তাবোধের অভাবে–উমিচাঁদ ও মীরজাফরের চক্রান্তে নয়। জাতীয়তাবোধ (অর্থাৎ দেশ আমাদের, রাজা আমাদের, রাজা যদি মন্দও হয় তো তাঁকে সরিয়ে আমাদের মনোমত রাজা করবো, এই বোধ) যদি দেশবাসীর মধ্যে সজীব থাকত তো কয়েকটা স্বার্থপর মানুষের চক্রান্তে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটত না–দেশবাসী জাতীয়তা-বিরোধী চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর হতো। কিন্তু তা যে হয় নি তার কারণ জাতীয়তাবোধের অভাব। জাতীয়তাবোধের অভাবের দরুনই দেশবাসী সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যকে নিজের ভাগ্য করে নিতে পারলে না।

স্বাধীনতা লুপ্ত হলো যে-জিনিসের অভাবে, স্বাধীনতা মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তারই হাতে। বলাবাহুল্য, আজ পর্যন্ত জাতীয় অনৈক্যই বিদেশীর প্রভুত্বের ভিত্তি হয়ে আছে ; আর জাতীয় ঐক্যই সে-ভিত্তি ধূলিসাৎ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই বিবদমান সম্প্রদায়সমূহের সামনে একটি বড় আদর্শ স্থাপন করা কর্তব্য–সে-আদর্শ জাতীয়তার আদর্শ। জাতীয় ঐক্যবোধই সাম্প্রদায়িক বৈষম্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি যদি নিজেদের জাতীয়তা সমুদ্রের করদ-নদী মনে করে এবং তাতে আত্মনিবেদন করে আনন্দ পায়, তবেই সাম্প্রদায়িক কলহ দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যে উঁচু মন ও উদার কল্পনা থাকলে এই দৃষ্টি জীবনের সঙ্গীত হয়, উপযুক্ত শিক্ষা ও চিৎপ্রকর্ষের অভাবে তা আজও আমাদের করায়ত্ত হয় নি। সেজন্য আমাদের চিন্তাশীলদের কঠোর পরিশ্রম কবতে হবে–বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নিজের ও দেশের মাথা ঠিক রাখতে হবে। কারণ চিন্তাই মাথা ঠিক রাখবার ক্ষমতা রাখে, আর বাস্তব থেকেই চিন্তার প্রেরণা পাওয়া যায়। বাস্তবসম্পর্কচ্যুত যে-চিন্তা তাতে একপ্রকার ঠুনকো মনোবিলাস চললেও স্বাস্থ্যের দীপ্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সমুদ্রসম্বন্ধচ্যুত নদীর মতো বাস্তবসম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাতে চিন্তাশীলরা শুকিয়ে না মরেন, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার শোচনীয়তা দেখে চিন্তাশীলরা প্রায়ই ঘাবড়ে যান ও মুষড়ে পড়েন। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। রোগীর অবস্থা কাহিল দেখে চিকিৎসক যদি কাঁদতে ও আপসোস করতে শুরু করেন তো মুশকিল। তাঁর কাজ ধীরে-সুস্থে রোগ চেনা ও সাবধানে চিকিৎসা করা–তাড়াতাড়ি রোগীকে ভাল করতে চাইলে রোগীর মৃত্যু হবার সম্ভাবনা। রোগী যদি মুমূর্ষুও হয়ে থাকে, তবু শঙ্কিত হয়ে লাভ নেই, বরং নতুন অভিজ্ঞতার খোরাক পাওয়া গেছে, এই মনে করে ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হওয়া উচিত ; নইলে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি অসম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো চিন্তাশাস্ত্রেরও উন্নতি হবে না যদি দেশের বা পৃথিবীর শোচনীয়তাকে স্বাগতম না করা যায়। শুনেছি, অস্ত্রচিকিৎসকগণ নাকি অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত রোগী দেখলে আনন্দবোধ করেন। এ কথা সত্য কি-না জানিনে, তবে সত্য হলেই খুশী হব ; কারণ এই আনন্দ নিষ্ঠুরতার আনন্দ নয়, অভিজ্ঞতার আনন্দ–অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান ও বাড়ানো যাবে বলে একপ্রকার বৈজ্ঞানিকসুলভ উল্লাস। চিন্তাশীলদেরও এই দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে, কারণ তাঁরাও চিকিৎসক।

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে স্বাধীনতা কিসের জন্য, তা লক্ষ্য না উপলক্ষ ভেবে দেখা উচিত। অনেকের কাছে স্বাধীনতা লক্ষ্য হলেও চিন্তাশীলদের কাছে তা উপলক্ষ মাত্র, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্যও তার প্রয়োজন। স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে স্বাধীনতার এত মূল্য থাকত কি-না সন্দেহ। যদি এমন কোনো অধীনতা পাওয়া যায় যেখানে জাতির প্রগতি অব্যাহতভাবে চলতে সক্ষম, যেখানে কোনো বন্ধনই উপলব্ধি করা যায় না, তবে সেই অধীনতাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানানো উচিত। কারণ তাতে দেশরক্ষার বালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, অথচ দেশের ক্ষতি হয় না কিছুই। কিন্তু তেমন অধীনতা নেই, তাই স্বাধীনতার প্রয়োজন।

স্বাধীনতা যখন দেশসৃষ্টির জন্য, হুজুগের জন্য নয়, তখন অধীন অবস্থায় দেশকে যতটুকু সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত, কেবল ইংরেজকে গালি দিয়ে শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা দেখে মনে হয় হুজুগের আনন্দের জন্যই আমরা আন্দোলন করি, দেশসৃষ্টির তাগিদে নয়। তার প্রমাণ এই যে, আজও দেশের বুকে বিভিন্ন সমাজভুক্ত মানুষের মিলিত হবার মতো একটি common platform-ও তৈরী

হলো না; অথচ তার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। জাতীয় উৎসব বলে আমাদের কোনো উৎসব নেই, সাম্প্রদায়িকগুলিকেই জাতীয় উৎসব বলে প্রচারিত করা হয়–যেন মিথ্যাকে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করলেই সত্য হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থা একই সঙ্গে আমাদের প্রতিভা ও বিচারহীনতার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে। নব-সৃষ্টির প্রেরণা আমরা উপলব্ধি করিনে, পুরানো জিনিস দিয়েই কোনোমতে কাজ চালিয়ে বাপদাদার নাম বজায় রাখতে চাই। বাপদাদার নাম হয়তো বজায় থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অপদার্থতা ও সৃজনবুদ্ধিহীনতার দুর্নামও পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

অসাম্প্রদায়িক জাতীয়-উৎসবপ্রতিষ্ঠান যে আজও আমরা তৈরী করতে পারি নি তার কারণ মনোবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীর উদাসীনতা। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য মন্দীভূত করতে হলে যে মনোবিনিময়ের প্রয়োজন, আর মনোবিনিময়ের জন্য উৎসব-প্রতিষ্ঠানের মতো আর চিজ নেই, এ বোধ আজও আমাদের ভিতরে সঞ্চারিত হয় নি। তাই সাম্প্রদায়িকতার প্রেতনৃত্যে দেশ আজ বিপর্যস্ত, মানুষে মানুষে স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্কটুকু নষ্ট করে দিয়ে ঘৃণাবিদ্বেষের জয়জয়কার। কিন্তু এত দুঃখেও আমাদের চৈতন্যোদয় হলো না–এ পাপ যে বিশেষ কারো নয়, একটা অবস্থার ফল, সুতরাং 'এ আমার, এ তোমার পাপ', এ বোধ আজও আমাদের মধ্যে জাগলো না, আর জাগলো না বলেই অধঃপতিত হয়ে রইলাম।

দেশের দুঃখ এই যে, বর্তমান রাজনীতির গোড়ার কথা দাবী ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, দায়িত্ববোধ নয়। আগে দাবী দাও তারপরে দায়িত্ব গ্রহণ করবো–আগে প্রভুত্ব তারপরে সেবা, এই যেন নেতাদের মনের কথা। বলাবাহুল্য, এ মনোভাব অত্যন্ত নিকৃষ্ট–সম্প্রদায়কে বড় হতে দেয় না, ছোট করে রাখে ; কারণ সেবার ভিতর দিয়েই সত্যিকার বড় হওয়া যায়, প্রভুত্বের ভিতর দিয়ে নয়। সেবায় সম্প্রসারণ, প্রভুত্বে সঙ্কোচন। অথচ আমাদের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ এই নিকৃষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় দিচ্ছেন–ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভের ব্যাপারে আশ্‌কারা দিয়ে সমাজের সর্বনাশ সাধন করছেন। তাই তাদেরকে আর যা-ই বলা যাক, সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী বলা যায় না। কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। অথচ এই পাটোয়ারী বুদ্ধিসুলভ নেতৃবৃন্দেরই সমাজে প্রভুত্ব।

সম্প্রদায়কে বড় করতে হলে তার সামনে একটি বড় স্বপ্ন দিতে হবে–সেই স্বপ্ন হবে ভারতবর্ষ ; (কেউ যদি পৃথিবী বলেন তো আপত্তি করব না, তবে আপাততঃ ভাবরতবর্ষই আমাদের জন্য পৃথিবী হোক।) সেই স্বপ্নের স্পর্শ যাদুর মতো মানুষের ভিতরের সমস্ত শক্তি জাগিয়ে তুলবে–পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাবে। মহাসাগরের ডাকে নদী যেমন পর্বতগুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, মহাভারতের ডাকেও সম্প্রদায় তেমনি সাম্প্রদায়িকতার গুহা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়বে, অর্থাৎ তার স্বপ্নভঙ্গ হবে। নেতৃবর্গ যে সম্প্রদায়ের সামনে আজও এই স্বপ্ন ধরতে পারছেন না, তার কারণ বড় স্বপ্নের স্বাদ ও আত্মপ্রত্যয়সঞ্জাত শক্তির উপলব্ধি তাঁরা নিজের জীবনেও লাভ করেন নি–শুধু কিছু রাজনীতিক মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করে সর্দারি করার উপযুক্ততা লাভ করেছেন। রাজনীতিক মারপ্যাঁচেরও হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু বড় স্বপ্ন তার পেছনে না থাকলে তা শুধু অনর্থ বাধাতেই সক্ষম। পাওয়ার ক্ষুধার চাইতে দানের ক্ষুধাই বড়, কারণ তা-ই মানুষকে সৃষ্টিধর্মী করতে পারে, এই বোধ রাজনীতিক নেতাদের থাকা চাই ; নইলে সমাজের উপকার করতে গিয়ে অপকার করাই তাঁদের ভাগ্য হবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা ভেবে যাঁরা অস্থির হন, তাঁদের এ

কথা জানাতে চাই, তাঁদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় উপযুক্ততায় বড় হওয়া–দল বেঁধে স্বার্থরক্ষায় নয়। দলবাঁধায় যে শক্তি খরচ হয় তা দিয়ে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করা যায়, দলবাঁধায় যোগ্যতা সৃষ্টি ব্যাহত হয়–কেননা সংগ্রামের কাল সৃষ্টির কাল নয়। এই আদর্শ দৃশ্যতঃ কঠিন ; কিন্তু তীব্র ইচ্ছার কাছে কঠিনও সহজ হয়ে যায়, আর এক্ষেত্রে তীব্র ইচ্ছার জাগরণ নির্ভর করছে–উপযুক্ততায় বড় হওয়াই সত্যকার বড় হওয়া, এই বোধের উপর। Superiority বা শ্রেষ্ঠতার আরাধনা না করলে, শুধু বিশেষ সুবিধা নিয়ে সমাজ কোনোদিন বড় হতে পারে না, কোনোপ্রকারে টিকে থাকতে পারে মাত্র–এই বোধ না জাগলে সমাজের জাগরণ বা উন্নতিপ্রয়াস কোনোদিন খাঁটি হতে পারে না, তা শুধু উত্তেজনা সৃষ্টি করেই নিজেকে সার্থক মনে করে। (বলাবাহুল্য, আমি superiority-র কথাই বলছি, superiority complex-এর কথা নয়। এ-দুয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রথমটি গুণ, দ্বিতীয়টি রোগ; প্রথমটি দুর্লভ, দ্বিতীয়টি বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মতো সহজলভ্য।)

ভারতবর্ষ কার–এই প্রশ্নের উত্তরে বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে যে ভারতবর্ষের সেবা করে ভারতবর্ষ তার, কারণ সেবার দ্বারাই সে তাকে আপন করে নেয়–তার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ায়।–রবীন্দ্রনাথের এ-কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছেন পিতা। পরিবারে পিতা বড়, কারণ তিনি সকলের জন্য চিন্তা করেন–সকলের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। এই দায়িত্ববোধের ব্যতিক্রম হলে পিতার অভিভাবকত্ব আর বজায় থাকে না–তিনিও অন্যের মতো অসহায় সাধারণ জীব হয়ে পড়েন। দেশের প্রতি এই দায়িত্ববোধ বা পিতৃত্ব-উপলব্ধিই সম্প্রদায়ের বড় হবার উপায়। এই বোধ যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগবে তখন সে অসাধ্য সাধন করবে–একই সঙ্গে নিজেকে ও দেশকে সার্থক করে তুলবে। কারণ বোধের সঙ্গে দায়িত্ববোধ জাগবে, আর দায়িত্ববোধের সঙ্গে শক্তিরও উদ্বোধন হবে। তাই আমি সাম্প্রদায়িক নেতাদের অসাম্প্রদায়িক হতে বলিনে,–সম্প্রদায়ের সত্যিকার কল্যাণটি কোন পথে তা ভেবে দেখতে বলি–আমি আমারই জন্য,–আর আমি সকলের জন্য, এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি বড় ও শক্তিপ্রদ তা বিচার করে দেখতে অনুরোধ করি।

এই ভাবনা থেকে একটা নব-সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, আর তা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ অহং-জ্ঞানের মতো সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত দৃঢ়নিবদ্ধ যে, তা দূর করা এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হয়, তবে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভাবনার বাইরে নয়। পুরাতন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে দাবী ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, নব-সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গী হবে দেশের প্রতি দায়িত্ব-উপলব্ধি বা পিতৃত্ববোধ। তা হলে সম্প্রদায় আর চাকরি সম্বল করে বড় হতে চাইবে না, সাধনার দ্বারাই বড় হবার প্রত্যাশা করবে; আর সাধনার পথে সম্প্রদায় ও দেশ উভয়েরই কল্যাণ। সাধনার স্বাদ যে লাভ করলে না জীবনের গভীরতর স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত রইল। নেতৃবর্গের উচিত সম্প্রদায়কে সেই গভীরতর স্বাদ পাওয়ার প্রেরণা দান করা।

এই নব-মনোভাবের ভিত্তি হবে এক আধ্যাত্মিক বোধ–Possessive instinct-এর চাইতে Creative instinct অধিকতর মূল্যবান, এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের কল্যাণে জীবনের জড়তা দূরীভূত হবে ; ঘৃণাবিদ্বেষমুক্ত হয়ে মানুষ মর্তের মাটিতে স্বর্গের স্বাদ উপভোগ করবে। (কারণ ঘৃণাবিদ্বেষের হাতে ক্রীড়নক বলেই স্বর্গ আমাদের চারদিকে থাকা সত্ত্বেও আমরা তা টের পাইনে।) ঘৃণাবিদ্বেষ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় সৃষ্টিধর্মিতা আর সৃষ্টিধর্মিতা লাভ করতে হলে দায়িত্ববোধের প্রয়োজন। আমাদের

নেতৃবর্গ যদি এ কথা বোঝেন ও দেশবাসীকে বোঝান তো দেশের মঙ্গল সুনিশ্চিত। কিন্তু ঐ-পথ সহজ নয়–সহজে নেতা হওয়ার পক্ষে ঐ পথ পিচ্ছিল। ভিন্ন সম্প্রদায়কে গালি ও টিটকারী দিয়ে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের ত্রুটি দেখাতে গেলে মাথা নিয়ে টানাটানি। যে-প্রেম থাকলে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকের হাতে জীবন দিতে ইচ্ছে হয়, সে প্রেম সংসারে দুর্লভ। সে-প্রেম ছিল রামমোহনের, স্যার সৈয়দের, মুস্তাফা কামালের এবং আরো আরো ইতিহাস-বিখ্যাত মহাপুরুষের। ঐ-প্রেমের অধিকারী না হলে সত্যিকারের নেতৃবৃন্দের উপযোগী হওয়া যায় না। অবশ্য এই প্রেমই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে আরো অনেক গুণের প্রয়োজন–বহু পাঠ, সংযম, দূরদৃষ্টি, মনুষ্যত্বে বিশ্বাস, পৃথিবীর সাময়িক আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয়, বিশ্লেষণী বুদ্ধি, রুচিজ্ঞান, বিচারপ্রীতি ইত্যাদি গুণ না থাকলে নেতা হওয়ার চেষ্টা মারাত্মক–নেতৃত্বকামী ব্যক্তির পক্ষে না হলেও, সমাজের পক্ষে।

সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ-কামনার পূর্বে সাম্প্রদায়িকতার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ তা হলেই তাকে ঘৃণা করা সহজ হবে এবং তাকে বর্জন করতে কোনোপ্রকার দুঃখবোধ হবে না। সাম্প্রদায়িকতার প্রধান ত্রুটি এই যে, তা মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় এবং অপদার্থতার আবরণ স্বরূপ কাজ করে। সাম্প্রদায়িকতার কোনো মূল্য থাকে না, বরং তাদের অধিকারীদের বিশেষ বিপদে পড়তে হয়—ও-বেচারীদের 'না ঘর্‌কা না ঘাট্‌কা' হয়ে থাকতে হয়। বিচারপরায়ণ ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন হিন্দু হিন্দুর শত্রু হয়ে দেখা দেয়, আর মুসলমান মুসলমানের দুশমন বলে গণ্য হয়। কারণ বিদ্বেষান্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের কুৎসা রটনা করা তাঁদের রুচির বাইরে। অথচ বিচারের চোখে দেখতে গেলে তাঁরাই সমাজের সত্যিকার বন্ধু—অন্যায়ের পথে 'নাই' দিয়ে সমাজের মাথা নষ্ট করতে তাঁরা নারাজ। মোট কথা, সাম্প্রদায়িকতা এক মাতলামির যুগ, ধর্মহীনতার যুগ–যদিও তাতে ধর্মের নামে চেঁচামেচি হয় যথেষ্ট। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা ক'রে তার ভিতরের সমাজভয়ে লুক্কায়িত নৃশংসতাকে আত্মপ্রকাশ করবার সুবিধা দান করে। এই নৃশংস লোকেরাই প্রাণ নেওয়ার সুযোগের অভাবে প্রাণ দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের পূজার পাত্র হয়। এ প্রাণদান যে আদিম পাশবিক প্রবৃত্তির তাগিদে, সমাজের খাতিরে নয়, এ কথা বুঝবার মতো বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাদের নেই। তাই বীরপূজায় ও বীর-বন্দনায় গগন-পবন মুখরিত হয়। অথচ মৃতবীরপুঙ্গব হয়ত জীবনে কোনো বিপন্ন লোকের সাধারণ উপকারটুকুও করেন নি। এইজন্য জনসাধারণের সাবধান হওয়া উচিত—অপাত্রে শ্রদ্ধানিবেদন করে যাতে আত্মাকে কলুষিত না করা হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি বড় ত্রুটি এই যে, তা নেতৃত্বকে অত্যন্ত সস্তা করে দেয়–যে-কোনো লোক কয়েকটা সস্তা বুলি আওড়িয়ে নেতা হবার সুযোগ গ্রহণ ক'রে স্বসমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করবার প্রয়াস পায়। এতে তার কর্মদক্ষতা ও সমাজপ্রীতি জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করার সুবিধা হয় এবং সে ধীরে ধীরে তার উন্নতির সিঁড়ি তৈরী করতে থাকে। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের বেশীর ভাগ লোককে বোকা বানিয়ে রেখে কতিপয় চালাক লোককে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সুবিধা দেয়। জনসাধারণ একটুখানি হুঁশিয়ার হলেই তাদের চালাকি ভোঁতা প্রমাণিত হতে বাধ্য। তবে জনসাধারণের হুঁশিয়ারী জনসাধারণের হাতে নেই, চিন্তাশীলদের হাতে ; আর এ ক্ষেত্রে চিন্তাশীলদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হলে তাঁদের কথা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে হলে জনসাধারণকে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে : ধর্মের নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের মধ্যেই দৃষ্ট হয় ; সুতরাং তাঁদের কথায় মনোযোগী হওয়ায় সত্যকার কল্যাণ নিহিত। ধর্মের গোড়ায় যে সত্যনির্ভর

ও মনুষ্যত্বপ্রীতি বর্তমান চিন্তাশীলরাই তার একমাত্র বাহন–তাঁরাই নিজের চেয়ে সত্যকে ও মানুষকে অর্থাৎ মানুষের সাধারণ স্বার্থকে বড় করে দেখেন।

সাম্প্রদায়িকতার অনেক ত্রুটি ; সে সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করতে গেলে একটা আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয় ; আমি শুধু ইঙ্গিত করে গেলাম। সাম্প্রদায়িকতা থেকে আত্মরক্ষার একটি উপায় : সাম্প্রদায়িকতা খারাপ, এই বোধ ; আরেকটি : ব্যক্তিত্বপ্রীতি –সমাজ তো দূরের কথা, তারও উপরের কেউ আদেশ করলেও আমি নিজেকে খারাপ করতে পারিনে, এই মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি না থাকলে জীবন অসুন্দর হয়ে পড়ে–আত্মা বস্তুর কাছে দাসখত দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জন্য অকল্যাণকর হলেও জাতীয়তাবাদীদের জন্য একেবারে অশুভকর নয়। জাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রদায়িকতা থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে ; কেননা তা জাতীয়তার ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সম্প্রদায়-বহুল দেশে সাম্প্রদায়িকতা না থাকলে জাতীয়তা বিশুদ্ধতর হতে পারে না, তাতে প্রতিপত্তিশালী সমাজের রং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গায়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের রং লাগতে না দিয়ে আদর্শ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করলে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা মন্দীভূত হবার সম্ভাবনা। সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করে। তাই জাতীয়তাকে একদিকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, অপরদিকে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে–তার ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কোনো গলদ আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। এ তাঁরা করতে পারবেন যদি তাঁরা মনে করেন, জাতীয়তার আদর্শ অতীতে নেই, ভবিষ্যতে–তা এখনো সৃষ্ট হয় নি, আমাদের প্রতিভার অপেক্ষায় আছে। তাই জাতীয়তাবাদীদের ভবিষ্যৎপন্থী হতে হবে, নইলে জাতীয়তার গায়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রভাব ও রং লাগবার সম্ভাবনা, আর তা হবে মারাত্মক ; কারণ তাতে 'মহামানবের সাগরতীরে'র সম্ভাবনাটি লুপ্ত হবার আশঙ্কা।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমরা যেন আজ মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করি : আমরা দেশকে সাজাব আমাদের কল্পনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, সৌন্দর্যবোধ দিয়ে–জননী করে নয়, প্রিয়া করে। কারণ প্রিয়াকে আমরা সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু জননী আমাদের স্রষ্টা। জননী অতীতের, প্রিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের। আজও যে আমরা দেশকে প্রগতিশীল করে তুলতে পারি নি, তার কারণ দেশকে আমরা জননী করে দেখছি, প্রিয়া করে নয়। জননীর জন্য প্রগতি নিষ্প্রয়োজন, অতীতের সুমধুর স্মৃতিতে তার তৃপ্তি ; প্রিয়াকে কিন্তু পরিবর্তনশীলা হতে হয় ; কারণ জীবনের নবনব স্বাদ পাওয়া ও পাওয়ান জীবনধর্ম।

তাই এ কথা মনে রাখতে হবে : পিতৃপুরুষের দেশ ঠিক আমাদের দেশ নয় ; আমাদের দেশ নিজেদের সৃষ্টি করে নিতে হবে। সেজন্য অন্ধকার দেওয়াল ভেঙ্গে মানুষে মানুষে মিলনের পথ খোলাসা করা দরকার এবং সর্বপ্রকার অভিযান ত্যাগ করে বিজ্ঞানাশ্রয়ী হওয়া প্রয়োজন। মহাপ্রাণ রোঁলা ইউরোপিয়দের যে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, ভারতবাসীদেরও তা শোনানো যায় :–"Broaden yourself or perish. Embrace all new and free forces of the world. You are suffocating in your old shells, which are glorious, but fossilised. Break them down. Breathe and let us breathe. We need a habitation, a fatherland.....–My fatherland is not yesterday. It is to-morrow. And already the angelus of dawn has sounded.

সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি-উৎসবে দাঁড়িয়ে এসব কথা চিন্তা না করলে কিছুই চিন্তা করা হয় না, কারণ দেশের শেষ স্বাধীন নরপতি বলেই তাঁর সম্মান–অন্য কারণে নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য সিরাজউদ্দৌলা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ; আমাদেরও করতে হবে। তবে আমাদের উপায় সিরাজউদ্দৌলার উপায় থেকে পৃথক হতে বাধ্য। কারণ তিনি যে-যুগে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমরা আর সে-যুগে দাঁড়িয়ে নেই–অনেক সরে এসেছি। আমাদের পথ হবে মানুষসৃষ্টি। বিদেশীরা বলে থাকেন আমাদের মানুষ করবার জন্যই তাঁরা এখানে আছেন। এ কথা সত্য কিনা জানিনে ; তবে মানুষ না হওয়াতে যে তাঁরা আজ পর্যন্ত রয়ে গেলেন, এ কথা সত্য। মানুষ হওয়ার অর্থটি কি এ-সম্বন্ধে আর কিছু বলে পাঠকদের অপমান করতে চাইনে।

একটি নিবেদন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের ব্যাপারে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদেরও কর্তব্য রয়েছে। সে সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন হওয়া দরকার। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন মনুষ্যত্বকে। মনুষ্যত্ব তাঁদের মাথার মাণিক। সেই মনুষ্যত্বের অপমানে তাঁদের চুপ করে থাকা অশোভন। সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গায় শুধু মানুষ মারা যায় বলে যে দুঃখ তা নয়, যারা মারতে আসে তাদের মনুষ্যত্ব মরে যাওয়ার দুঃখও অপরিসীম। বিকৃতবুদ্ধি মনুষ্যত্বহীন মানুষকে দিয়ে জাতির ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। তাই তাদের পুনরায় সহজ মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রয়োজনীয়; এবং সে-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের।

মনুষ্যত্ব, তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও সহানুভূতি নষ্ট হয়ে গেলে মানুষে আর পশুতে কী পার্থক্য থাকে? মানুষের গর্ব করারই বা কী থাকে? তাই রাজনীতি ও ধর্মের নামে নয়, মনুষ্যত্বের নামে এক বিরাট শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আবশ্যক। সেই শান্তিফৌজের উদ্দেশ্য হবে দৃঢ়হস্তে দুষ্কৃতদের দমন, এবং নিপীড়িত আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মনে আশা ও বিশ্বাস উৎপাদন।

আমি রাজনীতি ও ধর্মের নামে এগিয়ে আসতে নিষেধ করছি এইজন্য যে, দেখতে পাওয়া গেছে, এই দুই নামে মানুষ সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়ে, মানুষের ভেতরের মহান প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। রাজনীতির মানে বাস্তবতার নামে ছোট ছোট কথা বলা, আর ধর্ম যে বর্তমানে তার উঁচু আসন থেকে রাজনীতির হীন স্তরে নেমে এসেছে, তাতো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে? তাই তার মুখেও রাজনীতির মতোই ছোট ছোট বুলি, কোনোপ্রকার মহত্ত্বের প্রেরণা সে আজ আর দিতে পারে না।

অবশ্য ধর্ম আর রাষ্ট্রেরও এক্ষেত্রে কথা বলার আছে। ধর্ম বলতে পারে : সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ধর্মনীতির অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে ধর্মের নিষ্কলঙ্ক শুভ্র অঙ্গে কালিমাই লেপন করা হয়, ধর্মের মনুষ্যত্বউদ্‌বোধক বাণীগুলি প্রচার করেও ধর্মপ্রেমিকরা এর প্রতিবিধান করতে পারেন। রাজনীতির বলার কথা হচ্ছে : সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের দরুন সমাজের সুস্থ অন্তর্দ্বন্দ্ব নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়, আর প্রগতিহীনতা জাতীয় মৃত্যুর নামান্তর। শাসকশ্রেণী অনেক সময় create enemy & rule–শত্রু সৃষ্টি করে শাসন করো–এই নীতির অনুসরণ করে শাসনের পথ মসৃণ করতে চান। কিন্তু তাঁদের সে-চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে না পারলে মানুষের মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে–মানুষ যে-তিমিরে সে-তিমিরেই থেকে যায়।

এ কথা মনে রাখা দরকার, দেশের মুক্তি আমরা পেয়েছি, কিন্তু মানুষের মুক্তি এখনো হয় নি, মানুষের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তির কোনো মানেই হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মুক্তির পথে প্রবল অন্তরায়। মানুষের মুক্তির জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রয়োজনীয়, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিকূল–প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা যদি এ কথা বুঝিয়ে দেন, তবেই বিকৃতবুদ্ধি মানুষ নিজের সত্যকার স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে

পারবে; আর নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মতো বিসদৃশ ব্যাপার কিছুতেই টিকতে পারবে না। সার্থক দ্বন্দ্ব কি তা জানে না বলেই মানুষ অসার্থক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। কেননা দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাব, তাকে এড়িয়ে চলা যায় না, নইলে কেউ ওপথ মাড়াতো না। একবার সার্থক দ্বন্দ্বের স্বাদ পেলে আর কখনো মানুষের মতো অসার্থক দ্বন্দ্বের দিকে ধাবিত হবে না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্তরালে যে প্রতিক্রিয়াশীল মন রয়েছে, শুধু তাই নয়, তা যে আসলে প্রগতিরোধেরই সজাগ চেষ্টার ফল, তা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ কঠিন হবে। সেজন্য দৃষ্টির প্রয়োজন; রাজনীতিকগণ নিজেকে ও অপরকে সদাজাগ্রত দৃষ্টির সাধনায় তৎপর না রাখলে মুশকিল আসানের সম্ভাবনা কম।

রাজনীতি ও ধর্ম তাদের তরফ থেকে কাজ করুক। শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মারফতে মানবসেবায় অবতীর্ণ হন। তাঁদের আলাদাভাবে কাজ করতে বলছি এই জন্য যে, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ ও ব্যাপক–সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের তাগিদে সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য কোনো মনুষ্যত্ব-দরদী ধার্মিক ও রাজনীতিক যদি তাঁদের দলে আসতে চান তো তাঁকে বাদ দিতে হবে, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সঙ্কীর্ণ চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে যাঁরা সব সময়ই মানুষ ও মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখেন, তাঁদের সহজেই স্বাগতম জানান যায়।

এখন আমি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। আশা করি, তাঁরা সংবাদটি পেয়ে খুশী হবেন। আমাদের চাটগাঁ শহরের তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মিলে এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে "শান্তিসম্মেলন"। এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি শান্তি-ফৌজও গড়া হয়েছে। তাঁরা মহল্লায় মহল্লায় শান্তির বাণী প্রচার করছেন, এবং যাতে দুষ্কৃতীদের মনে ভয় এবং সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হয় তার ব্যবস্থা করছেন। তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সজীব মনুষ্যত্ববোধে আমরা সকলেই মুগ্ধ। নিরাশার আঁধারে তাঁরাই আমাদের আশার আলো। [গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি দেখুন] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন মনুষ্যত্বধর্মের সেই শুভ্র ঐতিহ্য আজ কলঙ্কিত হতে চলেছে–বাংলার মূল্যবান সৃষ্টি (তা সাহিত্য নয়, সাহিত্যের মূলীভূত কারণ মনুষ্যত্ববোধ) আজ ধুলায় অবলুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। নিজস্ব সৃষ্টির সংরক্ষণে তাঁরা তৎপর হন–পশুত্বের প্রকাশকামনাকে ব্যাহত ক'রে মনুষ্যত্বকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। মুসলমানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নয়, হিন্দুকে মনুষ্যত্বহীনতার দারুণ গ্লানি থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসুন।

অভিভাবকজনোচিত মনের অভাবেই আজ এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। রাজনীতিকেরা সচরাচর যে মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাতে তাঁদের সু-অভিভাবক বলা যায় না। দেশবাসী অন্নবস্ত্রের চাহিদা জানালে তাঁরা উন্মাদের মতো ক্ষেপে উঠেন, কিন্তু অন্যের সঙ্গে গোলমাল শুরু করলে সাফাই গাইতে শুরু করেন। এই মনোবৃত্তিকে সু-অভিভাবকত্বের লক্ষণ বলা যায় না। এতে চরিত্রের উন্নতি না হয়ে অধোগতিই ঘটে। নিজের বেলা বরং চুপটি করে থাকব, অন্যের বেলা কড়া শাসন করব, এইতো সত্যকার অভিভাবকের মনোবৃত্তি। রাজনীতিকদের ভেতর এই মনোবৃত্তির অভাব। তাই কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সু-অভিভাবকের স্থান নেওয়া দরকার। নইলে সভ্যতা তথা সুমানসিকতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

Public calamity is a mighty leveller–এই নীতির দ্বারা উৎসাহিত হয়েই আমি এগিয়ে এসেছি, নইলে তা কখনো সম্ভব হতো না। কোনোপ্রকার উপদেশ দেওয়ার মনোবৃত্তি আমার নেই। ও বস্তুকে আমি মনে-প্রাণেই ঘৃণা করি। তথাপি যখন স্পষ্ট

দেখতে পেলুম মনুষ্যত্ব মরে যাচ্ছে তখন চীৎকার না করে থাকতে পারলুম না। উপদেশ দেওয়ার অধিকার সকলের নেই, কিন্তু চীৎকার করার অধিকার সকলেরই আছে। তাই দুর্দিনে সকলকে সাবধান হওয়ার জন্য চীৎকার করলাম।

পশ্চিম বাংলার কবি-শিল্পীরা যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। পশ্চিম বাংলার উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়ার অসদুদ্দেশ্য আমার নেই। আমি রাজনীতিক নই; তাই নীতিবিগর্হিত মনোভাবে আমার রুচির অভাব। আমি শুধু এই বলতে চাই, পাপকে স্বীকার না করলে পাপস্খলন হয় না। এ আমার পাপ নয়, তোমার পাপ—এ ধরনের কথা বলে গা বাঁচানোর চেষ্টা ভুল। রবীন্দ্রনাথ তাই পাপকে স্বীকার করার তাগিদ দিয়ে গেছেন। আমি বন্ধুর মতো সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি, মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।

*

রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান।

পাপকে স্বীকার করলেই পাপমুক্ত হয়ে নতুন জন্ম লাভ করা যায়। নইলে পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকতে হয়। দেশের পাপও স্বীকার করা দরকার। নইলে প্রতিক্রিয়ার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে তার অগ্রগামিতা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। আর প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেও তাই।

(সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রগতিহীনতার হেতু না ফল—এই কূট তর্কে আজ আর অবতীর্ণ হতে চাইনে।)

জানি, রাজনীতিকেরা এসব কথার মূল্য দেবেন না। তাঁদের কাছে এ-ধরনের কথা অবাস্তব প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি-শিল্পীরাও যদি অনুরূপ মনোভাবেরই পরিচয় দেন তো আর দুঃখ রাখবার স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ নিয়ে যাদের কারবার, মনুষ্যত্বের অপমানে তাঁরাই যদি চুপটি করে থাকেন তো আর নালিশ জানাবার জায়গা থাকবে না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নারকীয় বীভৎসতা সৌন্দর্যপ্রেমের মুখের সামনে তুড়ি মেরে তাকে দুয়ো দিয়ে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে : তুমি সত্য না, আমি সত্য। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা কি তার ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করবেন? সৌন্দর্যপ্রেম যদি অসুন্দরকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে না শেখায়, তবে তা তো মূল্যহীন, তাকে জীবন-উন্নয়নের সার্থক প্রেরণারূপে গ্রহণ করা যায় না।

দাঙ্গা দমন করতে হলে সাময়িক দমন ও স্থায়ী মুক্তি উভয় দিকেই নজর রাখা দরকার। সাময়িক দমনের প্রয়াস স্থায়ী মুক্তি এনে দিতে পারে না, আর স্থায়ী মুক্তির প্রচেষ্টায় আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা কম। তাই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার। আশু প্রতিকারের জন্য মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার, দাঙ্গাবিরোধী জনমত গঠন, দাঙ্গা গণস্বার্থের বিরোধী বলে দাঙ্গা নিবারণের ব্যাপারে সরকারকে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্যকরণ ইত্যাদি কাজ অবশ্যকরণীয়। কিন্তু তাতে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। স্থায়ী ফলের জন্য সমাজ পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে একটা বাইরের ক্ষত মনে করা হলে ভুল করা হবে। সমাজদেহের গভীরে যে ব্যাধির বীজ গুপ্ত রয়েছে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ। তাই রোগের মূল কারণকে উৎপাটন করার চেষ্টা না করে শুধু বাইরে প্রলেপ লাগালে স্থায়ী ফল পাওয়ার আশা কম। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মানুষ কাজ বিভ্রান্ত; মানুষের সেই বিভ্রান্তিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। তাকে একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে

করলে অন্যায় করা হবে। অর্থনৈতিক নৈরাশ্য দূর করে সুস্থ ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে এই দুর্মর ব্যাধির হাত থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া কঠিন। সুখী মানুষই সুখী দুনিয়া সৃষ্টি করতে পারে; অসুখী মানুষের হাতে অসুখী দুনিয়াই গড়ে উঠে–নিষ্ঠুরতা দুঃখেরই ফল–বারট্রান্ড রাসেলের এই উক্তিতে দ্বিমত হওয়ার কারণ দেখিনে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ধর্ম, ঐতিহ্য, রাজনীতি তথা জাতীয়তাবোধের ঘাড়ে যতই দোষ চাপান যাক না কেন, আসলে তার গোড়ায় রয়েছে sadism বা বিনাশনপ্রবৃত্তি। বিনাশনপ্রবৃত্তি অচরিতার্থ ক্ষুধার সৃষ্টি বা ফল। ব্যর্থ, নিরুদ্ধ কামনা বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি করে, আর বিকৃত মনোভাব সমাজের কড়া শাসনের ভয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে গুটিসুটি মেরে চুপ করে থাকে। হঠাৎ সুযোগ দেখা দেয়, আর অমনি সে ধর্ম, ঐতিহ্য ও জাতীয়তার ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। সমাজের অসমর্থিত আচরণও তখন প্রায় সমর্থিত হয়ে যায়–পশুত্ব আর মনুষ্যত্বে বিশেষ প্রভেদও থাকে না। যে ধর্ম পশুত্বকে দমাতে এসেছিল সেই ধর্মের কাঁধে সওয়ার হয়েই সে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে বলতে থাকে : কেমন পারলে আমাকে দমাতে? তোর শিল তোর নোড়া তোর ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।–ধর্মের ঘাড়ে ভর করেই পশুত্ব ধেই ধেই নৃত্য করতে থাকে। তখন তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। বহুদিন-পরে ছাড়াপাওয়া পশুত্ব একবার জীবনের আশ মিটিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে নেয়।

প্রতিকার— অন্নবস্ত্র, সুশিক্ষা ও আত্মবিকাশের সুবিধা করে দিয়ে মানুষকে সুখী করে তোলা। প্রকৃত সুখী মানুষ কখনো নিষ্ঠুর ও বর্বর হতে পারে না। মানুষকে সৎ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে নীতিবাক্য ও শাসনের বিশেষ কার্যকারিতা আছে বলে মনে হয় না;* সেজন্য যে বস্তুটি একান্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে মনস্তাত্বিক পরিবর্তন, আর মনস্তাত্বিক পরিবর্তন স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার নয়, তা নির্ভর করে আবস্থিক পরিবর্তন ও শিক্ষার উপর। ক্ষুৎপিপাসার অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে সুখ তথা ভালোবাসার স্বাদ পাওয়াতে পারলেই মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। নইলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ক্ষুৎপিপাসার আয়োজনকে যারা অনাধ্যাত্মিক তথা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন আত্মিক জীবনের অ-আও তাঁরা জানেন বলে মনে হয় না। খাওয়া-পরা ও শিক্ষা থেকে মুক্তি পেলেই মানুষ মনুষ্যত্বলোকে উন্নীত হতে পারে। নইলে মানুষের আকার ধারণ করেও সে পশুই থেকে যায়। আবস্থিক পরিবর্তন ও শিক্ষা তাই এত প্রয়োজনীয়।

দাঙ্গার অত্যাচার থেকে স্থায়ী মুক্তি পেতে হলে এসব কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

মনুষ্যত্ব জিন্দাবাদ।

---

* নীতিবাক্য সকলেই বলতে চায়, কিন্তু শুনতে চায় খুব কম লোকই; আর আইন যে কোনো প্রকারে শাস্তি থেকে গা বাঁচানোর প্রবৃত্তি যোগায় সে তো দেখতেই পাওয়া যায়। আইনের দ্বারা মানুষের উন্নয়ন হয় না।

সম্মান ও আত্ম-সম্মান

পৃথিবীতে উন্নতি করিবার পথ দুইটি–একটি আত্মশক্তি, আরেকটি চালিয়াতি। চালিয়াতিও এক প্রকার শক্তি বটে, তবে তাহা ধীরে ধীরে আত্মাকে ক্ষুদ্র ও নির্বীর্য করিয়া চারিত্রিক আধোগতি সাধন করে বলিয়া সর্বদা নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য।

যাহারা আত্মশক্তির সাধনা করে, তাহাদের বড় হইতে সময় লাগে, অথবা তাহাদের কেহ কেহ কোনো সময়ে বড় হইতেই পারে না। তবু তাহাদের জীবন সার্থক এই জন্য যে, তাহারা একটি বড় রকমের আদর্শ দিয়া পৃথিবীকে ঋণী করিয়া যায়। সার্থক হইলে তো কথাই নাই, না হইলেও সাধনার একটা মূল্য আছেই। ভিতরের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মানুষকে সৃজনধর্মী করিয়া তুলে, আর বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহা মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি ও নীচতা হইতে রক্ষা করে।

সার্থকতা সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কারণ তাহা শুধু চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া বিধাতৃ-দত্ত শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সে-শক্তির তারতম্য আছে। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, দায়ী স্বয়ং বিধাতা। শক্তির অভাবের জন্য লজ্জা বোধ করিবার কিছুই নাই। সাধনার অভাবেই আমাদের লজ্জা। আমি চেষ্টা করিলেই রবীন্দ্রনাথ হইতে পারি না। কারণ রবীন্দ্রনাথের শক্তিতে আর আমার শক্তিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু সাধনায় তাঁহার সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। না হইলে বিধাতার অপরাধ হইবে না, হইবে আমাদেরই।

একজন এক শ টাকার মূলধন লইয়া কারবার শুরু করিল, আরেকজনের মূলধন মাত্র পঁচিশ টাকা। পঁচিশ টাকা মূলধনওয়ালার কাছে এক শ টাকার মূলধনের লাভ প্রত্যাশা করা বাতুলতা; তবু সমীকরণ পদ্ধতির দ্বারা দেখা যাইতে পারে–উভয়ের মধ্যে লাভের সমতা আছে কি-না। না থাকিলে বুঝিতে হইবে সাধনায় গলদ, উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। অতএব, ফলের দিকে না তাকাইয়া আমাদের সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়া যাওয়া উচিত। সফল হইলে তো ভালোই, না হইলে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিতে পারিব–আমার কি দোষ? আমার চেষ্টা তো আমি করিলাম। দোষ ঐ যাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, সেই ব্যক্তির। কিন্তু সাধনা না করিয়া বিনা চেষ্টায় কিছুতেই নিজেকে অকৃতকার্যতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিতে পারি না।

২

চালিয়াতির সহগামী তোষামোদ, তোষামোদ আত্মার পক্ষে ব্যভিচার। ভান ও অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তোষামোদ তলে তলে আত্মাকে কলুষিত করিয়া তুলে। শ্রদ্ধা না থাকিলেও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার ভান করিতে করিতে চরিত্র কপট ও দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং পরিণামে ভালো-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতাই নষ্ট হইয়া যায়।

এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ, কারণ তখন বুঝিতেই পারা যায় না যে, নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা হইতেছে।

তোষামোদকারী ও বারবণিতা প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। যৌনসম্বন্ধ নিজে ভালো কি মন্দ, কিছুই নয়। তাহার সঙ্গে মানসিকতার যোগেই তাহা ভালো কি মন্দ হইয়া থাকে। প্রেম ব্যতীত প্রেমের ভান যেখানে সেখানেই তাহা পাপ, অন্যত্র নহে। শ্রদ্ধা ও প্রেম আত্মারই প্রকাশ–ইহা মানিয়া নিলে এ কথা বলিতে পারা যায় যে, বারবণিতা ও তোষামোদকারী উভয়ে আত্মাবমাননাকারী বলিয়াই পাপী, অন্য কারণে নহে।

অথচ বারবণিতা ও বারবণিতা সম্পর্কিত ব্যক্তিকে দেখিলে আমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি, তোষামোদকারীকে দেখিলে ডাকিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠ আসন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আমাদের পাপ-পুণ্যের ধারণা কত অগভীর। যুক্তিযুক্ততার উপর নির্ভরশীল না হইয়া তাহা একটি সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া আছে। যাহা পাপ মনে করিতেছি, তাহা কেন পাপ হইল একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না। দশজনে যখন মনে করিতেছে তখন আমিও মনে করিতেছি; দশজনে মনে না করিলে আমিও বিরত থাকিতাম–ইহাই আমাদের মনোভাব। এই মনোভাব হইতে মুক্তিলাভ না করিলে আত্মিক মৃত্যু অনিবার্য। যে শিক্ষায় তাহা সম্ভব হইবে, তাহার গোড়ার কথা হইবে আত্মনিষ্ঠা বা আত্মসম্মান, তথাকথিত সম্মান নয়। আর লক্ষ্য হইবে জীবনের বিকাশ, সফলতা নয়। সফলতা লাভ করিলে তো ভালোই, না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। সফলতার জন্য বিকাশকে বর্জন করা আর আত্মহত্যা করা সমান।

৩

সম্মান আর আত্মসম্মানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। উভয় ক্ষেত্রে দৃষ্টি-ভঙ্গিমার পার্থক্য বিস্তর। আত্মসম্মানীয় দৃষ্টি অন্তর্মুখী; আর সম্মানীর দৃষ্টি বহির্মুখী। আত্মসম্মানীর সম্মান সে নিজে ছাড়া অন্য কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সম্মানীর সম্মান অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল–সামান্য ধুলা লাগিলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আজ তুমি লক্ষ টাকার মালিক বলিয়া যে সম্মানের অধিকারী, কাল লক্ষ টাকা ফুরাইয়া গেলে আর সে সম্মান থাকিবে না; তুমি নিতান্ত অসহায় ও কৃপার পাত্র হইয়া পড়িবে। তাই কখন কি হয় মনে করিয়া তোমাকে সতত ভীত ও ত্রস্ত থাকিতে হয়। আত্মসম্মান কিন্তু এই ভীত ও ত্রস্ততা হইতে মুক্ত–ভয়ার্ততার পাপ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে।

সম্মানীকে লোক বুঝিয়া কথা বলিতে হয়, সময় বুঝিয়া বাহির হইতে হয়, স্থান বুঝিয়া পদার্পণ করিতে হয়, আর স্বার্থ বুঝিয়া ভাব করিতে হয়। নইলে তাহার সম্মান বজায় রাখা ভার হইয়া উঠে। সে মুক্ত নয়, সে বন্দী–সতত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান বলিয়া তাহার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই।

আত্মসম্মানী কিন্তু এই সব বালাই হইতে মুক্ত। সে নিজের ভিতরে এমন এক শ্রেষ্ঠ সম্পদের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, যাহার মৃত্যু নাই— যাহা অজর, অমর, অক্ষয়, যাহা আগুনে পোড়ে না, জলে বিনষ্ট হয় না, দুর্যোগে ভাঙ্গিয়া পড়ে না; শত শত বিপদপাতের মধ্য দিয়া গিয়াও যাহা ধ্বংস না হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই পরম বস্তুটি লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি, সদানন্দচিত্ত–তাহাকে ভীরুর মতো আগ-পাছ ভাবিয়া গণিয়া গণিয়া পা ফেলিয়া চলিতে হয় না। সে ভাবনা-মুক্ত।

সম্মানীর ভয়ের কারণ এইখানে যে, সে জানে সে ফাঁকি দিয়া বড় হইয়াছে, এবং সেহেতু যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অজুহাতে সেই বড়ত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়া তাহার

পক্ষে অসম্ভব নয়। সেই জন্যই সে ভীরুর মতো সন্দেহপ্রবণ ও স্বল্পপ্রাণ বলিয়াই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। সে মনে করে সমস্ত জগৎ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুতরাং সকলকে টুটি টিপিয়া না মারিলে তাহার পক্ষে তিষ্ঠানো মুশকিল। তাহার অনেক কাজই সাহসের বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তাহা সাহসের ভান, দুর্বলচিত্তের ছটফটানি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্য সে পারিপার্শ্বিক জগৎকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে চায়। যতই সে সাবধান হয় ততই তাহাকে বিসদৃশ ঠেকে–ততই তাহার ভিতরের কদর্যতা বাহির হইয়া পড়ে। অযোগ্য ভুঁইফোড়ের আগমনে এই জন্য যুদ্ধ ও পরিবারিক কলহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

আত্মনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, আত্মনিষ্ঠাই আমাদের বহু পাপ ও অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে পারে,–বাইরের নীতি অথবা তথাকথিত সংযমের আদর্শ নয়। প্রবৃত্তির প্রাবল্যের কাছে বাইরের নীতি তো তৃণবৎ তুচ্ছ, আর আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত সংযম-সাধনার চেষ্টা বালুকার উপর অট্টালিকা নির্মাণের মতোই নিরর্থক। আত্মনিষ্ঠা মানুষকে সৌভাগ্যে প্রমত্ত, দুর্ভাগ্যে অস্থির ও বিপদে অধীর হইতে দেয় না। কারণ আত্মাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বড় কিছুই হইতে পারে না, এই উপলব্ধির মধ্যে একটা বড় রকমের আশ্রয় লাভ করিয়া সে গভীরত্ব লাভ করে। আত্মনিষ্ঠা নাই বলিয়াই তোষামোদকারী বিশ্রী ও প্রগল্‌ভ। তাহার মাথা ও হাত প্রতাপশালীর পায়ে। আর পা দুর্বলের ঘাড়ে। নিজের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকার দরুন সে অপরের আত্মাকেও অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করে না। থাকিলে লজ্জায় অধোবদন হইত।

৪

সাধকের প্রিয় হইতেছে আত্মসম্মান–নিজের আত্মার প্রতি নিজের অপরিসীম শ্রদ্ধা। আর তোষামোদকারীর প্রিয়–সম্মান। প্রথমটি ভিতর হইতে লাভ করিতে হয়, আর দ্বিতীয়টি বাহির হইতে। সাধক সৃজনধর্মী আর তোষামোদকারী সঞ্চয়ধর্মী (possessive)। তোষামোদকারী কি করিয়া সম্মান লাভ করে, তাহার একটা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করা যাক।

সম্মান নির্ভর করিতেছে সার্থকতার উপর। সার্থক না হইলে যত বড় কাজেই হাত দাওনা কেন সম্মান নাই। কবিতা লিখিতেছ ? ক্ষতি কী? রবীন্দ্রনাথ না হইলে আমরা কেয়ার করিব না।–ছবি আঁকিতেছ ? বেশ তো। অবনীন্দ্রনাথ না হইলে আমরা ফিরিয়াও তাকাইব না। বিজ্ঞানচর্চা করিতেছ ? ভালো কথা জগদীশ বসু না হইয়া আসিলে তোমার স্থান নাই।– তাহার চাইতে যাহারা সাঁতারে প্রথম হইল, ফুটবল খেলায় কেল্লাফতে করিল, অথবা ঘোঁড়দৌড়ে ঘোড়া ছুটাইয়া সকলের আগে আসিল, তাহাদিগকে আমরা বরমাল্য প্রদান করিব। কোন্ বিষয়ে কি হইল, অথবা কি ভাবে হইল তাহা দেখিতে চাহিব না। দেখিব শুধু প্রথম হইল কি-না। তাহা হইলেই আমাদের বাস। আমরা "ফিলিস্টাইন"; আমাদের কাছে মুড়ি-মুড়কির একদর।

সার্থকতা লাভের সহজ উপায় তোষামোদ ও চালিয়াতি। উভয়ে মাসতুতো ভাই–সর্বদা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলে। একটিকে ছাড়া অন্যটি অথর্ব হইয়া পড়ে। সুতরাং উভয়কেই একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়। নইলে সার্থকতা সহজলভ্য হয় না। সাধনার দ্বারাও সার্থকতা লাভ করা যায়। কিন্তু সাধনার পথ দুরূহ বলিয়া তোষামোদ ও চালিয়াতিকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিতে হয়।

তুমি বড় হইয়াছ ও উচ্চপদবী লাভ করিয়াছ। তোমার দরবারে আসা-যাওয়া শুরু করিলাম। তোমার মনটি জয় করিতে তোমার শত্রু রহিমের বিরুদ্ধে অযথা নানা কথা

বলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে বোকার মতো তোমার প্রশংসা করিতে লাগিলাম, আর বোকার মতো তুমিও তাহা বিশ্বাস করিয়া খুশী হইতে লাগিলে। ফলে তোমার মনের কোণে আমার জন্য একটি স্থান রচিত হইল। আমি ধীরে ধীরে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম।

তারপর?—তারপর লোকসমাজে আমার বেশ কদর বাড়িয়া গেল। যাহারা তোমার নিকট আসিতে সাহস করে না; তাহারা তোমার কাছে সুপারিশ করিবার জন্য আমাকে ধরিতে লাগিল। আমিও সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের তোষামোদ ও স্তুতিতে স্ফীত হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে খোদার মর্জিতে ও লোকের কৃপায় পকেটও ভারি হইতে লাগিল। তারপর একটু চাল খাটাইয়া সামান্য তোষামোদকারীর পদ হইতে একেবারে তোমার মন্ত্রিত্বের পদে উন্নীত হইলাম। বাস, আর আমাকে পায় কে? এখন তুমি আর আমি প্রায় সমান। তুমি আরো উপরের পদে উন্নীত হইলে আমিও তোমার পরিত্যক্ত পদে উঠিয়া আসিলাম। এতদিন তোমাকে ও তোমার মতো অন্যান্য বড় লোককে নতজানু হইয়া সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে কোমর বাঁকিয়া গিয়াছিল, এখন অন্যের কোমর বাঁকাইতে লাগিলাম। নইলে তোমাদেরই যে প্রিয়-শিষ্য তাহার প্রমাণ করিব কি করিয়া! —তোষামোদলব্ধ উন্নতি ও সম্মানের এ-ই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কিন্তু তোষামোদের শুধু এই রূপ নয়, অন্য রূপও আছে। জনপ্রিয় হইবার জন্য প্রচলিত ও সামাজিক মতবাদের সমর্থন, কবি ও সাহিত্যিক হইবার জন্য বড় লেখকের অনুভূতি ও ভাব চুরি করিয়া রচনা লিখিবার চেষ্টা ইত্যাদি এক প্রকার তোষামোদ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী ব্যতীত অন্য কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আধুনিকদের মধ্যেই এই পাপ অত্যন্ত বেশী। কারণ আধুনিকরাই একটা কিছু হইতে চায়, কিন্তু হইবার যথার্থ সাধনা করে না। তাহারা লিখে, কিন্তু কবিতার অনুভূতির প্রতি সত্যিকার কোনো দরদ রাখে না। মত প্রচার করে কিন্তু মতবাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয় না। মত তাহাদের গায়ের কোট, গায়ের চামড়া নয়। সুবিধানুযায়ী পরে আবার খুলিয়া রাখে। ভণ্ডামি ও চালিয়াতিতে ইহাদের জীবন ক্লিন্ন। বেশ বুদ্ধিলিপ্ত হইয়া জীবন যাপন করিলেও ভিতরে ভিতরে এদের আত্মা মরিয়া আসে, অন্তরের সত্যোপলব্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কবি ও সাহিত্যিকের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত বলিয়া ইহারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী হইয়া পড়ে। বড়-লোকের কেদারায় বসিতে পারিলে তাহারা নিজেকে সরফরাজ মনে করে, এক রাত্রি ইষ্টকনির্মিত গৃহে ঘুমাইতে পারিলে নিজের জীবন ধন্য মনে না করিয়া পারে না। ইহারা অশ্লীল ও কদর্য। দেখা তো দূরের কথা, ইহাদের কথা শুনিলেও চিত্তের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৫

আসলে বিচারপূর্ণভাবে দেখিতে গেলে, তোষামোদ ও চালিয়াতির দ্বারা উন্নতি লাভ করা যায় না। তাহাতে উন্নীত হওয়া যায়, কিন্তু উন্নত হওয়া যায় না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, চালিয়াত ও তোষামোদকারীদের জীবনে তাহা অনুপস্থিত। সে যে-কে-সে অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। শুধু বাহিরের পোষাকী পরিবর্তন ঘটে মাত্র। সে পদকে মর্যাদা দান করে না, পদ তাহাকে মর্যাদা দান করে। তাহার পদে তাহাকে কেমন যেন মানায় না—গম্ভীর হইলে মনে হয় অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। যেন ধরা পড়িবার ভয়ে সতত অতিরিক্ত সাবধান।

উন্নতির একমাত্র পন্থা সাধনা। সাধনা ব্যতীত জীবনে লাবণ্য ফোটে না। উন্নীত না হইলেও তাহাতে লাভ। যতটুকু সাধনা করিলাম ততটুকু অগ্রসর হইলাম, ততটুকু চরিত্রের বিকাশ সাধন হইল। বাস তাহাতেই তৃপ্তি, তাহাতেই আনন্দ। ভিতরে ভিতরে আমি বাড়িলাম, integrated হইলাম, ইহার চাইতে বড় কথা আর কী হইতে পারে? কিন্তু গভীর না হইলে তাহা উপলব্ধি করা যায় না, সূক্ষ্মদর্শী না হইলে তাহা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। কারণ তাহা বাহিরের বস্তু নয়, তাহা চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে।

সাধককে ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলিয়া, লাভ-লোকসানের মায়া কাটাইয়া কেবলই সৃষ্টির আনন্দে কাজ করিতে হয়। সাধনাকে বড় না করিয়া সিদ্ধিকে বড় করিয়া দেখিলে সাধকের চলার শক্তি মন্দীভূত হইয়া আসে, তাহার ভিতরের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছিতে গিয়া সে মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করিয়া বসে। লক্ষ্যে সে পৌঁছে আর উন্নতিও সে লাভ করে বটে, তবে তাহাই তাহার চিন্তা-ভাবনার একমাত্র কারণ হইয়া উঠে না, হইলে সাধনার গতি স্তব্ধ হইয়া যায়–চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে। মনে হয়, সাধক মাত্রই ক্ষণবাদী। ক্ষণগুলির যথার্থ ব্যবহারই তাহাদের একমাত্র কাজ। তবে লক্ষ্যের প্রতি একটুখানি দৃষ্টি না রাখিলে সাধনার ধারা এলোমেলো হইতে পারে বলিয়া তাহার প্রতি মাঝে মাঝে একটু দৃষ্টি রাখা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

সঞ্চয়শীলতা সাধকের ধর্ম নহে। সঞ্চয়ের জালে বন্দী হইলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শুধু বাহিরের বস্তুই নয়, তাহার সৃষ্টির চাইতে সে নিজেই বড় বলিয়া তাহাকে নিজের সৃষ্ট-বস্তুর মায়া কাটাইয়াও চলিতে হয়।

সাধকের মর্মবাণী :

"হায়রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

প্রান্তের চাইতে অপ্রান্তই তাহাকে বেশী করিয়া টানে। তাহার সাধনা আত্মা-বধূর নব নব রূপ দেখিবার সাধনা। সঞ্চয়ের প্রতি লোভ থাকিলে উদার ও সুন্দর জীবন যাপন করা মুশকিল হইয়া উঠে–চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বিক্ষিপ্ততা অরাজকতার মূর্তি নিয়া দেখা দেয়। রাসেলের উক্তিই এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : "... not even the most purity defensive forms of possessiveness are in themselves admirable; indeed as soon as they are strong, they become hostile to the creative impulses."Take no thought, saying what shall we eat? or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed?" Whoever has known a strong creative impulse has known the value of this precept in its exact and literal sense. It is preoccupation with possession, more than anything else, that prevents men from living freely and nobly?"

সাধক সাধনার দ্বারা যাহা দান করিয়া যায়, তন্মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্বই প্রধান। ইহা খণ্ড-সৃষ্টি নয়, সম্পূর্ণ সত্তা। সমস্ত খণ্ড-সৃষ্টি ইহার মধ্যে বিধৃত। এই ব্যক্তিত্ব সে শুধু তাহার পুত্র-কন্যাকে দান করিয়া যায় না, সমস্ত মানবসম্প্রদায়ই তাহার উত্তরাধিকারী; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পুত্র-কন্যাই তাহা হইতে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়। অত্যন্ত নিকট হইতে দেখে বলিয়া অনেক সময় তাহারা তাহার সৌন্দর্য ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

৬

সাধকের চিন্তা ও কর্ম যেখানে সকলের, সেখানে সে নৈর্ব্যক্তিক। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সাধক যতই নৈর্ব্যক্তিক হইতে থাকে, ততই তাহার ক্ষুদ্র 'আমি' ক্ষুদ্রতম হইয়া, বৃহৎ 'আমি' বৃহত্তর হইতে থাকে। নৈর্ব্যক্তিক হইবার সহায়ক বলিয়াই আল্লাহ্‌র আরাধনা মানব-চিত্তের পক্ষে এত কল্যাণকর। তিনি অনন্ত, অসীম ও প্রেমময়। সকলকে লইয়াই তিনি জাগিতেছেন কিন্তু সকলকে অতিক্রম করিয়াও আছেন, তিনি অবিনশ্বর আর সকলে নশ্বর। এই মনোভাব মানুষকে যতটা ঔদার্য ও বিশালতা দান করিতে পারে, আর কোনো মনোভাবই ততটা পারে না। এইখানেই ঈশ্বরের ধারণার শ্রেষ্ঠতা। ডিমোক্রেসি বলো, এনার্কিজম বলো, কোনোকিছুতেই তুমি এত বড় সার্থকতা লাভ করিতে পার না, এমন বিপুলভাবে পরিপূর্ণ হইতে পার না। কিন্তু যেখানে এই চারিত্রিক প্রভাব নাই, সেখানে তাঁহার আরাধনা শুধুই নাম-পূজা, শুধুই অভিনয়। তোমার গুণ গাহিলাম, কিন্তু গুণে গুণান্বিত হইলাম না; তোমার নাম করিলাম, কিন্তু চরিত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলাম না; ইহার মতো বড় রকমের ঠাট্টা আর কি হইতে পারে, ধারণা করা কঠিন। আল্লাহ্ যদি সবাক হইতেন তবে নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া বলিতেন–বন্ধ কর তোমার পূজা, শুনিতে চাই না ঐ অনুপযুক্ত মুখে আমার নাম-গান।– কিন্তু তিনি নীরব বলিয়াই তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে।

অনেকে ব্যক্তিত্বকে প্রভুত্বের সঙ্গে এক করিয়া দেখে–প্রতাপশালীকে ব্যক্তিত্বশালী বলিয়া ভুল করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সে অত্যন্ত সাধারণ, তাহার কোনো বিকাশ নাই, সুতরাং ব্যক্তিত্বও নাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোথাও তাহার তিলমাত্র প্রভেদ নাই। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আসলে সেবার সম্পর্কই বেশী। সেবার ভাব না আসিলে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া যায় না, আর নৈর্ব্যক্তিক না হইলে ব্যক্তিত্ব বিশাল ও গভীর হয় না। সেবার ভাব না জাগিলে শুধু 'আমি'র কারাগারে বন্দী থাকিতে হয় বলিয়া জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তোষামোদকারীর নৈর্ব্যক্তিক সাধনা নাই বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বও নাই। তাহার প্রতাপ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রভাব নাই। যেটুকু থাকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা শেষ হইয়া যায়। সাধকের ব্যক্তিত্ব কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাকে পৃথিবীতে অমর করিয়া রাখে। নৈসর্গিক দ্রব্যের মতো ব্যবহারে লাগাইয়া মানুষ তাহা হইতে প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, মৃত্যুর পরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই সাধক সাধনা করে না, কীর্তিমান হইবার জন্যই কীর্তি গড়া তাহার উদ্দেশ্য নয়। এই সাধনাতেই তাহার আনন্দ ও তৃপ্তি বলিয়া সে তাহা করিয়া যায়। 'ফাল্গুনী'র যুবকের ভাষায় সাধকের মর্মবাণী : "কীর্তি ? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে ? কীর্তি তো আমাদের ফেনা–ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না?"

৭

সাধকের প্রথম ও প্রধান শত্রু লোভ— চাকচিক্যময় জীবনের প্রতি টান। দ্বিতীয় শত্রু প্রতিযোগিতা। উভয়ের সম্মিলিত অত্যাচারে তাহার জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। লোভ ও প্রতিযোগিতা প্রথমে তাহার ভিতর হইতে জাগে না, অন্যে জাগাইয়া দেয়। তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ যে তাহার অপকারই করে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। পারে না বলিয়াই ক্ষমার পাত্র। নইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনের অভিযোগ আনা সহজ হইত। সাধককে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন

করিলে তাহার ভিতরের আনন্দের উৎসটি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তখন সে অথর্ব ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। ইচ্ছাবৃত্তির দ্বারা সৃজনাবেগকে ধ্বংস করিতে করিতে সে ক্রমাগত তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে। তাহার জীবনের পূর্ণতা ও চরিত্রের অটুট ভাব নষ্ট হইয়া যায়। রাসেল এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য :

"The worst things are those to which will assents. Often, chiefly from the failure of self-knowledge, a man's will is on a lower level than his impulse ; his impulse is towards some kind of creation, while his will is towards a conventional career, with a sufficient income and the respect of his contemporaries. .....Because the impulse is deep and dump, because what is called commonsense is often against it, because a young man can only follow it if he is willing to set up his own obscure feeling against the wisdom and prudent maxims of elders and friends. It happens in ninety-nine cases of a hundred, that a creative impulse, out of which a free and vigorous life might have sprung, is checked and thwarted at the very outset : the young man consents to become a tool, not an independent workman, a mere means to the fulfilment of others, not the artificer of what his own nature feels to be good. In the moment when he makes this act of consent something dies within him. He can never again become a whole man, never again have the undamaged self-respect, the upright pride, which might have kept him happy in his soul in spite of all outward troubles and difficulties..."

বলা হইয়াছে, অন্তরের সহজ প্রবৃত্তি নষ্ট হওয়ার দরুন সাধক ক্রমে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে। তিক্ততা ধীরে ধীরে নৃশংসতায় পরিণত হয়, আর সেই নৃশংসতাকে সে কখনো সাহস, কখনো নৈতিকতার ছদ্মবেশ পরাইয়া চালাইতে থাকে। ক্রমে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা বলবতী হয়, অর্থাৎ নিজের সুখ-সৃষ্টির চাইতে পরের দুঃখ-সৃষ্টির স্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। নিজের ভিতরের কাজ করিবার প্রেরণা স্তব্ধ হইয়া আসে, অন্যকে জব্দ করিবার জন্যই তাহাকে সবকিছু করিতে হয়। জীবনের বিকাশের আর আনন্দ পায় না বলিয়া যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো উপায়ে সার্থকতা লাভকেই সে বড় করিয়া দেখিতে শুরু করে। সার্থকতা লাভের জন্য সে এত ব্যস্ত হইয়া উঠে যে, আত্মার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়িতেও তাহার কুণ্ঠাবোধ হয় না। এইরূপে success-এর bitch goddess-এর আরাধনা চিত্তের সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া তাহাকে একেবারে অনুভূতিহীন পশুতে পরিণত করে।

সাধকের জীবন কিভাবে লোভ ও প্রতিযোগিতার বশবর্তী হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহার একটা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করা যাক। ধরা যাক, 'ক' নামক একটি লোক সহজ প্রেরণার বশবর্তী হইয়া শিল্প-চর্চাকেই তাহার সাধনার বিষয় করিয়া তুলিল। (এখানে বলা দরকার, প্রত্যেক সাধককেই সহজ প্রেরণার বশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। নইলে তাহার পথচলা সহজ ও আনন্দদায়ক হয় না।) শিল্পে কি করিয়া নতুনত্ব সৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই তাহার ঝোঁক। একলা ঘরে বসিয়া অথচ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার দিন কাটে বেশ। জীবিকা অর্জনের চাইতে জীবনার্জনের দিকেই তাহার নজর বেশী। সে অনুভব করে তাহার চিত্তে স্পর্শমণির মতো এমন এক দুর্বল বস্তু আছে যাহার স্পর্শে সামান্য ধূলিবালিও সোনা হইয়া উঠে, নিতান্ত সাধারণ জিনিসও অসাধারণত্ব লাভ করে। সেই স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিবার জন্য, কীট-পতঙ্গ, তৃণলতা সমস্ত কিছু লইয়া বিশ্ব-সংসার তাহার মনের দুয়ারে অতিথি। আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া সে তাহার আত্মার প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীল। কস্তুরীমৃগের মতো সে আপনার গন্ধে আপনি পাগল।

কিন্তু তাহার এই তন্ময়তার অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তাহার শিল্পচর্চায় খুশী না থাকিয়া তাহাকে বাস্তবজগতে উন্নতি করিবার জন্য উপদেশ দিতে থাকে। তাহার মা তাহার বাল্য-বন্ধু 'খ'-র নজীর দেখাইয়া তাহাকে বড়লোক হইতে বলে। 'খ' নাকি পাটের ব্যবসায় করিয়া অজস্র টাকা করিয়াছে; আর এক প্রাসাদতুল্য বাড়ি নির্মাণ করিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাদের কথায় তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, তাহাকে আত্মহত্যা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সন্দেহ-শয়তান তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া তাহার ভিতরের দেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সন্দেহ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিতে থাকে—ফেলে রাখ তোমার শিল্পচর্চা। ওসব দিয়ে কি হয়? পার তো 'খ'-র মতো একখান অট্টালিকা নির্মাণ কর, আর লোকের আভূমি-প্রণত সেলাম গ্রহণ কর। দেবতা তিরস্কারের সুরে বলে : ছি ছি একি তোমার মতিগতি? শেষে কাঞ্চণ ফেলে কাচ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে? আত্মার বিকাশেই তোমার তৃপ্তি; কেন ওসব বাইরের আবর্জনার প্রতি নজর দাও? পরিণামে বহু যুঝাযুঝির পর দেবতা পরাজয় লাভ করে। সন্দেহ জয়ী হইয়া তাহাকে বাস্তব জগতে উন্নতি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। ক্রমে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগে এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাপও অন্তর-রাজ্য দখল করিয়া বসে। সে আত্মহত্যা করে। শিল্পচর্চা ছাড়িয়া দিয়া সে ছবির ব্যবসায় শুরু করে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাহাতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া 'খ'-কে জব্দ করিবার জন্য এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে। চারিদিকে তাহার জয়জয়কার পড়িয়া যায়। তাহার উন্নতি ও সম্মান দেখিয়া তাহার মা তাহাকে স্নেহ-আশীর্বাদ জানায়, পিতা যোগ্যপুত্র বলিয়া অভিনন্দিত করে, আর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধব, এতদিনে সে মিথ্যা কল্পনা পরিহার করিয়া নিরেট খাঁটি মানুষ হইয়াছে বলিয়া করমর্দন করে।

কিন্তু পূর্বেকার প্রশান্তি আর তাহার নাই। একলা ঘরে বসিয়া থাকিতে এখন আর তাহার ভালো লাগে না। মনে হয়, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে; কিসের বিরহে যেন মন উতলা হইয়া উঠে, চোখ বাষ্পায়মান হইয়া আসে। ব্যথা ভুলিতে সে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া বেড়ায়—পাগলের মতো ছুটাছুটি করিয়া সময় কাটায়। তবু আনন্দ করায়ত্ত হয় না। 'খ', 'খ', 'খ';—'খ'—র ভূতে তাহাকে পাইয়াছে, 'খ' ছাড়া দুনিয়াতে সে এখন আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। তাহার নিজের অস্তিত্বের চাইতেও 'খ'-র অস্তিত্ব তাহার কাছে এখন সত্যতর। আনন্দ তাহার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী ঢুঁকিয়াও সে এক বিন্দু আনন্দ লাভ করিতে পারে না। যাহা তাহার জন্য আকাশ আলোর মতো অজস্র ছিল, যাহা নিজে উপভোগ করিয়া অন্যকে বিলাইয়াও উদ্‌বৃত্ত থাকিত, তাহা এমন দুর্লভ হইল কি করিয়া, শত চিন্তা করিয়াও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শুধু মনে হয়, কী যেন পৃথিবী হইতে পলাইয়া গিয়াছে, কি যেন নাই। যে সন্ধ্যাতারা প্রতি সন্ধ্যায় তাহার জন্য আনন্দ-বার্তা বহন করিয়া আনিত, তাহা যেন এখন বিদ্রূপবার্তা নিয়া আসে। তাহার মুখে হাসি নাই, আছে ব্যঙ্গ।

সে জানে না যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে ;—তাহার পিতা-মাতাও না, বন্ধু-বান্ধবও জানে না। যে-সব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আত্মা আত্মা করিয়া অস্থির, তাহারাও না। আত্মসম্মানের প্রতি আমাদের নজর নাই, বাহিরের সম্মান পাইলেই ব্যস। সম্মানের জন্য আত্মাকে বিক্রি করিতেও আমরা প্রস্তুত। তবু আমরা ধার্মিক। ধর্ম ব্যাপারে পান হইতে চুন খসিলে অস্থির হইয়া পড়ি। হায় রে, ধর্মের খাঁচাটি লইয়া আমরা সানন্দে নৃত্য করিতেছি, পাখিটি কবে উড়িয়া গিয়াছে, সেদিকে কাহারো লক্ষ্যই নাই।

একখানি চিঠি

বাংলা সাহিত্যে, এমনকি মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে, ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট নয় এই আফসোস যত্রতত্র শুনতে পাওয়া যায়, এবং সেজন্য আমাদের চোখের জলেরও অন্ত নেই। কিন্তু কেন যে এই প্রভাবের দৈন্য, কেউই তা ভালো করে ভেবে দেখে নি। আমরা মোটামুটি এই মনে করেছি যে, আমরা পুরা মুসলমান হতে পারি নি বলেই সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব স্বল্প। কিন্তু তা সত্য নয়, তার উল্টোটাই সত্য। ইসলামকে সাহিত্যের ব্যাপার করে তুলতে হলে তিনটি জিনিস মনে রাখা দরকার : ইসলামকে জানা, বোঝা ও ভোলা, এক কথায় হজম করা। ইসলাম কেন, যে কোনো জিনিস জেনে না ভুললে, অর্থাৎ অবচেতনার ব্যাপার না হলে তা সাহিত্যের সামগ্রী হতে পারে না। কারণ সাহিত্য মোটের উপর মানসিক সৌন্দর্যের ব্যাপার, আর বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে না আসলে কোনো জিনিস মানসিক সৌন্দর্যে পরিণত হয় না। অচেতন হওয়া মানে নতুন রূপ লাভ করা, অন্য কথায় বিকৃত হওয়া। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই নতুন রূপ লাভ অথবা বিকৃতিকে আমরা মনে মনে বেশ ভয় করি। বিকৃতি যে জীবন আর অবিকৃতি যে মৃত্যু, এ বোধ আজও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। তাই ইসলামকে অবিকৃত রাখবার উদ্দেশ্যে আমরা তাকে জানার বস্তু না করে মানার বস্তু করে রেখেছি। তার ফল হয়েছে এই যে, ইসলামিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন থাকলেও, ইসলামকে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রভাব থেকে আমরা বঞ্চিত। তার প্রমাণ এই যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইসলামের এক বড় লক্ষণ, এ কথা জোর গলায় প্রচার করলেও জীবনে তাদের অনুশীলন আমরা স্বল্পই করি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তথাকথিত ইসলামিক 'তমদ্দুনে'র জাগরণ যাঁরা চান ইসলামিক ক্রিয়াকাণ্ডকেই তাঁরা বড় করে দেখেন। সংস্কার ও সংস্কৃতির তাঁরা বিভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারেন না। আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে এই ভুল থেকে নিস্তার পেতে হবে; নইলে তাঁদের মৃত্যু অনিবার্য এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মরণও ঘনিয়ে আসবে।

সাহিত্যে ইসলামকে সার্থক করার উপায় স্বরূপ আমি যা বলেছি, সৌভাগ্যবশতঃ তার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই রয়েছে। যে বাঙালি কবির রচনায় ইসলাম কিছুটা ফুটতে চেয়েছে, তিনি ইসলাম সম্বন্ধে অর্থাৎ লৌকিক ইসলাম সম্বন্ধে ততটা সচেতন নন। ইসলামিক পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাসের সৌন্দর্য থেকে প্রেরণা লাভ করে তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেন। অনুরূপ প্রেরণা অন্যস্থান থেকে লাভ করতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। পাত্র নয়, সুরাকেই তিনি বড় করে দেখেন, এবং পাত্রের ভেদ সত্ত্বেও সুরার অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। ইসলামিক ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধে সচেতন হলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভবপর হতো না। ক্রিয়াকাণ্ডের মূর্তি-পূজায় তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যপ্রেরণাও লয়প্রাপ্ত হতো।

উপরে যে সুরার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে জীবনরস, আরো সোজা করে বলতে

গেলে, মানবজীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বেদনা ইত্যাদি। এবং সেই সুখ-দুঃখ-বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার। বলাবাহুল্য এইগুলো বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটে সম্পত্তি নয়, মানুষের এজমালি সম্পত্তি। সুতরাং সহজভাবে এই সাধারণ সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে ইসলামিক সাহিত্য সৃষ্টি হবে না মোটেই। যাঁরা ইসলামকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চান তাঁদের প্রথমে সহজভাবে মানব-প্রেমিক হতে হবে, তার পরে কোথায় তাঁদের প্রিয় ইসলাম মনুষ্যত্বের বাহন হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। মনুষ্যত্ব-প্রীতির ভিত্তির উপর ইসলাম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত না হলে তা হবে একটা মোহ ও অহঙ্কারের ব্যাপার, আর মোহ ও অহঙ্কার যে বন্ধন তা আমরা সকলেই জানি। মোট কথা ইসলামকে লক্ষ্য না করে, জীবন বিকাশের উপায় করে দেখা উচিত। নইলে ইসলাম ও জীবন উভয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ কথার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশীদূর যেতে হবে না, আমাদের বর্তমান জীবনের পানে তাকালেই তা উপলব্ধি করা যাবে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য আবুল ফজল সাহেবের গতবারের সাহিত্য-সম্মিলনী উপলক্ষে লিখিত চিঠিখানা সম্বন্ধে। ফজল সাহেবের অভিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। বাংলা ভাষার প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের একটা অভিধান সত্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সাহিত্য সমিতি যদি এই অভিধান প্রণয়নের ভার নেন তবে একটি কাজের মতো কাজ করবেন। অভিধান সঙ্কলন ব্যাপারে চারটি বিষয়ে নজর রাখা দরকার। বঙ্গীকৃত আরবি-ফারসি শব্দ, তার শুদ্ধ রূপ, তার মৌলিক অর্থ ও বঙ্গ ভাষায় প্রচলিত অর্থ। যাঁরা বঙ্গীকৃত রূপকে অবহেলা করে শুদ্ধ রূপকে সাহিত্যে চালাবার পক্ষপাতী আমি তাঁদের দলের নই, বরং তাঁদের চেষ্টায় আমি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাব অনুভব করি। কারণ শব্দের যে বিকৃতি বা পরিবর্তন তা অপ্রয়োজনে হয় না, প্রয়োজনেই হয়ে থাকে। Basis of articulation বা স্বর-যন্ত্রের উপরে দেশ-কালের আবহাওয়ার প্রভাব ভাষা-তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেন। তাই একই শব্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উচ্চারণ লাভ করে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অগ্রাহ্য করে আরবি ফারসি শব্দকে শুদ্ধি করার দিকে নজর দিলে Basis of articulation-এর উপর জবরদস্তি করা হবে, বোকার মতো তাঁদের আরবি ফারসি শব্দ বর্জনের একটা সুযোগ দেওয়া হবে। কারণ, মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে কষ্টেসৃষ্টে শুদ্ধ উচ্চারণটি আদায় করা গেলেও শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় থেকে তা আদায় করা সম্ভব হবে না এবং সে-অজুহাতে তাঁরা সেগুলি বর্জন করার তাগিদ উপলব্ধি করবেন। আরবি ফারসি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ দাবি করলে শুধু যে হিন্দুদেরই বিপদে পড়তে হবে তা নয়, আরবি ফারসি অনভিজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণকে অনুরূপ বিপদে পড়তে হবে।

সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, বিদেশী শব্দগুলো ভাষায় যেভাবে আসে সে ভাবেই থেকে যায়। তাদের অধিকৃতির দাবী কেউ করে না। ইংরেজি ভাষায় গ্রিক ও ল্যাটিন শব্দগুলো শুদ্ধকরণের চেষ্টা আজো হয় নি। বাংলা ভাষার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়।

অভিধানের সঙ্গে সাহিত্য সমিতি আর একটা জিনিসের ভার নিতে পারেন–সেটি মুসলমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনা। মুসলমান সাহিত্যকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় : প্রাচীন ও আধুনিক। আধুনিক সাহিত্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: মিশনারী সাহিত্য ও সত্যিকার সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্য বলতে আমি বুঝেছি দৌলত কাজি, আলাওল, হায়াত মামুদ প্রভৃতি রচিত সাহিত্য। মিশনারী সাহিত্য বলতে বুঝি, বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত সেই সব গ্রন্থ যাতে ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমাদের অহঙ্কারকে স্ফীত করেছে কিন্তু প্রেমকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয় নি।

এই সাহিত্য মূলতঃ প্রতিবাদ সাহিত্য; এর গোড়ায় রয়েছে সন্ত্রাস ও ভীতি– পাছে মুসলমান তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে, এই ভয়। সহজভাবে পৃথিবীর পানে তাকিয়ে কথা বলবার লক্ষণ এই সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ যে Human interest মানবজীবনের প্রতি কৌতূহল, প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও কোথাও তা পাওয়া গেলেও, মিশনারী সাহিত্যে তা সুদুর্লভ। লুৎফুর রহমান, তরিকুল আলম, বরকত উল্লাহ, আবদুল ওদুদ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও গোলাম মোস্তাফা, নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন প্রভৃতি কবির পূর্ববর্তী লেখকদের রচনাকে সাধারণতঃ এই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে যে কেউ কেউ আজো জীবিত আছেন, শুধু তাই নয়, মিশনারী সাহিত্যিকদের কেউ কেউ এ ধরনের সাহিত্য রচনা করেন নি তা নয়। নেতৃস্থানীয় হয়েই আছেন। তার কারণ মিশনারী-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধির দীপ জ্বালিয়ে স্বাধীনভাবে পথ চলার সাধনা আজো মুসলমানসমাজে সম্ভব হয় নি। কখন যে হবে তাও বলা কঠিন।

মিশনারী সাহিত্যের পরে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাকেই সত্যিকার সাহিত্য বলতে চাই। এ সাহিত্যের লক্ষণ ইসলাম বা মুসলমানের তথাকথিত গৌরববর্ধনের প্রচেষ্টা নয়, Human interest ও বুদ্ধির মুক্তির দাবী। এ সাহিত্যের মধ্যে যে তাজা প্রাণ ও সজীব মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মুসলমানরা অচিরেই একটা বড় জীবন ও বড় সাহিত্যের অধিকারী হবে।

বলাবাহুল্য, সত্যিকার সাহিত্যকেও এক হিসাবে মিশনারী সাহিত্য বলা যায়। কারণ, এর পেছনেও প্রচারের প্রেরণা রয়েছে। কিন্তু সাহিত্যিকের প্রেরণা আর মিশনারীর প্রেরণায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাহিত্যিকরা প্রচার করেন নিজের অন্তরোপলব্ধ সত্য, আর মিশনারীরা প্রচার করেন অপর থেকে লাভ করা আদর্শ– বংশগতভাবে প্রাপ্ত বলে যার প্রতি তাঁদের টান প্রায় সব সময়ই অহেতুক।[১]

প্রবীণ সাহিত্যিকদের উপাধি দান সম্বন্ধে আবুল ফজল সাহেব যা বলেছিলেন, আমি সে-সম্বন্ধেও দুএকটি কথা বলব। সাহিত্যচর্চার জন্য গভর্নমেন্টের উপাধি দান নতুন ব্যাপার নয়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ও জলধর সেন মহাশয়দ্বয় সাহিত্যচর্চার জন্য গভর্নমেন্টের উপাধি লাভ করেছিলেন, এ কথা আমরা সকলেই জানি। মুসলমানদের মধ্যেও এমন দুএকজন কৃতী সাহিত্যব্রতী রয়েছেন যাঁরা তাঁদের সাধনার জন্য উপাধি লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু এই প্রস্তাবই মোটের উপর আমার ভালো লাগে নি–এতে যেন কেমন ভিখারীপনা প্রকাশ পেয়েছে। সবচেয়ে লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার যে, ভিক্ষা চেয়েও আমরা ভিক্ষা পাই নি–কর্তৃপক্ষের দ্বার থেকে অবহেলিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। আবেদন আর নিবেদনের থালা বওয়ার নিষ্ফলতা আজ আমাদের চেহারায় বেদনার কালি ঢেলে দিয়েছে। তাই সেধে অপমান ডেকে আনার অভিযোগে আবুল ফজল সাহেবকে অভিযুক্ত করা যায়। তিনি যদি শুধু নিজের জন্য অপমান ডেকে আনতেন তো কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু তিনি যে সমগ্র সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে অপমানিত করলেন। আমাদের কাছে ফজল সাহেবের কৈফিয়ত দেবার কি আছে, জানিনে।

সাহিত্যিক মাত্রই জানেন তাঁরা সম্মানের কাতর নন, সম্মান ও পদবী রাজনীতিকদের জন্য বরাদ্দ রেখে তাঁরা মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিই কামনা করেন। এই শ্রদ্ধা ও প্রীতিই (ঢাক পিটানের সম্মান নয়) তাঁদের সৃজনীশক্তিতে অব্যাহত রাখতে সহায়তা

১. উপরে যে পর্যায় সৃষ্ট করা হলো তা যে একেবারে নির্ভুল তা বলা যায় না। ব্যতিক্রম সকল স্থানেই থাকে, এখানেও থাকা অস্বাভাবিক নয়।

করে। তা ছাড়া, সাহিত্যিকগণ নিজেরাই নিজেদের শ্রদ্ধা দিয়ে থাকেন। এই শ্রদ্ধাই সত্যিকারের শ্রদ্ধা, কারণ আমরা নিজেদের ফাঁকি দিতে পারিনে বলে, এতটুকু বেশী কি কম হয় না। আমাদের অন্তরে যখন কোনো সুন্দর ভাব-কল্পনা বা অনুভূতি জাগে তখন আমাদের প্রতি আমাদের যে প্রেম ও শ্রদ্ধা, তা অনির্বচনীয়। বাইরের জগৎ শত চেষ্টা করেও তা উপলব্ধি করতে পারে না।

তবে আবুল ফজল সাহেবের প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয়তা এক হিসাবে স্বীকার করা যায়। তাঁদের নিজের লাভের জন্য না হলেও সমাজের উপকারের জন্য সাহিত্যিকদের উপাধি ভূষিত করা কর্তব্য। বলাবাহুল্য, শুধু অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় নয়, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও মারাত্মকরূপে সাহিত্য সম্পর্কহীন। সাহিত্য যে জাতীয় উন্নতির প্রতীক, সাহিত্য সম্পর্কহীন জীবন যে ইতর জীবন, এ বোধ আজও তাঁদের জীবনে সঞ্চারিত হয় নি। এই ধরনের লোকদের সাহিত্যসম্বন্ধে সচেতন করতে হলে উপাধির মতো স্থূল ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। কিন্তু সে-প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করলেও, সরকার উপলব্ধি করেন কিনা, কে জানে। উপরিউল্লিখিত শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতো সরকারও হয়তো সাহিত্যকে একটা বাজে জিনিস ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। সুতরাং 'আবেদন আর নিবেদনের থালা' আর বেশীদূর বহন না করাই ভাল।

জুবিলির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। এর পর হতে যেন সমিতির নব পর্যায় শুরু হয়। বলাবাহুল্য, সমিতির সঙ্গে যুক্ত 'মুসলমান' শব্দটার চেয়ে 'সাহিত্য' শব্দটি বড় হয়ে না উঠলে তা কখনো সম্ভব হবে না। দেশের দুর্দিনের ইঙ্গিতটুকু আমাদের ভালো করে উপলব্ধি করা দরকার। তা যে একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের বুদ্ধিহীনতা ও অপদার্থতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে, তা যেন আমরা টের পাই। আমাদের মনে রাখা দরকার : যে সমাজ সর্বাগ্রে এই ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করবে সেই সমাজই বড় হবে। অন্যকথায় সে-সমাজ নাবালক শিশু না হয়ে দায়িত্বশীল অভিভাবক হওয়ার চেষ্টা করবে। আশা করি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আপ্রাণ ও সদাজাগ্রত চেষ্টায় বাংলার মুসলিম জীবনের সর্বনাশকর ব্যাধি অসহিষ্ণুতা ও মানসিক ছুঁৎমার্গ দূরীভূত না হলে তা কখনো সম্ভব হবে না। তাই, সমিতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই মারাত্মক ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই যুদ্ধে জয়লাভের উপরেই সমিতির সার্থকতা নির্ভর করছে। সাহিত্য সমিতির সোৎসাহ চেষ্টার ফলে ব্যাধিমুক্ত হয়ে মুসলমানসমাজ অচিরে দেশের কল্যাণের বাহন হয়ে উঠবে, এই আশা পোষণ করে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলুম।[২]

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উপলক্ষে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সাহেবকে লিখিত পত্রের সারমর্ম।

কাজী নজরুল ইসলাম

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। বিদ্যালয়ের নিগড়মুক্ত হয়ে আমরা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছি।

অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।

আমাদের জীবনে এসেছে তার বিপরীত স্রোত। অপাঠ্য, পাঠ্য-কেতাব কুলুঙ্গিতে তোলা হয়েছে, আর কাব্য সামনে খোলা রয়েছে। বিশেষ করে মাসিক পত্রিকার মারফত প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক অবদানে অন্তরে নবজীবনের স্বাদ সূচিত হয়েছে। মুক্তি, মুক্তি। সমস্ত আকাশে বাতাসে যেন মুক্তির বার্তা প্রচারিত। একটি বছরের মধ্যে যেন আমি নবজন্ম লাভ করলুম। আমি তো এগিয়ে এলুম, কিন্তু আমার সমাজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সমাজের চেহারার দিকে তাকালে দুঃখ হতো। সমাজপতিরা বলতেন সমাজের অবনতির কারণ ঐক্যের অভাব–আমার মনে হতো অনৈক্যের অভাব। জীবন-দর্শনের ব্যাপারে ছেলে-বুড়োর মতের অনৈক্যই প্রগতির উপায়। কিন্তু আমাদের সমাজে সে-অনৈক্য তখন দেখতে পাই নি। (অবশ্য এখনো যে দেখতে পেয়েছি, তা নয়।) আমাদের সমাজে তরুণ আন্দোলন বলে কোনো জিনিস ছিল না এবং এখনো নেই। সেকালে সবচেয়ে দুঃখ দিত আমাদের সাংস্কৃতিক দীনতা। কাব্য, সাহিত্য, চিন্তাশীলতা কোনো দিক দিয়েই আমরা শক্তির পরিচয় দিতে পারি নি।

এমন সময় মাসিকের পাতায় পাতায় নজরুল ইসলামের লেখা দেখতে পেয়ে মন খুশিতে নেচে উঠল, মনে হলো : এতদিনে সমাজে একটি যথার্থ তাজা মনের আবির্ভাব হলো। তাঁর কাব্য কেবল ছন্দমেলান নয়, যথার্থ অনুভূতির ব্যাপার। গোড়াতেই নজরুলের যে দিকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে তাঁর সহজ মনুষ্যত্ব। পরে শুনতে পেয়েছি রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ফলেই তাঁর ভেতরে এই সহজ মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হয়েছিল।

মাসিক পত্রে তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও গান বেরুতে লাগল। গল্পের মধ্যে হেনা, বাদল-বরিষণের ভাষা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করল। পত্রোপন্যাস বাঁধনহারায় কবির তরুণ জীবনের প্রতিচ্ছবি কিছুটা ফুটেছে–তাতে যে ব্যর্থপ্রেমের হাহাকার শুনতে পেলুম তাতে মন অভিভূত হলো। সাতিল আরব, কোরবানী, মোহররম প্রভৃতি কবিতার বীর্যশালিতা দেখে বিস্মিত হলুম! সন্ত্রাসবাদে তাঁর যে বিশ্বাস ছিল, এসব কবিতা তারই সাক্ষী। নজরুলের বালকবয়সে স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রভাব তাঁর মনের উপরে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আওতায় লালিত সন্ত্রাসবাদ কবির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তাই পরবর্তী কালেও তাঁকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত দেখতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে ১৯২০ কি ১৯২১ সালে নজরুল ইসলাম কুমিল্লা আসেন। কুমিল্লার বিখ্যাত মহেশপ্রাঙ্গণে প্রত্যহ সন্ধ্যায় মিটিং হতো। আমরা প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে যেতুম। একদিন অসুস্থ ছিলুম বলে মিটিং-এ যেতে পারি নি। মামা এসে বললেন : আজকের মিটিং-এ একজন মুসলমান কবি গান গাইলেন। লোকটির চেহারায় প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট–চোখ দুটো যেন বাঘের চোখের মতো জ্বলছে। –কবি ঈশ্বর পাঠশালার তদানীন্তন শিক্ষক ধীরেন সেনের বাড়িতে থাকতেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাচ্ছেন : 'ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।' তাঁর সামনে ছড়িয়ে ছিল শেফালি, গীতপঞ্চাশিকা, কেতকী, কাব্যগীতি প্রভৃতি-সঙ্গীতের বই। তিনি সে-সময়ে নিজের গানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানই বেশী গাইতেন। রবীন্দ্রনাথকে বলতেন গুরুদেব। কবিশেখর হাফিজের ভক্তও তিনি ছিলেন। হাফিজের প্রেমের উন্মাদনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বলে তিনি দেওয়ানই হাফিজের তর্জমা করছিলেন। আরেকটি দল তাঁর শ্রদ্ধা লাভ করেছিল, সে হচ্ছে বাংলার সন্ত্রাসবাদীর দল।

কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং অনেকদিন পরে ফিরে আসেন। এবার বাংলা জোড়া নামের অধিকারী–হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম নয়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহীর মধ্যেই তিনি নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নজরুল ইসলামের তেমনি বিদ্রোহী। এখন থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর একটি মিশন আছে— অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে গান গাওয়া। বিদ্রোহীর পরে ধূমকেতু রচিত হলো–এই কবিতা কাব্য হিসাবে নিকৃষ্টতর হলেও বিদ্রোহের মিশন এতেই ভালো ফুটেছে। কিন্তু বিদ্রোহ জীবনের একটা ঋণাত্মক দিক, আর ঋণাত্মক দিক দিয়ে মানুষ বেশীদূর এগুতে পারে না, ধনাত্মক দিক দরকার। কবির সেই ধনাত্মক দিক হলো সর্বহারার সাম্য কবিতাসমূহে। এগুলিতে যুক্তি ও শিল্পের ত্রুটি থাকলেও কবির সাম্যবাদস্পৃহা জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে উঠেছে।

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন : এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর রচনায় বাঁশরীরই জয় হয়েছে। গানেই তাঁর প্রতিভা খুলেছে ভালো। যদি বলা হয়, বাঙ্গালিত্বেরই জয় হয়েছে তো অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার উক্তি :

খ. ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত যে বিভিন্ন আন্দোলন গিয়েছে সে-সব আন্দোলনে চারণ কবির কাজ করেছিলেন নজরুল ইসলাম। স্বাধীনতা ও সাম্যের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়ে রেখেছিলেন তাঁর অনলবর্ষী কবিতা ও গানের সহায়তায়। বহু দেশসেবক তাঁর গান মুখে করে ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করেছে। নজরুল ইসলামের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি যতখানি প্রকাশ করেছেন, আর কেউ ততখানি প্রকাশ করেন নি।

শিল্পের জন্য বুদ্ধির দরকার। নজরুল ইসলাম বুদ্ধির চর্চা কম করেছিলেন বলে তাঁর রচনায় শিল্পগত ত্রুটি সুস্পষ্ট। আবেগের স্রোতে তিনি ভেসেছেন, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি, অথবা চান নি। প্রত্যেক শিল্পীকে ছাঁটাই বাছাই করতে হয়; নজরুল ইসলামের রচনায় ছাঁটাই বাছাই কম। বুদ্ধিকে তিনি দস্তুর মতো ভয় করতেন। পবিত্র গাঙ্গুলী একবার নজরুল ইসলামকে প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের বই উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেগুলি আমাকে দিয়ে বললেন : এ সব দাঁতভাঙ্গা বই আমার জন্য নয়, আপনি নিয়ে যান। কবি আবুল হুসেন তাঁর নববসন্ত নজরুলকে

উপহার দিয়েছিলেন। তিনি পড়ে বললেন : একি তরুণের লেখা? এতে বুদ্ধি আছে, কিন্তু তারুণ্যের আবেগ কই, বুদ্ধি ভাসিয়ে নেওয়া উচ্ছ্বাস কই ?

মুসলিম সমাজে রিনেসাঁসের উৎপত্তি হয় নজরুল ইসলাম থেকে। রিনেসাঁসের আরেক নাম দেওয়া যেতে পারে জীবনবাদ, অর্থাৎ জীবনকে শাস্ত্রশাসনের ঊর্ধ্বে তুলে দেখা। নজরুল ইসলাম তাই করেছেন। রিনেসাঁসের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন রিনেসাঁসের দুটো দিক antinomianism বা প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা, আর ঐতিহ্যে-ঐতিহ্যে মিলন সাধনা। Paganism আর খ্রীষ্টান ধর্মে মিল রয়েছে রিনেসাঁসযুগের সাধকগণ তাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। নজরুল ইসলামেও এই দুটো জিনিস বড় হয়ে উঠেছে। তিনি প্রচলিত নীতির চেয়ে জীবনের উচ্ছলতাকে বড় জেনেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যের মিলন সাধনার চেষ্টা একমাত্র কবি নজরুল ইসলামই করেছিলেন। এটা অনেকের কাছেই ভালো মনে হয় নি। কিন্তু রিনেসাঁসের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা তাতে আপত্তি করতে পারেন না। তবে রিনেসাঁসের ইতিহাস জানিয়ের সংখ্যা নগণ্য, যদিও অনেকে রিনেসাঁসের কথা আওড়ান। তাঁরা জানেন না, তাঁরা যা চান তা রিনেসাঁস নয়, অপর বস্তু।

চিন্তাশীল লেখক আবু সায়ীদ আইয়ুব নজরুল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন : সাহিত্যের দুটো কাজ–expression of life জীবনের প্রকাশ, আর criticism of life জীবনের সমালোচনা— নজরুলের রচনায় প্রথমটির সদভাব থাকলেও, দ্বিতীয়টির অসদভাব। –কথাটি মোটের উপর মেনে নেওয়া যেতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন : কবি তিনি নিঃসন্দেহে–অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ-দীপ্তি–কিন্তু কবি তিনি যত বড় তার চাইতে অনেক বড় তিনি যুগমানব। এটিও সমর্থনযোগ্য উক্তি।

লাইব্রেরী

আমাদের হাতে আর যা কিছুর অভাব থাক, সময়ের অভাব নেই। কিন্তু সেই সময়কে উপযুক্ত ব্যবহারে লাগাবার মতো কাজের অভাব যথেষ্ট। অফিস-আদালত থেকে ফিরে এসে হুঁকো টানতে টানতে আমরা সাধারণতঃ যে ধরনের আলাপে মশগুল হয়ে যাই, তাকে কিছুতেই সুরুচির পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে তখন অন্তরের যে বিষবাষ্প (ঘৃণা, বিদ্বেষ ও নোংরামিপূর্ণ) প্রকাশিত হতে থাকে, সুরুচিসম্পন্ন শ্রোতার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা সত্যই হানিকর।

তবু আফিস-আদালতগামীদের অবস্থা কিছুটা ভালো। ভালো কাজ করে না হোক, মন্দ কাজ অপেক্ষাকৃত কম করে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দেয় বলে তারা নোংরামি থেকে কিছুটা মুক্ত, কিন্তু যাদের আফিস-আদালতের বালাই নেই–যারা ঘরে বসে কাল কাটায়–তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। অলস তাস-পাশায় রত হয়ে, পাড়া-প্রতিবেশীর কলঙ্কপূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী কয়ে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে দেয় বলে তাদের চিত্ত বিকৃত হয়ে পড়ে, বুদ্ধি সৃজনীশক্তিহীন অসাড় হয়ে যায়। অবশ্য পরনিন্দা পরচর্চাই যে তাদের আলাপের একমাত্র বিষয় তা নয়; অধুনা রাজনীতিও তাদের আলাপের বিষয়বস্তু হয়েছে। সস্তা স্বদেশ অথবা সম্প্রদায়প্রেমের দখল তাদের চিত্তের উপরও কম নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই প্রেমে প্রেমের চাইতে বিদ্বেষের ভাগই বেশী। প্রেমের আবরণে বিদ্বেষকে ঢেকে ভালোমানুষ সাজবার সুযোগ লাভ করে বলে ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতি তাদের কাছে পরমপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো উচ্চ হিন্দু-কর্মচারী কোনো মুসলমান কেরানিকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছে, কোনো মুসলমান কর্মচারী উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুকে না দিয়ে অর্ধশিক্ষিত মুসলমানকে কাজ দিয়েছে, ইত্যাকার বিদ্বেষসঞ্জাত ও ঘৃণাপ্রকাশক আলোচনায় তাদের সময় নষ্ট হয় বলে তারা চিত্তের প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ বুদ্ধি বিকৃত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ-ধরনের অন্যায় যে না হয় তা নয়। তবে অন্যায়কে বাড়িয়ে দেখবার প্রবণতা এবং তা নিয়ে মাতামাতি করার স্পৃহা জীবনে গ্লানি আনয়ন করে বলে তা থেকে যতখানি সম্ভব দূরে থাকাই ভালো। বাস্তবিক ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ আলোচনা আজ আমাদের এতখানি পেয়ে বসেছে যে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, নির্দোষ হাস্যপরিহাস ও গাল-গল্পের সময়টুকুও আজ আমাদের নেই। প্রেমের সুমিষ্ট পানীয়ের চাইতে ঘৃণাবিদ্বেষের ধেনো মদই আজ আমাদের প্রিয়।

উদ্বৃত্ত সময়টুকু বিশ্রী আলাপে অতিবাহিত না করে উপযুক্ত কাজে লাগালে জীবনে সোনা ফলত–সময়ের সুব্যবহার করে আমরা জীবনকে মহান করতে ও ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হতুম। উপযুক্ত কাজের অভাবেই আমরা নিষ্প্রভ ও শ্রীহীন থেকে যাচ্ছি–আমাদের আত্মা নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজের শক্তিকে উপভোগ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

জানি, এখানে প্রশ্ন হবে : কী সেই কাজ যা করলে জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করা যায়; যার দৌলতে জগৎ ও জীবন অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে?–উত্তরে বলা যেতে পারে : পীড়িতের সেবা, উৎপীড়িতের পক্ষসমর্থন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, স্বদেশের স্বাধীনতা-অর্জন ইত্যাদি কত কিছু কাজই তো রয়েছে; কিন্তু সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ বোধ হয় আত্মোদ্ধার–আত্মপ্রেম যেজন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। আত্মপ্রেম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা নয়।–আত্মাকে অটুট রাখা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করে বিকশিত করার চেষ্টা। আত্মপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম বা সম্প্রদায়প্রেমের কোনো বিরোধ নেই। বরং তাদের সীমানির্দেশকারী হিসাবে তার দান মহামূল্য। অনেক সময় উক্ত প্রেমদ্বয় ব্যক্তির মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে exploited হতে দিতে পারে না। ও-ধারণাই তার অসহ্য। আত্মপ্রেমিক কিছুতেই নিজেকে exploit করতে চায় না। আত্মপ্রেমিক অর্থাৎ আত্মাকে নিষ্কলুষ ও আবর্জনামুক্ত রাখতে উৎসুক ব্যক্তিদের অভাবে পৃথিবী আজ কলুষিত। রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির প্রভাবে মূর্চ্ছাগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় পৃথিবীকে বাঁচাবার জিয়ন-কাঠি কেবল ধর্মবুদ্ধিরই হাতে। আত্মপ্রেমিকরা ধর্মবুদ্ধির সাধক বলে তাঁরাই নিতে পারেন তার জাগরণের ভার।

আত্মপ্রেমের ব্যাপারে আমাদের সব চাইতে বেশী সহায়তা করতে পারে পুস্তক। কারণ, পুস্তক যাঁরা রচনা করেন তাঁরাও আত্মপ্রেমিক–সাময়িক উত্তেজনা ও বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে রাখতে চান আত্মার অম্লান শিখাটি, হট্টগোলের মাঝেও শুনতে চান অন্তরের শাশ্বত বাণী। তাই তাঁরা মানুষের পরম নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। তাঁদের স্থলে তাঁদের রচনাকে গ্রহণ করে আমরা প্রভূত লাভবান হতে পারি। কেননা, কোনো ভালো গ্রন্থ পাঠ করা আর সেই গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে আলাপ করা এক কথা।

২

পুস্তকের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার বলা হয়। লাইব্রেরী কখন, কোথায় এবং কার দ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐতিহাসিকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করা ব্যতীত সে-সম্বন্ধে আলোচনার অন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে লাইব্রেরী সৃষ্টির কারণ কি তথা লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা কি, সে-সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা না করলে অন্যায় হবে।

সর্বপ্রকার জ্ঞানকে একত্রিত করে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরীর সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পরিদর্শিতা লাভ করে। আবার যে-ব্যক্তি যে-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ের একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরীর সৃষ্টি।

লাইব্রেরী তিন প্রকার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যক্তি-মনের খেয়াল মতো গড়ে ওঠে–তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে-ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট–খেয়াল মতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে,

কথা-সাহিত্যপ্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারি, শেল্‌ফ— সবকিছু। কারো বাধা দেবার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবী নেই, উপদেশ দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরী যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরী তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। ওখানে যেমন একের রুচির উপর বহুর অত্যাচার অশোভন, এখানেও তেমনি বহুর রুচির উপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশজনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরী সাজাতে হয়। তবে কতকগুলি পুস্তক পারিবারিক পাঠাগারে না থাকলেই নয়। যেমন : গৃহচিকিৎসা, শিশুপালন, প্রসূতিশুশ্রূষা, যৌনবিজ্ঞান, পশুপালন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরী সম্বন্ধে বেশী আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে বলে মনে হয় না। কেননা, সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জিমাফিক তা গড়ে ওঠে বলে সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। তবে ধনী ব্যক্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরিবারের কাছে আমরা এই বলে অনুরোধ জানাতে পারি যে, গ্রন্থাগার যখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে একটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এনে দিতে সক্ষম, তখন লাইব্রেরীসৃজনে তাঁরা যত তৎপর হন, ততই মঙ্গল। লাইব্রেরীসম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ্য বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া, লাইব্রেরী বা শ্রেণীবদ্ধ পুস্তকসংগ্রহ ধনী ব্যক্তির গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। এই ধরনের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরীসৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক-কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে, গরীব সাহিত্যিকসম্প্রদায় তাতে বেশ একটু উৎসাহ লাভ করবে, আর তাঁদের নিজের লাভ হবে এই যে, অনবরত পুস্তকগুলি হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে-সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরীসৃজনের দরুন তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাঁদের পুত্র-কন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হবার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরী থাকার দরুনই পরিণত বয়সে তাঁরা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্যসমঝদার হয়ে উঠবেন। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড় বড় সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরী থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

৩

এখন সাধারণ পাঠাগারের কথা। সাধারণ পাঠাগার গণতন্ত্রের মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কি বলবেন জানিনে, যে জ্ঞানার্জন স্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণ অপেক্ষাকৃত হালের ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু সাধারণের জ্ঞানার্জন স্পৃহা সহজে মেটান সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে কী রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পনের টাকার কাপড়ে আমাদের বৎসরের সংস্থান হয়ে যায়; পনের টাকার বই কিন্তু কিছুই নয়;—পনের দিনের মধ্যেই তা পড়ে শেষ করা যায়। সুতরাং পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়

নীতির প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ-ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরী বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরী ব্যক্তির দানও হাতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে তাকে সাধারণ পাঠাগার না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না। কারণ স্ফীতোদর গণদেবতার পেটে (আমাদের দেশের গল্পের কথা মনে করুন) বিশিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে অনেক বাজে জিনিসেরও স্থান হবার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের ক্ষুধা যার মিটাতে হয়, বৈশিষ্ট্যের দাবী করলে তার চলে না। আর বৈশিষ্ট্যের দাবী যার নেই, নির্বাচনের চিন্তার বালাইও তার নেই। সাধারণ লাইব্রেরীতে সর্বপ্রকার পুস্তক সাদরে গৃহীত হওয়া উচিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, মনোসমীক্ষণ, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি–সমস্ত-কিছুর সমাবেশ সাধারণ পাঠাগারে হওয়া উচিত। (এই জন্য সাধারণ পাঠাগারে কর্মকর্তা বা লাইব্রেরীয়ানের উপভোগ ক্ষমতা বিচিত্র হওয়া দরকার। নইলে তার রুচির একঘেয়েমি পাঠকের রুচির উপর জবরদস্তি করতে পারে।) কিন্তু কথাসাহিত্য, কাব্য ও রসরচনায় আধিক্য যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, মানুষের হৃদয়-দুয়ারের চাবি তাদের হাতে। অবশ্য এমন এক-ধরনের লোক আছেন, যাঁরা সাহিত্যের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন–চরিত্রহানির সম্ভাবনা দেখে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হন। কিন্তু যতদূর মনে হয়, এই কৃপার পাত্রদের কথা আমলে না আনাই ভালো। কারণ, যাঁরা সর্বব্যাপারে বিকৃতিকে বড় করে দেখেন, তাঁরা মানসিক দুর্বলতার পরিচয় দেন, তাঁদের কথায় মনোযোগ দেওয়া আর দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা। যাঁরা উপন্যাসের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাঁরা নিজেরাও যে উপন্যাস কম পড়েন, তা নয়। দেখা গেছে, এইমাত্র উপন্যাস থেকে মুখ তুলে এসেছেন এমন ব্যক্তি কথাসাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে প্রস্তুত। তার কারণ এই যে, মিথ্যা হলেও ধরতাই বুলি আওড়াতে আমরা ভালোবাসি, আর মনের সহজ প্রবণতাকে ভীরুর মতো লুকিয়ে রাখা আমাদের স্বভাব। বলাবাহুল্য, তাঁদের উপদেশানুযায়ী লাইব্রেরীকে উপন্যাসবর্জিত করলে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের বহর দেখে তার তারিফ করবার লোকের অভাব না হলেও, সত্যিকার পাঠকের সংখ্যা প্রায় শূন্যে এসে ঠেকবে।

৪

এখানে কথাসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ কথাসাহিত্য সাধারণের প্রিয়পাঠ্য বলে তা reading habit বা পঠন-অভ্যাস সৃষ্টি করতে সক্ষম ; দ্বিতীয়তঃ cult of sympathy বা সহানুভূতির কর্ষণায় সহায়তা করতে পারগ; তৃতীয়তঃ বাস্তববোধ বা অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়; চতুর্থতঃ কথাসাহিত্য cosmopolitan culture বা সার্বভৌম সংস্কৃতির বাহন।

প্রথম দিকটার বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, কথাসাহিত্য মানবজীবনের বিষাদ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের কাহিনী বলে সহজেই মানুষের হৃদয়াকর্ষক। কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তাই সন্দেহ প্রকাশের অবসর থাকে না।

এখন সহানুভূতির কথা। সহানুভূতির ভিত্তিভূমি দুর্বলতা ও অসহায়তাবোধ। উপন্যাস যত প্রচুর পরিমাণে তা সরবরাহ করতে পারে, আর কিছুই ততটা করতে পারে কি-না সন্দেহ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে : উপন্যাস যেখান থেকে কাঁচামাল সরবরাহ করে সেই বাস্তবের পানে তাকালেই তো পারা যায়। পারা যায় বটে ; কিন্তু বাস্তবকে দেখবার ক্ষমতা সকলের নেই, আর কাঁচামাল থেকে সাধারণতঃ যে প্রকার দুর্গন্ধ বের হয়, সকলের পক্ষে তা সহনীয় নয়; ঔপন্যাসিকরা পাকা করে দিলে তবে তা আমরা সহ্য করতে পারি। মানুষের চরিত্রের উপর তার পরিবেষ্টন, নিয়মিত নিষ্ঠুর কারসাজি, রক্তের-ধারা ও কুশিক্ষা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, উপন্যাস-রসিক ব্যতীত অন্যের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তাই সাধারণ লোক যেখানে বড়জোর বিচারসম্পন্ন হতে পারে, বিবেচনাশীল হতে পারে না, কথাসাহিত্য সমঝদারের পক্ষে সেখানে বিবেচনাশীল হওয়া সহজ। কারণ, বিবেচনাশীলতা যে-দুর্বল-বোধ ও সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল, সাধারণের চাইতে কথা-সাহিত্যরসিকের তা বেশী থাকার সম্ভাবনা। অবশ্য উপন্যাসার্জিত সহানুভূতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সরলভাবেই সন্দিহান হতে পারে। কিন্তু প্রথমে ধার করা জিনিস থাকলেও, পরে তা চিত্তের স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় বলে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করাই ভালো।

কথাসাহিত্য যে শুধু মানুষের প্রতি সহানুভূতি সৃজনে পটু তা নয়; মূক প্রকৃতি ও পশুজগতের প্রতি দরদ সৃজনের ক্ষমতাও তার আয়ত্তাধীন। কালীদাসের শকুন্তলা (শকুন্তলার নাম উল্লেখ করা গেল এই জন্য যে, নাটকীয় ভঙ্গী বাদ দিলে তার আর যা বাকী থাকে, তাকে স্বচ্ছন্দে কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।) টমাস মানের ব্যাশান (Bashan) আর আমাদের আধুনিক লেখক জগত মিত্রের "কুড়ি বিড়ালীর জীবন কথা"র পাঠকমাত্রেই কথাসাহিত্যের এই অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। অবশ্য এই ক্ষমতা কেবল কথাসাহিত্যের একচেটে নয়, কাব্যেরও রয়েছে। তবে কাব্য সম্বন্ধে অল্প পরেই আলোচনা হবে বলে এখন সে-সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রায়োজন।

কিন্তু এখানে কেউ যদি সরলান্তঃকরণে সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, তবে তাঁকে কী উত্তর দেওয়া যায়? 'দরদে-দিল্ কে লিয়ে পয়দা কিয়া এন্‌ছানকো,' সহানুভূতি ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্বের ইজ্জত রক্ষা হয় না, ইত্যাদি বড় বড় কথা না আওড়িয়ে যদি সোজা বলা হয়, সহানুভূতি ব্যতীত জীবনের সত্যিকার উপভোগ সম্ভব নয়, তা হলেই যেন যথার্থ জবাব দেওয়া হয়। কারণ, তা হলেই স্বার্থের গন্ধ পেয়ে মানুষ তাকে সহজে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত হয়। নইলে প্রায়ই দেখা যায়, আওড়াতে ভালোবাসলেও বড় বড় কথাকে মনের গোপনে ভয় করা যেন মানুষের স্বভাব। তাই দরদের অভাবে মানুষ পশু হয়ে যাবে বলে নয়; পরিবেষ্টন অর্থশূন্য, অতএব নিরানন্দ হয়ে যাবে বলেই সহানুভূতিচর্চার প্রয়োজন। সহানুভূতির সোনার কাঠির স্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে উঠে মানুষকে আনন্দবার্তা জ্ঞাপন করে। সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ের প্রেম তার মতকে ডিঙিয়ে চলে বলে নোংরামি ও কুশ্রীতাপূর্ণ সংসার তার অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষের পরিবর্তে কারুণ্যের সৃষ্টি করে। তাই বাঁচা তার পক্ষে এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার না হয়ে আনন্দের ব্যাপার। সহানুভূতির অভাবে মানুষ মানুষের কড়া সমালোচক হয়ে ওঠে, আর কড়া সমালোচনা পরিণামে উন্নাসিকতায় পরিণত হয়। উন্নাসিক হওয়া আর আকাশ আলোর মতো সহজ জীবনানন্দকে বিদায় অভিনন্দন জানান একই কথা। অবশ্য সহানুভূতি যে ঘৃণা বিদ্বেষ দূর ক'রে বৈকল্য এনে দিতে সক্ষম তা নয়, তবে ঘৃণা-বিদ্বেষ যাতে একচ্ছত্র রাজা হয়ে জীবনের উপর প্রভুত্ব করতে না পারে, সেদিকে যথেষ্ট সহায়তা করে।

যে কারণে কথাসাহিত্যকে সহানুভূতিসৃজনের সহায়ক বলা হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই বাস্তববোধ বা অভিজ্ঞতা-অর্জনের সহায়ক বলা যায়। কেননা, যে ঘটনাবস্তু থেকে আমাদের অন্তরে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই ঘটনাবস্তুই আমাদের অভিজ্ঞতা বা বাস্তববোধ প্রদানের ক্ষমতা রাখে। (কথা-রস থেকে সহানুভূতি আর কথা-বস্তু থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।) পৃথিবীতে অনেক কিছু আমরা দেখি, কিন্তু তা মাত্র চর্মচক্ষু দিয়ে দেখি বলে তাদের সম্যক উপলব্ধি আমাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। উপন্যাস বুঝতে মনশ্চক্ষুর প্রয়োজন হয়ে বলে তা ঘটনার মর্মোদঘাটনে পটু, অতএব মানবচরিত্রপ্রবেশের কুঞ্জিকা রূপে উপন্যাসের সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজন। উপন্যাস-রসিকের যতখানি মনস্তত্ত্বজ্ঞান থাকার সম্ভাবনা, সাধারণের ততখানি নেই। তাই সাধারণতঃ কখন, কোন্ অবস্থায় মানুষ কোন্ কাজ করে, উপন্যাসপাঠক সে-সম্বন্ধে যে-রকম অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সক্ষম, সাধারণের পক্ষে সে-রকম অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মুশকিল। এই বাস্তববোধ বা অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে মানুষ তার জীবনকে নানা দিক দিয়ে লাভবান করে তুলতে পারে। এই লাভ যে শুধু শত্রুর অভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষায় পরিলক্ষিত হয়, তা নয়, নিজের শত্রুতা থেকে নিজেকে রক্ষার কাজেও তা লক্ষণযোগ্য। অর্থাৎ বাস্তববোধজনিত মনস্তত্ত্বজ্ঞান শুধু অপরের মনের পাপ সম্বন্ধেই আমাদের সচেতন করে না, নিজের মনের গোপন পাপসম্বন্ধেও সাবধান করে। যেমন ঘৃণা-বিদ্বেষ। ঘৃণা-বিদ্বেষের মারাত্মকতা সত্যিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সাধারণ লোকের পক্ষে তত সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। (বলা হয়েছে উপন্যাস মানুষকে অভিজ্ঞতা দান করে। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, উপন্যাস যা দেখে শেখে, বাস্তবে তা ঠেকে শেখা যায়। তবে ঠেকে শেখার চাইতে দেখে শেখা বুদ্ধিমানের কাজ বলে উপন্যাস পাঠের প্রয়োজন।)

তারপর cosmopolitan culture বা সার্বভৌম সংস্কৃতির কথা। প্রথমতঃ কথা-সাহিত্য সহানুভূতি ও দৃষ্টির প্রসারতা দান ক'রে মানুষকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করে বলে, দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসে দর্শন-বিজ্ঞান সমস্ত কিছুর সমাবেশ হয় বলে কথাসাহিত্যকে সার্বভৌম সংস্কৃতির বাহন বলা হয়ে থাকে। অধুনা উপন্যাস আর রস-সাহিত্য নয়, জ্ঞান-সাহিত্যও বটে। উপন্যাসের মধ্যস্থতায় মানুষের হৃদয়ে সহজে সাড়া জাগাতে পারা যায় বলে তাতে পৃথিবীর বড় বড় সমস্যাগুলি আলোচিত হচ্ছে। টমাস মান ও H. G. Wells-এর উপন্যাসাবলী আর শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন কী করে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে উপন্যাস মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখে। তাই, আধুনিক উপন্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে দর্শন-বিজ্ঞানের নব নব তত্ত্বের প্রয়োজন হয় বলে উপন্যাস serious study-র দিকেও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৫

উপন্যাসের পরেই কবিতার কথা মনে পড়ে। কারণ কবিতাও উপন্যাসের মতো বহু নিন্দিত অথচ বহু প্রয়োজনীয়। কবিতার প্রয়োজনীয়তা এইখানে যে, তা মানুষকে মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের মতো কবিতাও সহানুভূতি সৃজনে সক্ষম। কবিতা পাঠে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন হই, মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করি, আর বিশ্বের প্রাণপ্রাচুর্যে নিজের চিত্তকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করি। কবিতা পাঠের সঙ্গে জলস্থল, অন্তরীক্ষ সমস্ত কিছু আমাদের চেতনায় সজীব হয়ে ওঠে, আর আমরা আনন্দে নৃত্য করে উঠি। এই সজীব হয়ে ওঠার আনন্দ যে কি, কবি ও কবিতা পাঠক ব্যতীত অন্যে তা বুঝতে

অপরাগ। সত্যি বলতে কি, কবিতা ব্যতীত জীবনকে ভোগ করা গেলেও, উপভোগ করা যায় না, আর কা ব্যর অভাবে জীবনের অবসর মুহূর্তগুলি নিরানন্দ ও অর্থহীন। অথচ এমন যে কবিতা এর প্রতিও অধুনা আমরা বীতশ্রদ্ধ ও অনুরাগহীন। কেন এমন হল? বৈশ্যযুগের প্রভাবে অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই না আমাদের এই দুর্দশা। অর্থ ও সম্মান সৃষ্টির জাঁতাকলে নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দিচ্ছি বলেই না আমরা দিন দিন সৌন্দর্যবোধহীন ফিলিস্টাইনে পরিণত হচ্ছি।

জানি, এখানে প্রশ্ন হবে : কবিতা বুঝবার ক্ষমতা যখন সকলের নেই, স্বল্প কতিপয়ের আছে, তখন সাধারণ পাঠাগারের আলোচনায় সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? প্রশ্নটা সত্যই ধাঁধা লাগিয়ে দেবার মতো। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে বুঝাতে পারা যাবে, তার ভিত্তিমূল খুব দৃঢ় নয়। কবিতা লিখবার ক্ষমতা সকলের না থাকলেও বুঝবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। নইলে বিদ্যালয়ে কবিতাকে বিশেষ পাঠ্য না করে অবশ্যপাঠ্য করবার হেতু কি? শুধু কি গদ্য আর ভাবার্থ করার জন্যই তা করা হয়েছে? আর কবিতা ক্ষমতার অর্থ যখন সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতা, তখন সাধারণের কবিত্ববোধের অভাব, এ-ধরনের উক্তি করা আর তাদের সৌন্দর্যবোধহীন বলে গালি দেওয়া একই কথা নয় কি? সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতা কমবেশি সকলেরই আছে। তবে উপযুক্ত ট্রেনিং বা শিক্ষার অভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বর্ধিত না হয়ে, তা অনেক সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ জিনিস অবহেলা সয়েও টিকে থাকতে পারে, কিন্তু মূল্যবান জিনিসের জন্য যত্নের প্রয়োজন। কাব্যবোধ তথা সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য 'ট্রেনিং' বা শিক্ষার প্রয়োজন। কাব্যের সে উপযুক্ততা আছে বলে তাকে বিদ্যালয়ে সৌন্দর্যবোধের 'ট্রেনার' হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

কাব্য মানুষকে কামলোক থেকে রূপলোকে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে। তাই কাব্যচর্চায় মানুষের অবনতি না হয়ে উন্নতি হবারই কথা। কাব্যচর্চার আরেকটা লাভ এই যে, তা মানুষকে ambition বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার অত্যাচার থেকে মুক্ত করে aspiration বা উন্নত আকাঙ্ক্ষার অনুরক্ত করে। অর্থাৎ আমি বড় হব, ধনী হব, প্রভু হব, এই ধরনের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আমি ধ্যানী হব, সুন্দর হব, প্রেমিক হব ইত্যকার আকাঙ্ক্ষায় কাব্য-প্রেমিকের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে। কবি ও কাব্য-প্রেমিকরা যে সাধারণতঃ কাড়াকাড়ির মেলায় যেতে অনিচ্ছুক, তার হেতুও এইখানে যে, জীবনের গভীরতম স্বাদ লাভ করেছেন বলে চারদিকে ঔদাস্যের বেড়া দিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করেন। তাই জীবনে কাব্যের প্রাপ্যস্থানটি না দিলে জীবনকেই বিড়ম্বিত হতে হয়, কাব্যকে নয়।

৬

লাইব্রেরী-সংক্রান্ত আলোচনায় কথাসাহিত্য ও কাব্যসম্বন্ধেও যে এত কথা বলা হলো, তার হেতু এই যে, একশ্রেণীর লোক এদের বিরুদ্ধে সংস্কার পোষণ করে। অথচ এদের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের অতীত। কথাসাহিত্য ও কাব্য ব্যতীত অন্যান্য ধরনের পুস্তকও সাধারণ লাইব্রেরীতে থাকা দরকার। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের ক্ষুধা মিটাবার ক্ষমতা না থাকলে সাধারণ লাইব্রেরীর পূর্ণতা সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার স্থানও সাধারণ লাইব্রেরীতে থাকা সঙ্গত। তবে গ্রন্থাগার যাতে দৈনিক পত্রিকা-পাঠের আড্ডায় পরিণত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা কর্তব্য। কারণ দৈনিক পত্রিকা, বিশেষ করে, আমাদের দেশে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা সাধারণতঃ যে ধরনের নোংরামি ও রুচিহীনতার পরিচয় দেয়, তা মানসিক স্বাস্থ্যের নিতান্তই

হানিকর। তা ছাড়া দৈনিক পত্রিকা যখন আজকাল ঘরে ঘরে প্রচারিত, আর দৈনিক পত্রিকা পাঠ যখন চা-খাওয়ার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে, তখন লাইব্রেরীতে তার ছড়াছড়ি না হওয়াই ভালো। জ্ঞানার্জনের জন্য যে মুক্ত পরিমণ্ডল প্রয়োজন, দৈনিক পত্রিকা তা বিষাক্ত আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ করে। তাই লাইব্রেরীতে দৈনিক পত্রিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব অশোভন। (আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকা-সম্পাদকগণ হয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত, নয় দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই দুটি অপবাদের একটি তাদের নিতেই হবে। হয়, কড়া ও খোঁচানোর কথা যে মানুষের, বিশেষ করে ভিন্নসম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষের মনে সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সক্ষম, এ-ধারণা তাঁদের নেই, নয়, থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই তাঁরা চ্যাংড়ামি করেন। এই চ্যাংড়ামি যদি আর্টের পর্যায়ভুক্ত হ'ত তো কথাই ছিল না, কিন্তু তা হয় নিতান্ত বিশ্রী রকমে ভালগার– বেহায়াপনা ও পরশ্রীকাতরতা তার ভিতরের দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে ব'লে।)

বলাবাহুল্য, লাইব্রেরী রাজনৈতিক মাতলামির স্থান নয়, মন্দির। মন্দিরে পূতচরিত্র ও নিষ্কলুষচিত্ত হয়ে প্রবেশ না করলে যেমন সত্যিকার কল্যাণ লাভ হয় না, দেবতা মূক ও বধির থেকে যান, গ্রন্থাগারেও তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধ হয়ে প্রবেশ না করলে গ্রন্থের মূক প্রচেতবৃন্দ নির্বাক থেকে যান। এইজন্য চিত্তহানিকর সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা লাইব্রেরীতে স্থানলাভের অনুপযুক্ত। (লাইব্রেরীর সঙ্গে রাজনীতির বিরোধ অবহেলিত হবার মতো নয়। লাইব্রেরী তথা পুস্তক যেখানে বলে : সুন্দর হও, উদার হও, বিবেচনাশীল হও, অপরের সমালোচনা করার আগে নিজের সমালোচনা কর; রাজনীতি সেখানে বলে : চুপ, চুঁপ, ওকথা বলো না ; সুন্দর হওয়া মানে দুর্বল হওয়া, উদার হওয়া মানে নিজের স্বার্থ নষ্ট করা, বিবেচনাশীল হওয়া মানে অপরকে সুবিধা দেওয়া, আর নিজের সমালোচনা করা মানে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া। অতএব, ও-পথ মাড়ান আর জাতির সর্বনাশসাধন এক কথা। ও-সব বড় বড় কথা জাতির জন্য নয়, ব্যক্তির জন্য। আর ব্যক্তির জন্য যা ভালো, জাতির জন্য তা মন্দ, ব্যক্তির জন্য যা পুণ্য, জাতির জন্য তা পাপ। ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাকথা বলা অন্যায়, জাতিগতভাবে না বলা অন্যায়। ব্যক্তিগতভাবে সঙ্কীর্ণতা পোষণ করা পাপ, জাতিগতভাবে পোষণ না করা পাপ। ব্যক্তিগতভাবে চুরি করা শাস্তির যোগ্য অপরাধ, জাতিগতভাবে পুরস্কৃত হবার মতো কাজ–স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রহমানুর রহিম আল্লাহ অথবা যেহোভা সেজন্য পুরস্কার দিতে উৎসুক–তাঁর নির্বাচিত জাতির মঙ্গলের জন্য তা করা হয়েছে বলে। তাই রাজনীতি ও লাইব্রেরীর বৈরিতা যখন সহজে দূরীভূত হবার মতো নয়, তখন লাইব্রেরীকে রাজনীতির অত্যাচার থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখাই ভালো।)

কিন্তু বাস্তব রাজনীতিচর্চার স্থান না হলেও লাইব্রেরী রাজনৈতিক চিন্তাচর্চার স্থান বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক দেশহিতকামীর কর্তব্য। উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ করে পাঠাগার সেদিকে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। তা হলে অচিরেই আমাদের চিন্তা হেঁয়ালিমুক্ত ও দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে এবং আমরা হুজুগপ্রিয় না হয়ে সত্যিকার দেশহিতকর কাজের উপযুক্ত হব।

৭

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো।

কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তক লেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সঙ্কীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন না হওয়াই ভালো। দেশী বলে মোটা কাপড় ও মোটা নুন গ্রহণ করা যায়; কিন্তু তাই বলে যে মোটা চিন্তার পুস্তকও পড়তে হবে, এমন কথা কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। তবে protection to the infant industry বা শিশুশিল্পের সংরক্ষণ-নীতি অনুযায়ী যদি কোনো নব-সাহিত্যব্রতী জাতি বা সম্প্রদায় তাদের নিজের রচিত পুস্তকের বেশী কদর করে, তবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায় হবে। কারণ, কদর করা অর্থ এখানে valuation বা মূল্যনির্ধারণ নয়, সহানুভূতি দান ও উৎসাহবর্ধন।

কিন্তু নব-সাহিত্যব্রতী সম্প্রদায়ের মনে রাখা উচিত, যে-সব লেখক বার বার জুজুর ভয় দেখিয়ে জাতির দুর্বলতা ও অসহায়তা লালন করে, তাদের চাইতে যাঁরা সাহস ও আশার বাণী শোনান, তাঁরাই তার বন্ধু। জাতির সহানুভূতি তাঁদেরই প্রাপ্য। কারণ, সৃষ্টির জন্য কিছুটা আত্মভোলা হওয়া প্রয়োজন; নইলে সৃষ্টি-ব্যাপারের জন্য সবচাইতে যে বড় জিনিস 'তন্ময়তা' তা আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। যে-লেখকসম্প্রদায় বার বার জাতির কানে শত্রুর পদধ্বনি শোনায়, তারা বড়জোর জাতিকে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রাখতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকার্যের প্রেরণাদান তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। তা এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে, possessive instinct-এর লেখকদের চাইতে creative instinct-এর লেখকরাই জাতির সত্যিকার কল্যাণকামী। অতএব, তাঁদের কথায় মনোযোগ দেওয়া জাতির পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

৮

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ-প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরার্থ-বৃদ্ধি। এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা, ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপর দিকে সাহিত্য শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। এক দিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। এক দিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে-জাতি কখনো উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। কোনোপ্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভবসৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফুটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরী এক অমূল্য অবদান। তাই যথার্থ কল্যাণকামী জাতীয় কর্মীদের পক্ষে লাইব্রেরী সৃজনের ব্যাপারে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, তা জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। লাইব্রেরীর সংখ্যার দিকে নজর রেখে, জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাপ করলে অন্যায় হয় না। কারণ উন্নতি মানে মনের উন্নতি, পুস্তক মনের উন্নতির সহায়, আর লাইব্রেরী পুস্তকের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব বলা যেতে পারে, লাইব্রেরী সৃষ্টির ব্যাপারে যে জাতি যত অগ্রসর, জাতীয় কল্যাণ সৃষ্টির কাজে সে-জাতি তত অগ্রগামী। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে লাইব্রেরী-আন্দোলন সমান তালে না চললে জাতীয় আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয়। কারণ, বুদ্ধির জাগরণ ভিন্ন

জাতীয়-আন্দোলন, হুজুগপ্রিয়তাও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

লাইব্রেরীর শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, তা আমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা না করতে পারলেও সভ্যতার আদর্শটি অক্ষুণ্ন রেখে আমাদের আলোকাভিসারী করে তুলতে পারে। কারণ, সভ্যতার আদর্শ, তথা একটি সনেট যে একটি roasted egg-এর চেয়ে বেশী মূল্যবান, এই বোধ পাঠাগারের দৌলতে যতটা পাওয়া যায়, অন্য কিছুর দৌলতে ততটা পাওয়া দুষ্কর। এই জন্যই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সহায় বলে লাইব্রেরীর আশ্রয়গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ

মরহুম কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের "আবদুল্লাহ" উপন্যাসখানা সম্প্রতি ঢাকা ইন্টারের পাঠ্য হয়েছে আর তাতে কিছু মুসলমানী শব্দের মিশ্রণ আছে। এই বইখানার বিরুদ্ধে কোনো কোনো হিন্দু-পরিচালিত পত্রিকা না-কি আক্রমণ চালিয়েছে। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তো বলতে হবে, বাংলাদেশের একখানা শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বিরুদ্ধে অনর্থক আক্রমণ করা হয়েছে। বইখানা বাংলার মুসলমানসমাজের একখানা নিখুঁত ছবি; সে-হিসাবে তাতে কিছু পরিমাণ মুসলমানী শব্দ থাকবে, এ-স্বাভাবিক। এ কথা স্বীকার না করা গোঁড়ামি ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রত্যেক সমাজের আত্মপ্রকাশের কতগুলি ধরন আছে এবং সেগুলি প্রকাশের জন্য কতগুলি বিশিষ্ট শব্দ আছে। সেই শব্দগুলিকে ইডিয়ম বলা যায়। সেই ইডিয়মগুলি বাদ দিলে সামজের রূপটি ঠিকভাবে ফুটে না এবং সাহিত্যসৃষ্টিও সার্থক হয় না। কারণ সাহিত্য মানে শুধু ভাব নয় রূপও, এবং রূপ মানে সমাজ বা আধারের রূপ।

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার নানা আনুষ্ঠানিক দিক আছে এবং সেই দিকগুলির বিশিষ্ট নাম আছে। সেই বিশিষ্ট নামগুলির পরিবর্তে যদি একটা সাধারণ নাম ব্যবহার করা যায় তো উদ্দেশ্য সার্থক হয় না পাঠকের কাছে, এক একটা বিশেষ অবস্থা রূপ ধ'রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তেমনি নামাজের পরিবর্তে 'প্রার্থনা' রোজার পরিবর্তে 'উপবাস' ঈদের পরিবর্তে 'আনন্দোৎসব' সার্থক প্রয়োগ হবে না। কারণ প্রথমগুলি বিশেষ নাম, পরেরগুলি সাধারণ নাম–ইংরেজী করে বলতে গেলে proper noun ও common noun. রাম বা রহিমের নাম ধরে না ডেকে মানুষ বলে ডাকলে যে-ত্রুটি হয় পূর্বোক্ত বিশেষ ব্যাপারগুলিকে সাধারণ নামে ডাকলে সেই ত্রুটি হবে। এ-সব কথা সপ্তম শ্রেণীর ছেলেরাও বুঝবে (অন্তত আমি যে ভাবে বুঝিয়েছি সেভাবে বুঝালে), তবু বিজ্ঞ সম্পাদকগণ কেন যে বোঝেন না, বোঝা মুশকিল। হয় বিদ্বেষপ্রসূত গোঁয়ার্তুমির ফলে তাঁরা সত্য জেনেও তা স্বীকার করেন না, নয় অতিরিক্ত diplomacy চর্চার দরুন তাঁদের ভিতরের সত্যবোধই ক্ষয়ে যাচ্ছে। এ-দুটি কারণের কোন্‌টি যে তাঁরা গ্রহণ করবেন, জানিনে। তবে কোনোটি যে তাঁদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়, তা বলাবাহুল্য।

"আবদুল্লাহ" বইখানা সম্বন্ধে আমি নিজে কোনো রায় না দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাই উদ্ধৃতি করছি। কাজী আবদুল ওদুদের নিজাম বক্তৃতার সময় তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন : "বুলবুলে তোমার (কাজী আবদুল ওদুদ) সমালোচনা পড়ে আমি বইখানা (আবদুল্লাহ) এনে পড়েছি, এবং পড়ে খুশি হয়েছি। মুসলমানসমাজকে জানার ব্যাপারে বইখানা আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছে। লেখকের চিত্রণ-ক্ষমতা চমৎকার। মাঝে মাঝে আরবি ফার্সি শব্দ আছে; তা ঠিকই আছে। তা না থাকলে মুসলমানসমাজের চিত্র পড়ছি, তা কি করে টের পেতুম? মুসলমানসমাজে যে একটা বিশেষ ইডিয়ম আছে, তা মুসলমানী শব্দের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। মাঝে

মাঝে আমিও আরবি-ফার্সি শব্দ-প্রয়োগের বিরুদ্ধে লিখেছি। কিন্তু theory-তে যা-ই বলিনে কেন, বাস্তবে দেখে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে পারিনে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, মহাপুরুষ অর্থাৎ সত্য ও প্রেম-পরায়ণ পুরুষ। নিজের অভিরুচি ও স্বভাবজাত সংস্কারের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যের নিকট নতশির না হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে গোঁয়ার্তুমির স্থান স্বল্প; এই জন্যে সত্যের বাহন রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরাও নতশির।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হিন্দুসমাজের খুদে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের নিয়ে। তাঁদের তো আর সত্য-মিথ্যার বালাই নেই; তাঁদের দেবতা হচ্ছে 'পলিসি' আর 'গুপ্ত অভিসন্ধি'। এই দুই দেবতা ছাড়া অন্য দেবতার পায়ে অর্থাৎ সত্য ও সৌন্দর্য দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেওয়া এঁরা স্রেফ আহমকি মনে করেন। কিন্তু যে দেবতার পূজাই করুন না কেন, দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের উপর এঁদের কথার প্রভাব যথেষ্ট। তাই দেশপ্রেমের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এঁদের কথার প্রতিবাদ করতে হয়। নইলে এঁদের বাজারে-কথার প্রতিবাদ করবার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। অন্ধজনেও হয়তো আলো দেওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছা করে যাঁরা চোখ 'বুঁজে' থাকেন, তাঁদের চোখ ফুটাবে কে? অথবা চোখ এত বেশী ফুটেছে যে তাঁদের কাছে সত্য-মিথ্যার ভেদরেখাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাঁদের সত্য-মিথ্যা বুঝাতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কে গ্রহণ করবে?

প্রসঙ্গত "আদাব" সম্বন্ধে বলছি। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য কয়েকটি নিঃসাম্প্রদায়িক আদব-কায়দা সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলো হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের আক্রোশের ফলে লয়প্রাপ্ত হবার পথে। মুসলমানরা এঁদের উপর বিরূপ অনৈসলামিক ব'লে, আর হিন্দুরা বিরূপ ইসলামিক বলে। দুই দিকের ঘা খেয়ে খেয়ে তাদের বেশীর ভাগই চলৎ-শক্তি রহিত–পঙ্গু; শুধু কোনোপ্রকারে টিকে আছে আদাব। তার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে। মুসলমান ধর্মনেতাগণ আদাবের প্রতি খুব প্রসন্ন নয়, কারণ তা ইসলামসম্মত নয়। তাঁদের মতে, ওটা আশীর্বাদহীন শিষ্টাচার, অতএব মুসলমানে মুসলমানে ওটার বিনিময় না হওয়াই ভালো। হিন্দু খুদে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকগণ মনে করেন ওটা ইসলামী ও অভারতীয়, অতএব ওটার পরিবর্তে ভারতীয় নমস্কারের প্রচলনই ন্যায়সঙ্গত। সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফলে হিন্দুসমাজে এই মনোভাব দিন দিন দৃঢ়নিবদ্ধ হচ্ছে। নতুবা পূর্বে দেখেছি–আমাদের ছেলেবেলার কথা বলছি–আমাদের মুরুব্বি ও তাঁদের হিন্দু বন্ধুদের মধ্যে আদাব-বিনিময় হতো। কিন্তু হিন্দুসমাজে শিবাজী-জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আদাবের প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু তা যে একেবারে লোপ পেয়েছে, তা নয়। এখনো কোনো কোনো রাজনীতি-অস্পৃষ্ট আত্মভোলা হিন্দু (হিন্দুসমাজের নেতা ও পত্রিকার সম্পাদকের মতে হয়তো সমাজের কুলাঙ্গার, কিন্তু আমার মতে সুন্দর মানুষ) আমাদের আদাব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বেশীর ভাগই আজকাল নমস্কার করেন, এবং আমরাও প্রতিদানে আদাব দিয়ে জানিয়ে দিই যে, আমরা দুটা ভিন্ন জাতি পাশাপাশি বাস করছি।

হিন্দুরা যে মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার হেতু মুসলিম-বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তাঁদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে তাঁদের নেতা ও পত্রিকা সম্পাদকগণ সহায়তা করছেন। বিদ্বেষের হাতে ক্রীড়নক বলে তাঁরা বুঝতে পারছেন না তথাকথিত নেতা ও সম্পাদকগণ তাঁদের মিত্র নন, শত্রু। নতুবা হিতকামী ছদ্মবেশধারী অনিষ্টকারীদের শায়েস্তা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হতেন।

আমি যে 'মুসলিম-বিদ্বেষ' কথাটা বলেছি, তা অকারণ নয় : তার যুক্তি-দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে। কিছুদিন আগেও অভিজাত কবি মোহিতলাল মজুমদার ও ছন্দ-সম্রাট

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ বাংলাকাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরবি-ফার্সি শব্দের মিশাল দিয়ে রচনায় মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তখন কোনো প্রতিবাদ হয় নি, এবং বর্তমানে বিষ্ণু দে প্রমুখ লেখকগণ যে ইংরেজি শব্দ গ্রিক দেবদেবীর নাম ব্যবহার করে কবিতা লিখছেন, তার বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না; দোষ কেবল বেচারী মুসলমান লেখকদের বেলা। আমি হলফ করে বলতে পারি, বাংলাদেশে যদি মুসলমান না থাকতো, মুসলমানশাসনের পরে আবার যদি সকলেই হিন্দু হয়ে যেত, তা'হলে বাংলা ভাষায় আজ যত পারসেন্ট মুসলমানী শব্দ আছে, তার চেয়ে কিছু কম থাকতো না, এবং সেগুলি প্রয়োগ তখন মুসলমানী শব্দ না হয়ে বঙ্গভাষায় অঙ্গীকৃত আরবি-ফারসি শব্দ হয়ে দেখা দিত। শুধু তা-ই নয়, যাঁরা আরবী-ফার্সী মিশ্রিত কবিতা লিখতেন, তাঁরা একটা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে গর্ব অনুভব করতেন এবং তাঁদের নিয়ে একটা 'স্কুল' বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হত। এখন যে তা হচ্ছে না, তার হেতু মুসলমানরা এদেশে রয়েছে এবং মুসলমানদের হিন্দুরা দেখতে পারেন না–সোজা কথায় মুসলিম-বিদ্বেষ।

(তেমনি, কথাটা এখানে বলে রাখা ভালো, ভারতবর্ষে যদি হিন্দু না থেকে শুধু মুসলমান থাকতো তো আমরা সম্প্রদায় হিসাবে বর্তমানের মতো এতটা আত্মসচেতন থাকতাম না; আমাদের সমাজে বহু হিন্দু তথা দেশী আচার ঢুকে যেত, আমরা টের পেতাম না এবং এখনকার মতো আপত্তি করতাম না। অর্থাৎ আমরা 'ফুল' মুসলমান না হয়ে 'হাফ' মুসলমান এবং হিন্দুর এপিকগুলি মুসলমান রঙে ঢালাই করে আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড করতাম। তা যে হয়নি, অর্থাৎ আমরা যে পাকা মুসলমান হতে চাচ্ছি, তার হেতু ভারতবর্ষে হিন্দুদের অবস্থিতি, অর্থাৎ আমরা পাছে হিন্দু হয়ে যাই এই ভয়। সেজন্য হিন্দুদের আমাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান উচিত।)

সাহিত্য ব্যাপারে মুসলিম-বিদ্বেষের নমুনাটা নয়া নয়; পূর্বেও তা বহুবার পাওয়া গেছে। প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে 'ঢাকাই প্রশ্নের' মারফত একবার তা প্রকাশ পায়। ঢাকা বোর্ডের বাংলা পরীক্ষায় (আই, এ, না ম্যাট্রিক ঠিক মনে নেই) একবার কতগুলি মুসলমানী শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গ দিতে বলা হয়েছিল। (শব্দগুলি সাহেব, নবাব, গোলাম এই ধরনের বলে মনে হয়) এই জন্য বিজ্ঞ ও দেশহিতকামী প্রবাসী সম্পাদক চটে যান এবং প্রশ্নকর্তাটি মুসলমান, এই মনে করে (কারণ ঢাকায় তখন দুএকজন মুসলমান বাংলার অধ্যাপক ছিলেন) মন্দোক্তি করেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশ্নকর্তাটি প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্মণ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চারু বাবু তখন যে প্রতিবাদপত্রটি প্রেরণ করেন তা তার মতো প্রেম ও সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিকের উপযুক্ত হয়েছিল। তিনি সম্পাদক মহাশয়কে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করেছিলেন, এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে হলে যে বাংলা ভাষায় অঙ্গীকৃত আরবী-ফার্সী শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন, জোরের সাথে এ-মত প্রচার করেছিলেন। পুরাতন প্রবাসীর পাতা উল্টালে বোধ হয় প্রতিবাদ লিপিখানা পাওয়া যাবে। সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠাকে ধন্যবাদ, তিনি চিঠিখানা প্রবাসীতে ছাপিয়েছিলেন। না ছাপলে কেউ তাঁকে কিছু বলতে পারতেন না।

যাক, আমরা Jealousy complex-এ জড়িয়ে গেছি, আমাদের ভিতরের সত্যবোধ মন্দীভূত, হয়তো একেবারে তিরোহিত। আমরা যা করি, আমাদের কথা তার প্রতিবাদ করে; আর যা প্রতিবাদ করি, আমাদের কাজ তা সমর্থন করে। দেশের সম্পাদক ও নেতা সকলেই এই জালে জড়িয়ে পড়েছেন–কেউই তা থেকে রক্ষা পান নি।

তাই মুসলমান যখন হিন্দুকে বলে সঙ্কীর্ণ অনুদার; তখন সে গোপনে গোপনে মুসলমানের দোকান বয়কট করে ও অন্যান্য উপায়ে মুসলমানকে জব্দ করে প্রমাণ করে দেয় যে, সে সত্য সত্যই তা-ই, অথচ এদিকে মুসলমানের উক্তির প্রতিবাদ করে বুদ্ধিমান দর্শকের নিকট নিজেকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করে। আর মুসলমানকে যখন বলা হয় গোঁয়ার, ধর্মান্ধ, পরমত অসহিষ্ণু; তখন লাঠি মেরে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে জানিয়ে দেয় যে, তার প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই, তার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে সব সত্য।

কথা ও কাজের গরমিলের জন্য আমাদের জীবনে যে দুঃখ সৃষ্টি হচ্ছে তাই আমাদের জাতীয় জীবনের tragedy, বুদ্ধিহীনের মতো আমরা এই tragedy বাড়িয়েই চলেছি–তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো পথ বের করছিনে। এই দুঃখসৃষ্টির ব্যাপারে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের দান কম নয়। তাঁরা জাতিকে চালনা করছেন বটে, তবে জীবনের দিকে না মৃত্যুর দিকে, সেটাই প্রশ্ন। হিন্দুসমাজের ক্ষুদে-নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকগণ 'পাকিস্তান' আন্দোলনের জন্য মি: জিন্নাহ প্রমুখ মুসলমান নেতাদের আক্রমণ করে থাকেন, এবং তাঁদের প্রতি অভব্য ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কাজ যে 'পাকিস্তান' আন্দোলনের সমর্থক এবং এক্ষেত্রে তাঁরা যে মিষ্টার জিন্নাহর পরম মিত্র, এ তাঁরা টের পান না। কারণ টের পেতে হলে যে আত্মবিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রয়োজন, তা থেকে তাঁরা শোচনীয়রূপে বঞ্চিত।

হিন্দুসমাজের নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের এই মনোভাব নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। সুতরাং মন্দ নেতার খপ্পরে পড়ে আমরা যেন তা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত না হই।

হিন্দুসমাজের এই মনোভাবের তিনটি কারণ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারব। নইলে আমরাও চটে-মটে তাঁদের মতো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করবার উপক্রম করব।

প্রথম কারণ, পরাজিতের প্রতিশোধ-প্রয়াসী আক্রোশ–বহুদিন হিন্দুদের মুসলমানদের অধীন থাকতে হয়েছিল, এ কথা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই ছলে-বলে মুসলমানদের জব্দ করে কিছুটা আক্রোশ মেটাবার প্রেরণা তাঁদের মজ্জাগত। দ্বিতীয় কারণ, দখলীস্বার্থ-মনোভাব (vested interest), বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা একলা ইংরেজ প্রভুর প্রসাদরূপ উচ্ছিষ্ট ভোগ করেছিলেন, সেখানে এখন শরীক এসে জুটেছে। এটা তাঁদের মনে কাঁটার মতো ফুটছে। তৃতীয় কারণ, আপন সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁরা অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রাখতে চান; তাই তার গায়ে আঘাত পড়লে তাঁদের আঁতে গিয়ে বাজে। আঘাত যে কল্যাণের জন্যও হতে পারে, কারণ তাতে সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়ে সৃষ্টি উদারতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা, এ তাঁরা উপলব্ধি করতে অপারগ। এই ব্যাপারে আঘাতকারীদের দোষও কম নয়; কারণ মোটের উপর স্বার্থান্ধ ও অপ্রেমিক বলে তাঁদের কথায় আঘাতপ্রাপ্তদের চোখ ফোটে না, জিদ বাড়ে। মজার ব্যাপার এই যে, যে-বৈশিষ্ট্যপ্রীতির জন্য মুসলমানরা হিন্দুদের আঘাত করে সে-বৈশিষ্ট্যপ্রীতি মুসলমানদের কম নয়। মুসলমানরা মূর্তিপূজক নয়; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের সঙ্গে সমান অগ্রসর।

এই তিনটি মনোভাব মিলে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং তাঁরা ক্ষমার যোগ্য। ভ্রান্তের সঙ্গে ভ্রান্তির প্রতিযোগিতা করে আমরা যেন একটা কাণ্ড করে না বসি। মূঢ়তা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে : বর্তমানে

হিন্দুদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার যুগ, আর পাওয়ার যুগ মুসলমানদের– ন্যায়ত হোক আর না-ই হোক। হারানোর যুগে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না, এ-ই সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হলে ভালো, না হলে দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু পাওয়ার যুগে আমাদের মাথা ঠিক রাখা চাই, এবং এ কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, যে-অভিযোগ আমরা বারবার হিন্দুদের প্রতি আরোপ করেছি, সে-অভিযোগে যেন আমরা নিজেরা অভিযুক্ত না হই–বোলতা হয়ে মধুকরের দুর্নাম গাওয়ার অপবাদ থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই।

হিন্দু-সৃষ্টির ত্রুটিগুলি থেকে আমাদের যথেষ্ট শিখবার আছে। সেগুলি যে বর্জনীয়, অনুকরণীয় বা গ্রহণীয় নয়, এ বোধ আমাদের ভিতরে তীব্রভাবে থাকা চাই। কারণ, মনীষী সাদী বলেছেন; আদব কোত্থেকে শিখেছ ? –বে-আদবের কাছ থেকে। কেননা, তাদের যা অসুন্দর ও বর্জনীয় দেখেছি, তা বর্জন করেছি। – মহাপুরুষের বাণী শুধু সভা-সমিতিতে আওড়ানোর জন্য নয়, হৃদয়ে রাখবার জন্য– রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য। সাদীর এই বাণীটি যেন আমরা জীবনে সার্থক করে তুলি।

ভালো কথা। বাংলাভাষা থেকে আরবী ফার্সী বিতাড়ন-ষড়যন্ত্র আজকের সৃষ্টি নয়। বহুপূর্বেই মিশনারীদের সহায়তায় বাংলা গদ্য সৃষ্টির কালে তার উৎপত্তি। তখন Long প্রভৃতি পাদ্রী আরবী ফার্সী শব্দ দূর করে বাংলা ভাষাকে শুদ্ধি করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের মতলবটা ধরতে পারা তখন হিন্দু নেতাদের সাধ্য হয়নি। তাঁরা সরলভাবে মনে করেছিলেন ওটা হিন্দুপ্রেম ও মুসলিম বিদ্বেষপ্রসূত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা যে খাঁটি আত্মপ্রেমসঞ্জাত– বহু পূর্বেই দূরদর্শী ইংরেজ দেশের মধ্যে যে সকল আত্মকলহের বীজ উপ্ত করেছিলেন, ওটি যে তাদেরই অন্যতম, এ-সত্যটি হিন্দুনেতাগণ তখনো বুঝতে পারেন নি, এখনো বুঝতে পারছেন না।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সমস্যা রস ও রূপের সমস্যা– শব্দ ও ব্যাকরণের সমস্যা নয়। আরবী ফার্সী শব্দবহুল হয়েও যদি রচনা রস ও রূপের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়, তবে তা সার্থক রচনা, আর সংস্কৃতশব্দবহুল হয়েও যদি তাতে রস ও রূপের দৈন্য থাকে, তবে তা মূল্যহীন। এই মনোভাব নিয়ে সাহিত্য-বিচারে ব্রতী হলে অনেক গোলমালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং সাহিত্যের আসর মল্লভূমিতে পরিণত না হয়ে মিলন ভূমিতে পরিণত হবে।

নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস

রিনেসাঁস কথাটার শব্দগত অর্থ পুনর্জন্ম, অর্থাৎ পুরাতনে ফিরে যাওয়া অথবা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া, কিন্তু ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানবমহিমা, তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রিনেসাঁসের ইতিহাস তাই জীবন-সূর্যের পুনরোদয়ের ইতিহাস–বুদ্ধি ও কল্পনার জয়যাত্রার ইতিহাস।

য়ুরোপের ইতিহাস থেকে কথাটা নেওয়া হয়েছে। অতএব, একবার সে-দিকে তাকান দরকার। য়ুরোপের মধ্যযুগ শাস্ত্রশাসনের যুগ–পোপের সর্বময় প্রভুত্বের যুগ। বুদ্ধি-বিচার, অনুভূতি-কল্পনা প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের প্রতি এ-যুগ আস্থাহীন। জগৎ ও জীবনের প্রতি এ-যুগের বিস্ময়-দৃষ্টি নেই বরং এ-সবকে তারা পতনের ফাঁদ বলেই গণ্য করে। সৌন্দর্য ও প্রেম এ-সব তো শয়তানের কারসাজি, সুতরাং এ-সবকে জব্দ করা আর শয়তানকে জব্দ করা এক কথা। তাই চলল আত্মবিকাশের পরিবর্তে নিদারুণ আত্মনির্যাতনের পালা আর এই নির্যাতনে-নির্যাতনে ক্ষীয়মান মানবাত্মা পরিণামে বিদ্রোহী হয়ে প্রশ্ন করলে: একি সত্যি? এই জগৎ ও জীবন, এই প্রেম ও সৌন্দর্য–এ সব কি সত্যই মিথ্যা? এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাকে নিয়ে গেল সত্যের সোনার সিংহদ্বারে ; সে বুঝতে পারলে জীবনচর্চাই জীবনের উদ্দেশ্য, আর প্রেম সৌন্দর্য কল্পনা ও বিচারবুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক যুগের সুপ্রভাত। মানবমহিমা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়ে এই উজ্জ্বল প্রভাতের সৃষ্টি করল।

জীবনপ্রীতির এই সোনার ফসল ফললো গ্রীক জ্ঞানচর্চার ফলে। গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের গোড়ার কথা যে দেহকেন্দ্রিক জীবনপ্রীতি এতো এক রকম সাধারণ সত্য। কিন্তু তাই বলে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ফিরে পাওয়াকেই রিনেসাঁস বললে ভুল করা হবে, যেমন ভুল করা হবে, উপায়কে লক্ষ্য বা লক্ষণকে আসল বস্তু বলে গ্রহণ করলে।

অতএব, পুরাতনে ফিরে যাওয়া রিনেসাঁস নয়, জীবনপ্রীতি তথা বুদ্ধি অনুভূতি ও কল্পনাপ্রীতিই রিনেসাঁস। ওয়ালটার পিটার বলেন : রিনেসাঁস কথাটা আজকাল কেবল পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য-প্রীতি না বুঝিয়ে এমন এক জটিল আন্দোলন বুঝায় গ্রীক জ্ঞান-প্রীতি যার একটা দিক বা লক্ষণ মাত্র। তাঁর মতে রিনেসাঁসের যুগ বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর প্রতি আগ্রহশীল এক উদার জীবনের যুগ। কী পুরাতন, কী নূতন বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর খোঁজে এ যুগ চঞ্চল। অবশ্য গ্রিসের প্রতি এ যুগের দৃষ্টি বিশেষ ও অধিক। তার হেতুও আছে, জীবনপ্রীতির এমন উজ্জ্বল সূর্য গ্রিস ছাড়া আর কোথাও উদিত হয় নি। তাই জ্বলন্ত আদর্শের জন্য সে-দিকে না তাকিয়ে তার উপায় ছিল না।

পঞ্চদশ শতকের ইতালির রিনেসাঁসে কতগুলি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের কয়েকটির প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। নইলে রিনেসাঁস সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হবে না। নানা আপাতঃবিরোধী ভাবকে একত্র করে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা একটা উদার বহু-ভঙ্গিম সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস এ-যুগের

বিশেষ কীর্তি। পূর্বে গ্রীকদেবতাদের প্রতি তাকানো হতো যে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে, গ্রীক সাহিত্যচর্চার ফলে তা ধীরে ধীরে তিরোহিত হলো এবং গ্রীকদেবতা তথা গ্রীক পুরাণ ধর্মের বিষয়বস্তুরূপে না হলেও শিল্প ও কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে সমাদৃত হলো। তবে শিল্পের প্রতি পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রদ্ধা এত বেশী ছিল যে শিল্পের বস্তুকে ধর্মের মর্যাদা দিতে এ-যুগ কুণ্ঠাবোধ করে নি। জ্ঞানী ও রসিকগণ ধীরে ধীরে গ্রীক ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে থাকেন। পরিশেষে তা একেবারে তিরোহিত হলো এবং দুই ধর্ম কালভেদে একই মানবমনের বিভিন্ন প্রকাশরূপে গৃহীত হলো। উদার অছুৎমার্গী রিনেসাঁসের কাজ হলো খ্রীষ্টানধর্ম ও গ্রীকধর্মের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক খুঁজে বের করা–বিরোধমত্ত হয়ে এককে অপর থেকে ঠেলে ফেলে নয়। মধ্যযুগ অন্ধতার দরুন যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গীন উঁচিয়েছিল এ-যুগে তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না, উদারতার আবহাওয়ার দরুন সকলে যেন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে শিখেছে, আর তারই ফলে কৌণিকতা মসৃণতায় রূপান্তরিত হয়েছে, এই সহানুভূতি, মনুষ্যত্বে এই অপরিসীম শ্রদ্ধা, এ-ই রিনেসাঁসের গোড়ার কথা।

Antinomianism বা প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা রিনেসাঁসের একটি বিশেষ লক্ষণ। হৃদয় ও বুদ্ধির মুক্তির তাগিদে নীতি ও ধর্মের বেড়া অতিক্রমণ আলোকপন্থীরা জীবন-প্রীতিরও নিদর্শনরূপে গ্রহণ করলেন। মানা নয়–জানা, বোঝা ও জয় করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠল।

মানব কল্পনা ও খ্রীষ্টান ধর্মের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এ-যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। উচ্চস্তরের মানব কল্পনা আর ধর্মে যে কোনো পার্থক্য নেই–তা ধর্মের মতোই শ্রদ্ধেয়, রিনেসাঁস কর্মীরা এই মনের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রিনেসাঁসের কেন্দ্রগত সত্য একটি কথায় ব্যক্ত হয়েছে : Man is the measure of everything–তাই রিনেসাঁসের যুগে শাস্ত্রের চেয়ে হৃদয় ও মনকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। দিল-কেতাবই যে বড় কেতাব, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেতাব নেই–রিনেসাঁস এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি।

আমাদের দেশের প্রতি এখন তাকানো যাক।

মধ্যযুগের মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে রিনেসাঁসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগ মুসলমানের সমৃদ্ধির যুগ, তাই এখন তাদের সীমাহীন কৌতূহল। জোয়ারের নদীর মতো এখন তারা কেবলই মানুষকে আপন করতে চাচ্ছে। ভাটার-নদীর ভিন্ন ধারা, সে কেবলই ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বলে দূরে সরে যায়। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত মুসলিম নওয়াব ওমরাহদের মনে যে সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল, তার কাছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকখানি ঋণী। স্রষ্টার গৌরবের অধিকারী না হলেও পালকের মর্যাদা তাদের দেওয়া যায়। গোরক্ষবিজয় রচয়িতা ফয়জুল্লার অন্তরে যে ভিন্নধর্মী গোরক্ষ নাথের মাহাত্ম্য সাড়া জাগিয়েছিল, মানবমহিমার অন্তর্গত বলে তা রিনেসাঁসের অন্তর্ভুক্ত। অহঙ্কারপীড়িত মানব–যে অহঙ্কার ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক, অপরের মাহাত্ম্য ও কীর্তি উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফয়জুল্লা যে পেরেছিলেন তাতেই বুঝতে পারা যায় প্রেমের প্রসাদে অহমিকামুক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। শুধু ফয়জুল্লা নয়, অন্যান্য কবি ও গীতিকারের রচনায়ও এর নিদর্শন প্রচুর। হিন্দু দেবদেবী রাধা-কৃষ্ণ কাম-রতি প্রভৃতির নাম তো সকল কাব্যেই বর্তমান। ছুঁৎমার্গী তাঁরা ছিলেন না–বৈশিষ্ট্যের তুষার-প্রাচীর তাঁদের প্রেমের উত্তাপে গলে যাচ্ছিল।

কিন্তু এই প্রেম, চিন্তার এই স্বাধীনতা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। পরাজয়ের বিষাদের ছায়ায় মুসলমান যে শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলে তাতে মানবমহিমা ব্যাহত হলো। কল্পনা ও প্রেমকে বর্জন করে শুধু শাস্ত্রকেই জীবনের একমাত্র নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করা হলো বলে আনন্দ বিদায় নিলে, রুক্ষতা প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করলে। স্বাতন্ত্র্যের অবতারণা ও বৈশিষ্ট্যের তুঙ্গ প্রাচীর তুলে আলাদা হয়ে বাস করাই তাঁরা জীবনের চরিতার্থতা মনে করলেন, আর তারই ফলে মানসিক ছুঁৎমার্গ সমাজে শিকড় গেড়ে বসল।

ওহাবী মনোভাবের কথা বলছি। এ কেবলই গোসা করতে কেবলই আলাদা হতে শিখেছে, প্রেমের অপরিমেয়তায় জীবনের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে শেখে নি। অবশ্য এ মুসলমানকে যোদ্ধবেশ দিয়েছে, বীরত্বপ্রেমিকরা এই জন্য তার প্রতি বিস্মিতদৃষ্টি। কিন্তু এই যোদ্ধবেশের পেছনে কোনো বড় লক্ষ্য নেই বলে মোটের উপর তা অসার্থক। মুসলমানের জীবন সার্থক হোক, ফুলে ফলে সুশোভিত হোক, এই আদর্শ প্রণোদিত হয়ে তার যুদ্ধোদ্যম নয়, ইসলামকে অবিকৃত রাখতে হলে স্বাধীনতার বড় কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম–চিন্তাজগতের এই প্রাথমিক সাধারণ সত্যটি মর্মগত হয় নি বলে তা ব্যর্থতারই আরাধনা করছে।

তারপরে ইংরেজী শিক্ষার যুগ। কিন্তু সানন্দ চিত্তে গৃহীত হয় নি বলে সংস্কৃতি-জগতে তাও বন্ধ্যা প্রমাণিত হলো। নব-শিক্ষা মানে নব-বিশ্বাস। মুসলমান নব-শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সন্দিগ্ধ চিত্তে–কেবলই টিকে থাকবার জন্য। সুতরাং কতিপয় চাকুরে সৃষ্টি ছাড়া তা আর কিছুই করতে পারলে না। বুদ্ধি অনুভূতি কল্পনা, সাহিত্য শিল্প আনন্দ তখনো মুসলমানের মর্মগত হয় নি। সে কেবলই বৃদ্ধের মতো লাঠিতে ভর দিয়ে জীবনের ভার বয়ে চলেছে। সংস্কৃতির এই শীতের দেশে হঠাৎ এলেন নজরুল ইসলাম বসন্তের মত্ততার মতো। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রিনেসাঁসের আবির্ভাব হলো–বুদ্ধি অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে গিয়ে মানবমহিমা উপলব্ধ হল। তাঁর 'বিদ্রোহী' মানবমহিমারই কাব্য। বন্ধন-জর্জর মানব-আত্মার যন্ত্রণা এখানে বিদ্রোহের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঁচবার স্বাদ আমরা প্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই পাই। জীবনের নিয়ামক যে জীবন নিজেই, আর কিছু নয়, শাস্ত্রসংহিতা সেখানে শুধু মন্ত্রণা দিতে আসতে পারে, এ-বোধ সর্বপ্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই আমরা লাভ করি। উপদেশ দিয়ে নয়, উজ্জ্বল জীবনের প্রতীক হয়ে তিনি তা প্রমাণিত করলেন। জীবনের আগ্রহে জীবনের প্রতিকূল আইনকে আমল দিতে তিনি চান নি–তাকে বন্ধনের রজ্জু বলেই মনে করতেন। যে প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা রিনেসাঁসের একটি বড় লক্ষণ, তা নজরুলের জীবনে ও কাব্যে সুপ্রচুর। আবেলার্ড, পিকো প্রভৃতি যে বিরোধিতার ভেতর দিয়ে আত্মার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছিলেন, নজরুল ইসলামেও তা বর্তমান। ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নজরুলের কাব্যে সুস্পষ্ট। হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্য নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা তো রচনা করেছেনই, ভাবসৌন্দর্যের জন্য একই রচনায় হিন্দু-মুসলমান প্রতীক ও মুসলমান মহাপুরুষের নাম গ্রহণ করতে তিনি কুণ্ঠবোধ করেন নি। এটা চিত্তের বীর্যশালিতারই পরিচায়ক। আর চিত্তের এই বীর্যশালিতা রিনেসাঁসের পরিচয়চিহ্ন। হিন্দু ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখবার এই যে প্রয়াস এর জন্য রিনেসাঁসকামী কোনো কোনো লেখক লজ্জাবোধ করেন। তাঁদের কথা: রবীন্দ্রনাথ মুসলমানী ব্যাপার নিয়ে কোনো কবিতা লিখলেন না, অথচ নজরুল ইসলাম কিনা বেহায়ার মতো বহু হিন্দুয়ানি রচনা লিখলেন ; এতে তাঁদের জাতীয় সম্মানবোধ ক্ষুণ্ন হয়, তাঁদের মাথা নুয়ে

পড়ে। কিন্তু নজরুল ইসলাম যে হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন, আর রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন না, তার কারণ সোজা। হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুলের তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই। প্রাণের যোগ নেই বলে বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একপ্রকার জলবায়ুর মতোই সহজ। তা বোঝা কঠিন নয়; তাকে জানতে হয় না, সে নিজেই নিজেকে জানিয়ে যায়, আর আমরা জেনেও টের পাইনে যে জেনেছি। এই দিনের আলোর মতো সহজ সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন, মাটির বাঁধনকে স্বীকার করতে চান না, শুকিয়ে মরা তাঁদের ভাগ্যলিপি। হিন্দু ঐতিহ্য মুসলিম ঐতিহ্য এ দুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয় ; কেননা হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়, মুসলমানের দুই উত্তরাধিকার। উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়, মাতৃসম্পত্তি ও পিতৃসম্পত্তি উভয়েরই সে ওয়ারিশ। মুসলমান যদি এই দুই অধিকার স্বীকার করে, তবে তার দ্বারা এর বড় সৃষ্টি সম্ভব–আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নবসংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারে। প্রতিভার স্বাদ পেতে হলে এই মিলন সাধনা তথা জীবনসাধনার সাধক হওয়ার দরকার। অপূর্ব প্রতিভা তথা প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকার বলে নজরুল ইসলাম এই মিলন সাধনার শরীক হতে চেয়েছিলেন।

হিন্দুর উত্তরাধিকার যে অনেকখানি মুসলমানেরও উত্তরাধিকার তার প্রমাণ হিন্দুর অনেক কিছুই আমরা জানি, বুঝি ও উপভোগ করি এবং এই জন্য দুঃখও প্রকাশ করি। এই জানার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে।

১. সব মুসলমান আরব কি ইরান তুরান হতে আসে নি। অন্তত শতকরা পঞ্চাশজন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে।

২. বিদেশাগত বাকি পঞ্চাশজনের প্রত্যেকে যে স্বদেশ থেকে পত্নী নিয়ে এসেছিলেন, এমন মনে করা বাতুলতা। অন্তত দশজন দেশী পত্নী গ্রহণ করেছিলেন।

৩. হিন্দু ধর্ম উৎসবময়, আর উৎসব ছোঁয়াচে। হিন্দুর নানা উৎসবের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে যাত্রা পাচালি কবিগান ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে মুসলমান বেমালুম হিন্দু ঐতিহ্যের অনেক কিছু জেনেছে ও পেয়েছে।

৪. আর্ট ও কালচারের ব্যাপার হয়ে হিন্দু ধর্ম সাধারণতা লাভ করেছে, আর তারি ফলে মুসলমানের মনে প্রবেশ পথ খুঁজে পেয়েছে। সাহিত্য তথা আনন্দের বস্তু হয়ে (কাব্যকাহিনীময় বলে) তা আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করেছে, আর আমরা বেদরদীর মতো দ্বার রুদ্ধ করে থাকতে পারি নি।

এ সব কারণে হিন্দুর ঐতিহ্যে মুসলমানেরও উত্তরাধিকার রয়েছে। অসূয়াপরবশ হয়ে মুসলমান জোর করে তা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তা হলেই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে না। আজো বাঙালী মুসলমান খাঁটি মুসলমান হয় নি, এ-দুঃখের ভেতরেই আমার কথার সত্যতা জাজ্বল্যমান।

নজরুল ইসলামের হিন্দুয়ানি রচনা লিখবার কারণ এইখানে। এ তাঁর উত্তরাধিকার প্রমাণিত করে, ব্যভিচার নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করে আরব দেশে জন্মগ্রহণ করতেন এবং আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন তো আরবদেশের রেস্ কালচারের প্রভাব এড়িয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। মুসলমান না হলেও মুসলমানির প্রভাবযুক্ত তিনি হতেনই। এটা এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে এ নিয়ে তর্ক চলে না, যেমন তর্ক চলে না নিশ্বাস প্রশ্বাসের অস্তিত্ব নিয়ে।

নজরুল ইসলামের রিনেসাঁসের প্রেরণা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর রচনার মারফতে তা আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী রচনার জন্য তাঁকে রিনেসাঁস-গুরু মনে করা ভুল। যাঁরা এরূপ মনে করেন তাঁরা রিনেসাঁস কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। রিভাইভালইজমকেই তাঁরা রিনেসাঁস বলতে চান। রিভাইভালইজম ও রিনেসাঁসে পার্থক্য কি, এ-প্রশ্ন অনেকে করেন। তাঁদের বলতে পারা যায়–রিনেসাঁস মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের স্বাধীনতা, রিভাইভালইজম অহমিকাবোধ, রিনেসাঁস সাধারণ মনুষ্যত্বপ্রীতি, রিভাইভালইজম বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যপ্রীতি। নজরুল ইসলামে সাধারণ মনুষ্যত্বের জাগরণই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই আজকে নজরুল জয়ন্তীতে নজরুল ইসলামকে স্মরণ করার মানে সাধারণ মনুষ্যত্বকে স্মরণ করা। নজরুল ইসলাম বেড়া ভাঙার গান গেয়েছিলেন। সেই গান আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক। বৈশিষ্ট্যের নির্মোক ভেদ করে আমরা যেন মানুষের ভেতরের সাধারণ সত্যটিকে অনুভব করতে পারি। নজরুল সাহিত্যের প্রেরণাকে সার্থক করার এই একমাত্র পথ।

রবীন্দ্রনাথ

কবি কোনো বিশেষ জাতির নয়, সমগ্র বিশ্বের; অথবা, তার চেয়েও সত্যভাবে দেখতে গেলে, সমগ্র বিশ্বেরও নয়, যাঁর চিত্ত তাঁর কল্পনা ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করে সঞ্জীবিত– তাঁর। তবু যে-দেশের প্রকৃতি থেকে কবি সৌন্দর্য আহরণ করেন, যে-জাতির চরিত্র তাঁর অভিজ্ঞতার উপাদান, সর্বোপরি যে-ভাষাকে তিনি অন্তরের অনুভূতি প্রকাশের বাহন করে তোলেন–কবির উপর সে-জাতির ও সে-ভাষাভাষীর বিশেষ অধিকার। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত বিহঙ্গমের মতো সারা জীবন মুক্তির গান গেয়েছেন, প্রত্যহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে শাশ্বতকে উপলব্ধি করার কঠোর তপস্যা করেছেন। এই চিরসুন্দরের নিকট আমরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের চিত্তকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অশেষ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে আমাদের অন্তরের ফল্গু নদীটি যে নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয় নি, রবীন্দ্র কাব্যের মায়াস্পর্শই তার হেতু। তিনি আকাশ আলো, সমুদ্র জল, অরণ্য ছায়া, সমস্ত কিছুকে আরো একটুখানি নবীন আভায় রঙিন করে দিয়ে আমাদের চিত্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করে বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধে চিত্তকে সমৃদ্ধ করার অপূর্ব শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ থেকেই পাওয়া যায়। গ্রহতারকা, কীটপতঙ্গ, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অন্তরের যে নিবিড় যোগ রয়েছে, নম্র হৃদয়ের সেই যোগ স্বীকার করে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করার মধ্যে মানবের তৃপ্তি ও কল্যাণ–কবিগুরুর এই পরম আদেশ আমাদের জীবনে এক নব আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত করেছে। কবির এ-ধরনের উক্তিকে এখন আর খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিবর্তনবাদের সমর্থনে এখন তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবর্তনবাদে যা যুক্তিতর্কের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে তাই অনুভূতি ও উপলব্ধির সহায়তায় কাব্যরূপ প্রাপ্ত। কীটপতঙ্গ, তৃণলতা ইত্যাদি যে আমাদের পর নয়, আত্মীয়, 'cousin' শ'র ব্যাক্ টু ম্যাথুসেলার ভূমিকায় তার উল্লেখ রয়েছে।[১]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মর্মবাণী। বিরাট বিশ্বকাব্যের সঙ্গীতময় প্রকাশ। তাই বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধির ব্যাপারে তা মানুষের সহায় হয়েছে। শুধু তাই নয়, অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় জগতের স্পন্দনও তাঁর কাব্যে বেজে উঠেছে। সীমার মাঝে অসীমের সাক্ষাৎলাভ করে তিনি ধন্য, অচিন্ত্য আধ্যাত্মিকজগতের স্পর্শে তাঁর হৃদয়-মন ঝংকৃত। তিনি মন দিয়ে যাঁর নাগাল না পান, গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যান এবং প্রকৃতির মধ্যে অমৃতের উপলব্ধিস্বরূপ গান শুনবার জন্য তপস্যা করেন :

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে

---

১. Embryology বা ভ্রূণতত্ত্বের Recapitulation Theory থেকে জানতে পারা যায় : একটি উন্নত জীব অভিব্যক্তির যে যে স্তরের ভিতর দিয়ে এসেছে, গর্ভে অবস্থানকালে তাহার ভ্রূণকে সেই সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে সরীসৃপ, তারপরে মৎস্য, তারপরে পাখি, পরিণামে মানব শিশু রূপে সে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে দেখতে গেলে দেখা যায়, মানুষের সঙ্গে যে তৃণলতা-গুল্ম ও পশুপক্ষীর সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে, তা শুধু কবির কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য।

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

মনুষ্যত্বের উদ্বোধনেও তাঁর কণ্ঠ উদাত্ত। ওঠো, জাগো, আপনার প্রাপ্য ও দায়িত্ব বুঝে নাও, এই জাগার-বাণী তাঁর কণ্ঠে পরম শোভা পাচ্ছে। জড়ত্ব পরিহার করে সাহস ও আনন্দের পাখা মেলে সুদূরের অভিসারী হবার জন্য তাঁর আহ্বান। ভোরের পাখির মতো সারা জীবন তিনি আলোকের আগমনী গেয়েছেন এবং জাতির অন্ধকার গগন যে আসন্ন প্রত্যুষের অগ্রদূত, এ-কথা বারবার অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিক তিনি শুধু কবি নন, নেতা; ভাবুক নন, মন্ত্রদাতা; শিল্পে, সাহিত্যে ও নানাপ্রকার কল্যাণকর্মে তাঁর প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে।

জীবনকে নদী ও যাত্রীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি তার গতি ও ক্রমবিকাশমুখিতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, কিন্তু বার্গসঁর মতো তিনি শুধু গতিকেই উপলব্ধি করেন নি, গতির পেছনে যে অচঞ্চল শান্ত রয়েছে সেই শান্তকে উপলব্ধি করেছেন। চঞ্চল প্রাণকে উপলব্ধি করেছেন বলে তিনি কবি, আর চঞ্চল আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন বলে ঋষি। বার্গসঁ প্রাণের চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করেন নি। তাই জীবনব্যাখ্যাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে দ্বৈতবাদী আর বার্গসঁকে অদ্বৈতবাদী বলা চলে। তবে রবীন্দ্রনাথও এক হিসাবে অদ্বৈতবাদী। অশান্ত যে শান্তের লীলারূপ, চঞ্চল যে অচঞ্চলেরই আনন্দহিল্লোল–ভারতীয়-দর্শনপুষ্ট কবিআত্মা এ-তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

যৌবনের পূজারী রবীন্দ্রনাথ নানা সামাজিক ব্যাধি ও সংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন, তার তীক্ষ্ণতায় অনেক অপদেবতার মৃত্যু সম্ভব হয়েছে। অন্ধতা, গোড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা দূর করে জাতীয় জীবনে মুক্তবুদ্ধিতার নবযুগ আনয়ন করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত গদ্য-রচনায় সুপরিস্ফুট। প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন : রবীন্দ্রনাথের পদ্য তাঁর গড়বার যন্ত্র আর গদ্য ভাঙবার অস্ত্র, এ-কথায় যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে। তবে এ-ভাঙা শুধু ভাঙার জন্যই নয়,– নানা শাস্ত্র ও উপশাস্ত্রের পীড়নে যার অস্তিত্ব প্রায় অননুভূত। তবু, ভাঙার মন্ত্র তাঁর রচনায় থাকলেও তিনি iconoclast বা মূর্তিভঙ্গকারী নন। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও রহস্যপ্রীতি তাঁকে iconoclasm বা মূর্তিভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ভাঙা নয় সৃষ্টি, তথা সত্য ও সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণই তাঁর কাজ। সত্য ও সৌন্দর্যের প্রবেশ পথে যে অন্তরায় তাই তিনি ভেঙেছেন–সত্য ও সৌন্দর্যের দেবতার গায়ে হাত তোলেন নি।

রাজনীতিতেও তাঁর দান অসামান্য। শুধু আবেদন আর নিবেদনের থালা বহন করায় যে লাভ নেই, দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলবার সাধনা করতে হবে, এ-বাণীও রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত। দেশকে মুক্ত ও সমৃদ্ধ করতে হলে তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়, সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলনেরও প্রয়োজন,– এই সহজ সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উত্তেজনা ও হুজুগের সুবিধা দেয় নি বলে ও-দৃষ্টি প্রথমে আমাদের ভালো লাগে নি, কিন্তু পরিণামে তাঁর নির্দেশিত পথই আমাদের অবলম্বনীয় হয়েছে।

সামাজিক আন্দোলনের গোড়ার কথা শিক্ষা। শিক্ষার আলোক ব্যতীত নব সৃষ্টির আশা সুদূরপরাহত। তাই সর্বাগ্রে শিক্ষাসংস্কারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট। তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় রচনার প্রাচুর্যই তার প্রমাণ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে যে তেমন সুফল প্রত্যাশা করা বাতুলতা, কারণ তা ভাবশিক্ষা নয়, ভাষা শিক্ষা; ভাব ও কল্পনার অভাবে জীবন ও শিক্ষার মধ্যে যে একটা দুস্তর ব্যবধান থেকে যায়, এ সকল তত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বারবার অব্যর্থ ইঙ্গিত করেছেন। প্রতিকারস্বরূপ কবি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার

পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ জ্ঞানের সঙ্গে রসলাভ না থাকলে জ্ঞান সহজে পরিপাক হয় না, আর মাতৃভাষার মারফতে শিক্ষালাভ না করলে রস জিনিসটা আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। রসহীন শিক্ষায় কেরানি সৃষ্টি করা গেলেও, মানুষ সৃষ্টি করা যায় না। আর মানুষ সৃষ্টি না হলে জাতীয় মেরুদণ্ড চিরদুর্বল থেকে যায়। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নানা ত্রুটি দূর করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা যাতে অর্জনধর্মী না হয়ে সৃজনধর্মী হতে পারে–কতকগুলো সংবাদ বুঝা ও মনে রাখার ব্যাপার না হয়ে কর্মশক্তি ও আনন্দগ্রহণ ক্ষমতা বিকাশের ব্যাপার হয়, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি। অন্য কথায় নিষ্প্রাণ পণ্ডিত সৃষ্টি নয়, মানুষের অন্তর-প্রকৃতির ছন্দোময় বিকাশ সাধনই এর লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমিক। দেশের দুঃখ-দৈন্য, ব্যথা-বেদনা তাঁর অন্তরে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমে অন্ধতা ও সংকীর্ণতার কলুষ স্পর্শ করে নি। বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে তা সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। বিশ্ব-সমুদ্রের যে তরঙ্গ নিয়ত আমাদের গায়ে এসে লাগছে–যাকে আমরা স্পষ্টভাবে অনুভব করছি, তাই আমাদের স্বদেশ, সে-ই স্বদেশ। সেবায় বিশ্বপ্রেমেরই বাস্তব প্রকাশ। তাই স্বদেশ জননীর চরণারবিন্দে মাথা ঠেকাতে গিয়ে বিশ্বজননীকে বিস্মৃত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।–

'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

তবে মাঝে মাঝে যে তিনি উগ্র স্বদেশপ্রেমের হাতে ক্রীড়নক হন নি, তা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে-উগ্রতা দূরীভূত হয়েছে এবং প্রজ্ঞার আবির্ভাবে তিনি জীবনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্ম যখন স্বদেশের পক্ষে তখন তিনিও পক্ষে, আর যখন ধর্মের সমর্থনের অভাব তখন তিনিও সহানুভূতিহীন। অন্য কথায়, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সত্যনিষ্ঠার ধার ধেরে চলে–দেশকে মিথ্যার পথে প্রশ্রয় দিতে তিনি নারাজ। স্বদেশপ্রেমের উগ্রতা যাতে বিশ্বপ্রেমের অন্তরায় না হয়, সেদিকে তিনি যথেষ্ট যত্নবান। সকল দেশ আপনার সহজ প্রতিভার বিকাশ করুক তা হলেই বিশ্বকল্যাণ সম্ভব, এই তাঁর বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসই তাঁর নানা প্রবন্ধের উপজীব্য হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত যেমন ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ, বিশ্বপ্রেমের মধ্যেও তেমনি স্বদেশপ্রেমের অবস্থিতি। বর্ণহীন বিশ্বমানবতা ও সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা উভয়ই মানবকল্যাণের পরিপন্থী–নানা দেশ পরিক্রম করে এ-কথাই তিনি বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করেছেন। দেশগত অনৈক্যের চেয়ে মনুষ্যত্বগত ঐক্যের মূল্যই যে বেশী এবং এই ঐক্যের উপলব্ধিতেই পৃথিবীর কল্যাণ নিহিত, অনুপমবাক্ রবীন্দ্রনাথ এ কথা বহুবার চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় দান, কী করে শিল্পসম্মত জীবন-যাপন করতে হয়–সেই পথনির্দেশ। শুধু কাব্যসাহিত্য নয়, সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন একখানা সুন্দর শিল্পসৃষ্টি। জীবনের কোনো দিককেই তিনি অবহেলা করেন নি, অথচ কোথাও বাড়াবাড়ির লেশমাত্র নেই। ভোগ-কামনা, ত্যাগ-বৈরাগ্য সমস্ত কিছুরই সেখানে স্থান রয়েছে, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসঙ্গতি বা অসংযম নেই। দুঃখ মৃত্যুবেশে বারবার তাঁর জীবনে হানা দিয়েছে; তা সত্ত্বেও জীবনের উপর প্রভুত্ব হারিয়ে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন নি, বরং দুঃখ বেদনাকে সৃষ্টির মালমসলারূপে ব্যবহার করেছেন। এই জন্যই তাঁকে জীবনশিল্পী বলা যায় ; শিল্পীর মতো জীবনকে তিনি ধাপে ধাপে সাজিয়ে দিয়েছেন–সমগ্রতার ভিতরে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ক'রে। কিন্তু এই শিল্প উদ্দেশ্যবিহীন নয়–একটা বড় আদর্শের প্রেরণায় সৃষ্টি। জীবন জীবনেরই জন্য

নয়, ভগবানের জন্য–শতদলের মতো পূর্ণ বিকশিত জীবন ভগবানের চরণে সমর্পণযোগ্য-কবির চিত্তে সর্বদাই এই আদর্শ ক্রিয়াশীল বলে তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটা বড় আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের কবি–জীবনবাদী কবি। মরণের পরেও যে তিনি জীবনের স্বপ্ন দেখেন, তাও এই অত্যধিক জীবনপ্রীতিপ্রসূত-অলস মনের ক্ষতিপূরণের ধারণাপ্রসূত নয়। তাঁর কাব্যে যে জীবনের ভাঙচুর বা ছোটো ছোটো মৃত্যুর অসদ্ভাব তার হেতুও এইখানে। ভাঙচুর ছাপিয়ে দেখা দেয় যে প্রাণের প্রাচুর্য, তিনি তারি সঙ্গে যোগযুক্ত হতে যত্নবান। ছোটো ছোটো ভাঙচুর বা মৃত্যুকে যে তিনি লক্ষ্য করেন নি তা নয়, তবে তাকে বড় করে দেখা তাঁর মনঃপূত হয় নি। চিরপ্রবাহিত জীবনকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। জীবনকে ভালোবাসেন বলেই তিনি প্রকৃতির নিমন্ত্রণে আনন্দিত, কারণ প্রকৃতিতে জীবনের ছড়াছড়ি–মৃত্যুকে মালুমই করা যায় না। এক একটি মৃত্যু যেন নবতর জীবনের খবর নিয়ে আসে–যেমন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, শীতের পরে বসন্ত–'মাঘ সরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, মহাপুরুষ, অর্থাৎ সত্য ও প্রেমপরায়ণ পুরুষ। নিজের জীবনকে তিনি বিকশিত করেছেন, অপরের জন্যও বিকাশের কামনা করেছেন ; এবং সেহেতু মানুষের দুর্বলতাকে বড় করে না দেখে, শক্তিকে বড় করে দেখতে বাধ্য হয়েছেন। এইখানে প্রাচীন মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। প্রাচীন মহাপুরুষগণ মানুষের শক্তিকে সন্দেহ করে তার দুর্বলতাকে বড় করে দেখেছেন এবং তাকে বাড়াতে না চেয়ে বাঁচাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বাড়াতে চেয়েছেন। বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি এই হচ্ছে তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র–তাঁর আধ্যাত্মিকতা ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক, তাই ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে বেঁধে মানুষকে ভালো ছেলে করে রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। জীবনে গোলাপ ফোটাবার সাধনায় যদি গোলাপের সঙ্গে দু'একটি কণ্টকও দেখা দেয়, তবে তাতে তাঁর আপত্তি নেই। এই দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ আধুনিক। তাই রবীন্দ্রনাথকে শুধু মহাপুরুষ না বলে, আধুনিক অথবা বিকাশধর্মী মহাপুরুষ বলা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য আনন্দের বস্তু; তাতে জীবনের জড়ত্ব ঘোচে, আত্মা মার্জিত হয়। মানুষের সঙ্গে, শুধু তাই নয়, বিশ্বের সঙ্গে ও বিশ্বভূপের সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধের পথ প্রশস্ত হয় – এই কথাটাই আমি এখানে বলতে চেয়েছি। পরের সমালোচনায় লাভ নেই; বারবার পাঠের দ্বারা ধ্যান ও কল্পনার সহায়তায়, নিজের ভিতরে রবীন্দ্রনাথকে নবজন্ম দিতে হবে, তাই হবে সত্যকার সমালোচনা–creative criticism. অন্যের সমালোচনার অরণ্যে ঘুরপাক খেয়ে হয়রান না হয়ে, আসল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ। তা হলেই আমরা ধন্য হব–আমাদের ভিতরে শক্তি–অর্থাৎ কল্পনা, অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ ও চিন্তাশক্তি মূর্ত হবে বলে।

এই সুন্দর উদার জীবনের আলোচনা যত বেশী হয়, ততই কল্যাণ ততই জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর সঙ্গীতে ও কবিতায় আমাদের অন্তর আনন্দিত ও উদবোধিত হোক–তাঁর উচ্চ আদর্শ মনুষ্যত্ববোধ আমাদের জীবনকে আন্দোলিত ও নিয়ন্ত্রিত করুক। তা না হলে তাঁকে আমাদের কবি বলে গর্ব করা অর্থহীন। দূর থেকে সূর্যকে নমস্কার করে সারা জীবন তার আলোক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যেমন মূঢ়তা, দূর থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে কবির চিন্তার আলোক থেকে প্রাণসম্পদ গ্রহণ না করাও তেমনি মূঢ়তা। এই মূঢ়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়–রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপকতর আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা

রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ। শরৎকালের শেফালি ফুলের সঙ্গে এদের তুলনা চলে। শেফালি ফুল যেমন শান্ত ও স্নিগ্ধ, এই কবিতাগুলোও ঠিক তেমনি। শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশের পানে তাকালে অন্তরে যে একটা অনাবিল শান্তি নেমে আসে, এই কবিতাগুলি পাঠেও তেমনি একটা সুমধুর তৃপ্তি লাভ করা যায়। বস্তুতঃ বসন্তের জ্বালা নয়, শরতের স্নিগ্ধতাই এদের প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য দু'খানা–"শিশু" আর "শিশু ভোলানাথ"। "কড়ি ও কোমলে"-ও কতগুলি শিশু-কবিতা আছে। সেগুনি আবার "শিশুতে"-ও স্থান পেয়েছে।

"শিশু" লিখিত হবার বৎসরকাল পূর্বে কবির স্ত্রীবিয়োগ হয়। তখন তাঁর শিশু সন্তানদের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। এরূপে শিশুর অত্যন্ত সন্নিকটে আসার ফলে কবির প্রাণে যে সুগভীর বাৎসল্য রসের উদ্রক হয় "শিশু" কাব্যখানা তারই স্বাভাবিক পরিণতি। স্ত্রী বিয়োগের অনতিকাল পরে তাঁর মধ্যমা কন্যা পীড়িতা হওয়ায় তিনি তাকে নিয়ে আলমোড়া পাহাড়ে আসেন। এখানে এই "শিশু" কাব্যটির সৃষ্টি। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর "রবীন্দ্রনাথ" নামক সমালোচনা পুস্তকে বলেছেন–"পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র সমী কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্য-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"–কথাটি ঠিক। এর প্রত্যেকটি কবিতায় যেন একটা সজীব স্নেহধারা তর তর করে বয়ে চলেছে। এখানেও তাঁর সেই সসীম-অসীমের তত্ত্ব। অসীম সসীম হয়ে নিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, আর সেই সসীমের মধ্যে আমরা অসীমের স্পন্দন লাভ করছি। "শিশুর" কবিতাগুলি পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় শান্ত শিশুর মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করে কবি ধন্য হয়েছেন।

"শিশুর" প্রথম কবিতাটি (যদি ভূমিকাস্বরূপ লেখা) চিরন্তন শিশুর এক চমৎকার চিত্র :

জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা
* * *
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে;
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি' ঢেলা।
রতন-ধন খোঁজে না তারা
জানে না জাল ফেলা।

জগৎ-সমুদ্রের তীরে ছেলেদের মেলা বসেছে। তাদের মাথার উপর সুনীল আকাশ, সামনে সুনীল জল। সেই জলে ডুবুরিরা মণিমুক্তা খুঁজছে, বণিকেরা বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে চলেছে দেশদেশান্তরে। তাদের মাথার উপর ঝঞ্ঝা ছুটছে–জলে তরণী ডুবছে। সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই; আপন খেলা নিয়ে তারা মশগুল। গর্জমান তরঙ্গের শব্দও তাদের কানে গানের মতো শোনায়। এই বিপুল সংসার তাদের কাছে একটি রঙীন খেলাঘর ছাড়া

আর কিছুই নয়। মুক্তির হাওয়া তাদের চারদিকে, কাজের পথের ডাক তারা এখনো শোনে নি। সেই আদি যুগ থেকে তাদের এই অবস্থা; বর্তমানেও তার এতটুকু পরিবর্তন নেই। এ-সম্বন্ধে কবি "ছেলেভুলান ছড়া"য় যা বলেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য।–"শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল, আজও তাই আছে। এই নবীন চরিত্রের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহু পরিমাণে মানুষের নিজের রচনা।"

"জন্মকথা" কবিতায় শিশুর জন্মরহস্যটি বিবৃত হয়েছে :

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে–
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে॥'

শুধু তাই নয়। তাঁর "চিরকালের আশায়," তাঁর সকল "ভালোবাসায়," এমন কি, তাঁর "মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে"ও সে ছিল। কতকাল সে যে এই "পুরানো ঘরের গৃহদেবীর কোলের পরে" লুকিয়ে ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। সমস্ত ইচ্ছার মধ্যেই সে চুপে চুপে মিশেছিল। সেই নানা ইচ্ছাই একীভূত হয়ে আজ মার কোলে আবির্ভূত।

এসব তত্ত্বালোচনায় হয়তো অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করবেন। কিন্তু তা করলে আমরা নাচার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে শুধু beauty খুঁজতে যাওয়া আর অর্ধেক পথ অগ্রসর হয়ে পিছিয়ে আসা একই কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু সৌন্দর্যের সন্ধানী নন, রহস্যের সন্ধানীও বটে। তাই তাঁর রচনায় সৌন্দর্যের সঙ্গে দার্শনিকতা মিশ্রিত থাকবে, এ-স্বাভাবিক। "রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ"-এর লেখক অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন,-"রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষত্বকে অল্প দুটি কথায় নির্দেশ করা যেতে পারে–অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা। অনুভূতি তাঁর ভিতর কিছু কম থাকলে এই অপ্রতিহত সন্ধানপরতার মুখে তিনি হয়ত হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্তু প্রকৃত কবির মতো অনুভূতিই তাঁর ভিতর সব চাইতে প্রবল। এই অনুভূতিরই সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চলেছে সন্ধান।"–তাই প্রায়ই দেখা যায় যাঁরা শুধু কবিতার আনন্দের জন্য রবীন্দ্রনাথ পড়তে চান তাঁরা ঠিক মতো তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না; আবার শুধু তত্ত্বের জন্য যাঁরা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরাও তাঁর প্রতি তেমন প্রসন্ন নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছেই সহজবোধ্য যাঁদের ভিতর সৌন্দর্যবোধ আর দার্শনিকতা হাত ধরাধরি করে চলে।"

"শিশু"র কয়েকটি কবিতায় চমৎকার বাৎসল্য-রস জমে উঠেছে। কবি যেন শিশুর সহজ আনন্দলোকে প্রবেশ করে মুগ্ধ। তাঁর হৃদয় দুর্বাদলে শিশিরবিন্দুর মতো ঝলমল করছে। সহজ আনন্দের অধিকারী খোকাকে সম্বোধন করে তাই কবি বলছেন :

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,

জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়-মাজনা।
নিখিল শোনে আপন মনে
নূপুর বাজনা।

একগাছি তৃণ নিয়ে শিশুর আনন্দের অবধি নেই। আর আমরা "সোনারূপার ঢেলা" খুঁজে খুঁজে হয়রান, অথচ আনন্দের নাগাল পাইনে। শিশু–

যা 'পায়' চারিদিকে
তাহাই ধরি 'তুলিছে' গড়ি–
মনের সুখটিকে।

আর আমরা আশাতীতের আশায় ফিরে জীবনের সত্যিকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকে যাই।

"শিশু" কাব্যটির উপর (শিশু ভোলানাথের উপরও) রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির প্রভাব যথেষ্ট। অজিত চক্রবর্তী তাঁর "কাব্যপরিক্রমায়" বলেছেন, "আমার বিশ্বাস পরিণত বয়সে কবি যে তাঁহার অপূর্ব শিশু-কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, সেও এই বাল্যস্মৃতি অবলম্বনেই।"– "খোকার রাজ্য", "ভিতরে ও বাহিরে", "বিচিত্র সাধ" এবং "রাজার বাড়ী" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আমরা যে শিশুটিকে দেখতে পাই, সে কি আমাদের সাধারণ শিশু ? আমার তো মনে হয়, এই শিশু আর কেউ নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই, অথবা এমন এক শিশু, পরিণত বয়সে যা'র পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। সব শিশুই অল্প-বিস্তর কল্পনাপ্রবণ : কিন্তু এমন সূক্ষ্ম সর্বানুভূতিসম্পন্ন কল্পনা সাধারণ শিশুর পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

কবি নিজের ছেলেবেলা সম্বন্ধে একটি চিঠিতে বলেছেন–"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে, ভালো করে বলতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক একদিন সকাল বেলায় অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। ..... পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ,– সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধ-পরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত।" –"শিশু" কাব্যের শিশুটির অন্তরও এমনি সূক্ষ্ম সর্বানুভূতিসম্পন্ন। সমস্ত জগৎ তার কাছে প্রাণময়, গতিময়। বিপুল সংসার তার সঙ্গে নীরব সুরে কথা কয়ে উঠে। "জগতমাতার অন্তপুরে" থাকে বলে তার কাছে সমস্তই সজীব, কিছুই বস্তুপিণ্ড নয়।–

খোকা থাকে জগতমায়ের অন্তঃপুরে
তাই সে শোনে কত যে গান কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-ঘরের চাতাল।

*

বোবাদেরও কথা বলান খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে উঠে বিশ্বজগৎ।

সমস্ত পৃথিবী শিশুর খেলাঘর। তাই 'খোকার মনের' মাঝখানটিতে বাসা নিলে টের পাবো :

শুনেছি আকাশ তা'রে

নামিয়ে মাঠের পারে
লোভায় রঙীন ধনু হাতে,
আসি' শালবন 'পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তা'র সাথে।
যারা আমাদের কাছে
নীরব গভীর আছে
আশার অতীত যারা সবে,
খোকাকে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে।

যে খোকার কাছে পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে এমনি করে ধরা দিতে উন্মুখ, সে কখনো সাধারণ শিশু হতে পারে না। এ কথা সহজেই বুঝা যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের বর্তমান তাঁর অতীতেরই যোগ্য পরিণতি। তিনি যে এত বড়ো বিশ্ববোধের কবি হলেন, জীবনের প্রভাতেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

শিশুর মতো "ডাকঘরে"-ও কবির বাল্যস্মৃতির প্রভাব আছে। "অমল" নামক ছেলেটিকে চিনি চিনি মনে হয়। এ সম্বন্ধে অজিতবাবুর মন্তব্যটুকু উল্লেখযোগ্য :- "জীবনস্মৃতি" ও "ডাকঘর" প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফেরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন-এতো কোনোমতেই আমাদের অপরিচিত নয়।" -সুতরাং "শিশু", "ডাকঘর", "জীবনস্মৃতি" ও "শিশু ভোলানাথ" এই চারখানা বই, এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত। তা হলে একটির সহায়তায় অন্যটি সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

"শিশুর বিচার" নামক পদ্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এতে একই সঙ্গে গীতিকবিতার আনন্দ ও নীতিকবিতার শিক্ষা লাভ করা যায়। শিশুর প্রতি আমরা মাঝে মাঝে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করি, এ তারই প্রতিবাদ। মাতাপিতা যে শিশুকে স্নেহ করেন, তা সে ভালো বলে নয়, ছেলে বলেই। তাই শিশুর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতি কবির উক্তি-

দুষ্টামি তার পারি কিম্বা নারি থামাতে
ভালোমন্দ বোঝাপড়া তা'তে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তা'রে যেমনি করো দূষী
যত তোমার খুশী;
সে-বিচারে আমার কিবা হয়?
খোকা হলেই ভালোবাসি, ভালো ব'লেই নয়।

দুষ্টামি, বাঁদরামির জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু শাসনের পেছনে স্নেহ থাকা চাই। স্নেহহীন শাসন অত্যাচার। আর তাতে শিশুর সংশোধন হয় না।

বিচার করি, করি তা'রে দূষী।
আমার যাহা খুশী।
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো
শাসন করা তা'রেই সাজে সোহাগ করে যে গো॥

উপরের পংক্তিটির শেষ দুটি লাইন স্কুলমাস্টারদের, বিশেষ করে পাঠশালার শিশুদের মুখস্থ থাকা উচিত। মাঝে মাঝে তাঁরা কোমলতনু শিশুদের প্রতি যে নৃশংস ব্যবহার করেন, তা বর্ণনাতীত।

"শিশু" সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, "শিশু ভোলানাথ" সম্বন্ধেও সে-সব খাটে। তবে যতদূর মনে হয়, "শিশু ভোলানাথ"-এর কবিতা "শিশুর" কবিতার চাইতে তত্ত্বমুক্ত। আর কতকগুলি ছড়া আর কমিক গোছের কবিতা "শিশু"কে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছে; কিন্তু "শিশু ভোলানাথে" সে-বৈচিত্র্য নেই।

আলোচনার শুরুতে আমরা শিশু-কবিতাগুলিকে শরৎকালের শেফালি ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। 'শিশু ভোলানাথে' তার প্রকৃত সমর্থন পাওয়া যায়। এর প্রায় সব কটি কবিতাই শরৎকালে রচিত। শরতের মনভোলান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এদের সমস্ত অবয়বে ছড়িয়ে আছে। অন্য কোনো ঋতুতে এগুলি রচিত হতে পারত কি না, সন্দেহের বিষয়।

বস্তুসার পৃথিবীর নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা পাবার ইচ্ছা থেকেই এই কাব্যটির সৃষ্টি। চিররহস্যময়ী পৃথিবীকে নতুন করে সদ্যজাত শিশুর চোখে দেখবার ইচ্ছে কবির প্রকৃতিগত। এই পৃথিবী তাঁর কাছে বারে বারে নতুন, ফিরে ফিরে নতুন। বৃদ্ধ হলেও কবি সকল বয়সের লোকের সমবয়সী। তাঁর শৈশব তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে। ক্ষণিকায় কবি নিজেই এ কথাটা বলে দিয়েছেন। –

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন।
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।

অনেক সময় তিনি এই পৃথিবীর পরিচিত রূপ-রস-গন্ধকে এমনভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন যেন এইমাত্র তিনি এখানে এসেছেন–এখানকার সমস্ত কিছুই যেন নতুন, সমস্ত কিছুই অপরিচিত। "শিশু ভোলানাথ" রচনা সম্বন্ধে কবি "পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরীতে" বলেছেন : কিছুদিন আমেরিকার পৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই–তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চির পথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। ...আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই "শিশু ভোলানাথ" লিখতে বসেছিলুম। ...প্রবীণের দেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্য কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে। এই কথাগুলির প্রতি মনোযোগী হলে বুঝতে পারা যাবে নিজের ভিতরকার শিশুটির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার জন্যই কবি "শিশু ভোলানাথ" কাব্যখানি লিখতে বসেন। তাই শিশুকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন–

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নেরে তোর তাণ্ডবের দলে;
দেরে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ঐ ঘোর–
খেলেনা ভাঙার খেলা দে আমারে বলি'।

প্রবীণতার বন্ধ দশা থেকে মুক্তি পেয়ে আবার শিশু হবার জন্যে কবি আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছেন-

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখস্ খানা

খসাব এক টানে
দেখবো তারে বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুর পারে
জানবো নিত্য অজানারে
মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা;
জমিয়ে ধূলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা,
সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা

"ছাদের কোণে পুকুর পারে" চেনা আর অচেনায় কে মিশিয়ে দেখতে চাইতেন জীবনস্মৃতির পাঠকের তা অবিদিত নেই। আসলে রবীন্দ্রনাথ যখনই শিশু-কবিতা লিখতে বসেছেন, তখনই তাঁকে বাল্যস্মৃতির ভাণ্ডার থেকে ধার নিতে হয়েছে।

"শিশু"তে একটি 'বিচিত্র সাধে'র ছেলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো ফুলবাগানের মালী, কখনো পাহারাওয়ালা, আর কখনো-বা খেয়াঘাটের মাঝি হতে চায়। "শিশু ভোলানাথে"-ও তেমনি একটি ছেলের সাক্ষাৎ পাই। সে মূর্খ থাকতে চায়। কারণ মূর্খদেরই তো সারাদিন ছুটি, আর ছুটির চেয়ে বড়ো পৃথিবীতে এমন কি-ই বা আছে? মূর্খ যারা তারাই তো রাখাল সেজে মাঠে গরু চরায়, নদীর ধারে বনে বনে বেলা কাটায়। -

তারাইতো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে;
নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বার, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা এই শিশুটির জন্মগত। প্রত্যেকটি কবিতার উপর চোখ বুলিয়ে গেলে দেখতে পাবো তার ইচ্ছের আর অন্ত নেই। কখনো এই মার ছেলে না হয়ে অন্য মার ছেলে হওয়ার সাধ, কখনো দুয়োরাণীর ছেলে হওয়ার সাধ, কখনো রাজমিস্ত্রী হওয়ার সাধ, আর কখনো-বা ইছামতী নদী হওয়ার সাধ–এ ভাবে নিজেকে নানাভাবে নানারূপে উপলব্ধি করবার সাধ এই শিশুটির শিরায় শিরায় বর্তমান।–

যখন যেমন মনে করি তাই হ'তে পাই যদি,
আমি তবে এক্ষণি হই ইছামতী নদী।
রৈবে আমার দক্ষিণ ধারে সূর্য উঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যেবেলায় নামবে অন্ধকার।
আমি কইবো মনের কথা দুই পারেরই সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে।

মা যদি আকাশ হতো আর সে যদি চাঁপাগাছ হতো, তা হলেও মার সাথে ছেলের 'বিনিকথার' নাচ চলতো। –

মা তুই যদি আকাশ হতিস
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনিকথায়
হত কথার নাচ।

শুনেছি, "শিশু ভোলানাথ" কাব্যখানি অনেকের ভালো লাগে না। কেন যে লাগে না, তার কারণ বলতে আমরা অক্ষম। এমন চমৎকার বইখানা যাদের ভালো না লাগে, তাদের 'ফিলিসটাইন' ছাড়া আর কি-ই বলা যেতে পারে? কবি বলেছেন :-"একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক মোটরে নিমন্ত্রণ সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যেসব রচনা করছি সেগুলো লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো-কোনো আত্মীয়ের কথা-সেই আত্মীয়েরা কবি :- আর যে-সব পদ্য রচনা লোকেরা পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন, আমার গানগুলো আর আমার "শিশু ভোলানাথ" নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ।"- সেই কবিদের আমরা নাম জানিনে। তবে ধারণা করে নিতে পারি, তাঁরা গীতিকাব্যের ভক্ত নন, নীতি কবিতার ভক্ত। তা না হলে এমন একটা সহজ সৌন্দর্যের বই তাদের ভালো লাগবে না কেন ? আমার তো মনে হয় অন্য কোনো বই-ই কবি প্রকৃতির এত বুকের কাছে থেকে লেখেন নি। তবে এ কথা সত্য যে, এই বইখানিতে তিনি 'ক্ষমতার কায়দা' দেখান নি বা দেখাতে চান নি। মানুষকে চমকিয়ে দিতে নয়, নিজেকে খুশী করবার জন্যই এই বইখানা লেখা; আর এজন্যই তা এমন সহজ আনন্দে ভরপুর হতে পেরেছে।

ভালো না লাগার আরেকটা কারণ হয়তো বইখানার নাম। নাম দেখেই অনেকে ধারণা করে নেন যে, ওটা ছেলেদের জন্য লেখা; আর ছেলেদের জন্য লেখা বই-এ এমন কি-ই বা থাকতে পারে, যা বুদ্ধিমান পণ্ডিতম্মন্য পাঠকরা পড়তে পারেন? কিন্তু "শিশু ভোলানাথ" শিশুদের 'নিয়ে' লেখা হলেও শিশুদের 'জন্য' লেখা নয়। বুড়ো শিশুরাই এর রস গ্রহণ করবেন ভালো। 'শিশুর কাব্যটি শিশুদের জন্য রচিত হইয়াছে এই ধারণায় অনেক বয়স্ক পাঠক তাহা পড়েন না জানি। তাহাদের তো দোষ নাই-বড় বড় হরফে বালকদিগের পাঠের সুবিধার্থে কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশকের আড়ালে এখানে আমরা পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি যে, কাব্যটির পুরা রস বুড়া শিশুরাই ভালরূপে আদায় করিতে পারিবেন।"

শিশু কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এদের মধ্যে এমন এক তাজা চির-নবীন প্রাণ ঝলমল করছে-যা প্রকৃতিকে পাঠকের কাছে অনেকখানি আপন করে দেয়। সারল্যের ভক্ত কবি শিশুর সরল হাসিতে মুগ্ধ। "গীতিমাল্যের" ৩১নং কবিতায় দেখি, কবি দিবারাত্র নিজের পসরা নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছেন,-"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?" হাঁক শুনে রাজা এল, বৃদ্ধ এল, তরুণী এল। কিন্তু কেউ তাঁকে কিনতে পারল না। রাজার প্রতাপ, বৃদ্ধের ঐশ্বর্য, তরুণীর রূপ-যৌবন সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শেষে যে তাঁকে জয় করে নিল সে বালুর তটে ঝিনুক নিয়ে খেলায় রত এক সরল শিশু। এহেন শিশুকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলি যে সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই কবিতাগুলির মূল্য অনেক বেশী। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ও সর্বানুভূতি এগুলিতে যতটা প্রকটিত হয়েছে, অন্য কোথাও ততটা হয় নি। অন্যখানে যা অনেকটা ভাবগত মতবাদ, এখানে তা রসগত বাস্তব। অন্যখানে যা চিন্তা, এখানে তা উপলব্ধি। এই জন্যই এই শিশু কবিতাগুলির এত মূল্য দিতে চাই। এগুলি পাঠ করে আমরা আমাদের কর্মক্লান্ত বিষণ্ন মনকে নির্মল, স্নিগ্ধ ও মুক্ত করে তুলতে পারি।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, এবং সেগুলির সমর্থন ও প্রচারের জন্য তিনি কোন কোন যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে-সবের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তবে বলা আবশ্যক যে, আমার নিজের কথার চাইতে কবির উক্তির আধিক্যই হয়তো এতে বেশী লক্ষিত হবে। কেননা, কবি নিজের মনোভাবটি যে-ভাবে প্রাণবন্ত করে, ছবির মতো করে প্রকাশ করেছেন, তেমন কিছু কারুর কাছ থেকেই আশা করা যায় না। তাই আমার ক্ষুদ্র প্রদীপটি না জ্বেলে প্রদীপ্ত সূর্যের আলোর প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

রবীন্দ্রনাথের সহজ সত্যদৃষ্টিতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির যে-সব গলদ ধরা পড়েছে, শিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও আনন্দহীনতাই তন্মধ্যে প্রধান। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আনন্দহীন, কেননা তা অস্বাভাবিক; আর অস্বাভাবিক, কারণ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন নয়। আনন্দহীনতার অন্যান্য কারণ পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশু যতই ধাত্রীস্তন্য পান করুক না কেন, শারীরিক পরিপুষ্ট লাভ করা তার পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। মাতৃভাষার রসবঞ্চিত শিক্ষার্থীর অন্তরও অপরিপুষ্ট থেকে যায়। শিক্ষা জিনিসটা আসলে মানসিক আহার ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীর বাঁচিয়ে রাখবার উপায় যেমন ডাল, চাল প্রভৃতি আহার্যদ্রব্য, অন্তর বাঁচিয়ে রাখবার উপায়ও তেমনি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি মানসিক খাদ্য। আহার্যদ্রব্য পরিপাক লাভ করে রক্তে পরিণত না হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর বাইরের প্রাপ্ত শিক্ষাও অন্তরের সঙ্গে এক হয়ে না গেলে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই সৃষ্টি করে বেশী।

মাতৃস্তন্য ব্যতীত শিশু যে তেমন পুষ্টিলাভ করে না তার হেতু এই যে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে শিশুর যে স্বাভাবিক নাড়ীর যোগ আছে, ধাত্রীস্তন্য অথবা অন্য কোনো খাদ্যের সঙ্গে তেমন কোনো স্বাভাবিক যোগ নেই; এবং সেজন্য পেট তা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। (পরিণাম উদরপীড়া–পরিপাক-শক্তির অভাব)। পেটের মতো অন্তরও সহজে অপরিচিত জিনিস গ্রহণ করতে চায় না, বারবার আপত্তি জানায়। তবু জোর করে ঢোকাতে গেলে অন্তরবিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে চিত্তলোকে বিকৃতি দেখা দেয়। মাতৃভাষার সঙ্গে অন্তরের যে সহজ যোগ আছে, বিদেশী ভাষার সঙ্গে সে সহজ সম্বন্ধ নেই। তাই তার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দেবার চেষ্টা অন্তরজগতে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। তা ছাড়া, দেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে যে আনন্দ ও স্ফূর্তি পাওয়া যায়, বিদেশী ভাষায় তেমন আনন্দলাভ করা অসম্ভব। অবশ্য অনেক বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক আছেন যাঁরা আনন্দ জিনিসটাকে অপ্রয়োজনীয় বাজে বলে উড়িয়ে দিতে চান, কিন্তু আসলে তা অপ্রয়োজনীয় নয়, সুগভীর প্রয়োজনীয়। জিহ্বার মজাটা যেমন মজার জন্য নয়, ভুক্তদ্রব্য হজমের জন্য,–আনন্দ জিনিসটাও তেমনি আনন্দের জন্যই নয়, শিক্ষাবস্তুর পরিপাকের জন্য। শিক্ষাব্যাপারে আনন্দ জারক-রসের কাজ করে।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হওয়ার দরুন ছেলেদের পক্ষে চিন্তা ও কল্পনাচর্চা সম্ভব হচ্ছে না; অথচ এই কল্পনা ও চিন্তাচর্চা ব্যতীত শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের ঘুমভাঙানো–অন্য কথায় চিন্তা ও কল্পনার উন্মেষ-সাধন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে বহু সময় ও শক্তির অপচয় হয় বলে ছেলেদের কল্পনা ও মননশক্তি তেমন কার্যকরী হয় না। ভাষা শিখতেই তাদের সময় যায়, ভাবচর্চা আর হয়ে ওঠে না। স্মরণশক্তি নিয়ে বেশীর ভাগ কাজ করতে হয় ব'লে মননশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত থাকা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে ওঠে। তাই সংগ্রহের কাজটা যেমন চলে, নির্মাণের কাজটা তেমন চলে না; আর সংগ্রহের সঙ্গে নির্মাণ না চললে সংগ্রহ যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে, এ কথা নতুন করে প্রচার করা অনাবশ্যক। কবি বলেছেন : "একতো ইংরাজী ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা–শব্দবিন্যাস পদবিন্যাসের সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।" অতএব অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, "অনেকস্থলেই বিশল্যকরণীয় পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরাজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না।" এ-অবস্থার বিষময় ফল এই যে, জ্ঞান কাণ্ডজ্ঞানে পরিণত না হয়ে তা কোষবদ্ধ তরবারির মতো মস্তিষ্কের অন্ধকার কুঠরিতে আবদ্ধ থাকে। অধিকারী তাকে প্রয়োগ করতে পারে না, পারলেও তা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে,–অনেকটা তরবারি দিয়ে নখ অথবা কচুগাছ কাটার মতো। তার কারণ এই যে, জ্ঞানের উপর অধিকারীর সত্যিকার অধিকার নেই; সে জিনিসটা সংগ্রহ করেছে, আয়ত্ত করে নি– সঞ্চিত করেছে, ব্যবহার শেখে নি।

শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে অবশ্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনপাঠের মিশ্রণও আবশ্যক। শুধু দরকারী পড়ায় ছেলে ভালো করে মানুষ হতে পারে না; শুধু অন্নে পেট ভরলেও প্রাণ তুষ্ট হয় না। কবির সুন্দর উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য : "হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটি শিশুপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক।" কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে এই হাওয়া খাওয়ার ভাগ্য বাঙালী ছেলেদের হয়ে উঠে না,–বাজে বই পড়বার ভাগ্য থেকে তারা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। গুরুমশাই ও অভিভাবক উভয়ে ছেলেদের হাতে বাজে বই দেখলে খাপ্পা হয়ে উঠেন, অমূল্য সময়ের এরূপ নিরর্থক অপচয় তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। বাঙালী ছেলেদের এই দুর্দশা দেখে কবি বলেছেন : "বাঙালী ছেলেদের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্যদেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদ্‌গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষুচর্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মস্‌লা মিশান নাই।"–কবির এই সমবেদনাপূর্ণ উক্তি যদি আমাদের প্রাণে সহানুভূতি সৃষ্টি না করে তো বুঝতে হবে, অনুভব করবার স্বাভাবিক শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত, দুঃখ-বেদনার প্রভাব সেখানে সাড়া জাগাতে অপারগ। কিন্তু এখানেও সেই এক অসুবিধা। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন বলে বাজে বই পড়বার আনন্দলাভ করা ছেলেদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যে-পরিমাণ বাংলা জানলে বাংলা বই পড়ে রস গ্রহণ করা যায়, সে-পরিমাণ বাংলা-

জ্ঞান তাদের নেই। আবার ইংরেজী বই থেকে আনন্দলাভ করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা ছেলেদের ইংরেজী বইগুলি এমন খাস ইংরেজীতে লেখা যে, ছেলেদের তো দূরের কথা, মাঝে মাঝে তাদের বাবাদের পক্ষেও বুঝে উঠা কষ্টসাধ্য। অর্থগ্রহণ হয়তো কোনোপ্রকারে চলে, কিন্তু ইঙ্গিত গ্রহণ হয়ে উঠে না; আর ইঙ্গিতগ্রহণের মধ্যেই যে রসোপলব্ধি এ-বিষয়ে রসিকমাত্রেই একমত। ছেলেরা ভালো বাংলা জানলে বেঁচে যেতো। কিন্তু বাংলা জানা যে অন্যায়, কারণ তা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নয়; আর পণ্ডিত না হলেও পণ্ডিতম্মন্য হওয়া যে আমাদের সকলের লক্ষ্য, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জানা নয়, জানার ভান করাই আমাদের উদ্দেশ্য; এবং সেজন্য ইংরেজী যতটা সুবিধার, অন্য-কিছুই ততটা নয়। কারণ ইংরেজীতে সাধারণ কথাটাও আমাদের কাছে অসাধারণ হয়ে পড়ে; তাই-না স্থান অস্থানে ইংরেজী বকুনি দেওয়া আমাদের অভ্যাস। বুদ্ধিমানের বুঝতে দেরী হয় না, বোকার লাগে তাক ; আর বোকার সংখ্যাই সংসারে বেশী বলে পড়ে যায় সে-সব কথার কথকদের জয়জয়কার !-যাক, যা বলছিলাম। বাংলা ভাষার সঙ্গে ভালো করে পরিচিত নয় বলে ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ করতে পারে না। এবং সে-হেতু তাদের অনুর্বর চিত্তভূমি কোনো সুফলও প্রদান করতে সক্ষম হয় না।[১]

বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন শিক্ষার বিকিরণ সম্ভব হচ্ছে না–শিক্ষা জিনিসটা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। ধনীর ছেলেরা অবশ্য হর্লিক্‌স্-বার্লি খেয়ে কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারে, গরীবের ছেলের কিন্তু সে সম্ভাবনা নেই। স্বভাবপ্রদত্ত মাতৃস্তন্য ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা মুশকিল। অথচ মাতৃস্তন্য থেকে তাদের বঞ্চিত করবার যে ভয়ঙ্কর চেষ্টা চলছিল, এতদিন সেদিকে কারুর লক্ষ্যই ছিল না। কবি বলেছেন : 'বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজী। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানী রফতানী করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়োমনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই, তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।" প্রকৃত পক্ষে হয়েছেও তা-ই ; শিক্ষা জিনিসটা বর্তমানে নাগরিক সভ্যতায় নেই; রূপ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই। –মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে দেশের কচি তরুণ চিত্তগুলি এমন বিনা আবাদে পড়ে থাকত না–সেখানে সোনা ফলাবার বন্দোবস্ত হত। বিদেশ থেকে বিলিতি লাঙল আনা কষ্টকর বলে দেশী হলে ভূমিকর্ষণ করব না, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। অথচ শিক্ষাব্যাপারে আমাদের অনেকের মনোভাব যে এই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ-জন্যই জনশিক্ষা আমাদের দেশে সম্ভব হচ্ছে না। আর এই জনশিক্ষা ব্যতীত যে একটা জাতিকে মানুষ করে তোলা অসম্ভব, এ কথা সর্ববাদীসম্মত।

অবশ্য মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে যে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হবে না, তা নয়। তবে অসুবিধার তুলনায় সুবিধাই হবে বেশী। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি হবে যে, সে-ভাষায় পড়বার মতো বই-এর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু এই আপত্তি বুদ্ধিমানের চাল ছাড়া আর কিছুই নয়, এর চমক বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, স্বরাজ না পেলে যেমন স্বরাজের উপযুক্ত হওয়া যায় না, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন না করলেও তা কখনো আপনা থেকে শিক্ষাদানের

১. ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই অবস্থা যত ভয়ঙ্কর ছিল, বর্তমানে ততটা নয়। নানা শিশুপাঠ্য পুস্তক এখন ছেলেদের চিত্তের সমৃদ্ধিসাধন করছে। ছেলেরা যদি সত্যিকার কিছু শিখে থাকে, তো এসব বাজে বই থেকে; স্কুলপাঠ্য কাজের বই থেকে নয়।—লেখক।

উপযুক্ত হতে পারে না। জলে না নেমেই যিনি সাঁতার শিখতে চান, তাঁকে খুব বাহাদুর বলা যায়, কিন্তু তাঁর বাহাদুরী এক অবাস্তব খেয়ালের উপর ভর করে আছে, তা আকাশে দুর্গনির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি–আমাদের ভাষার ক্ষমতা অসাধারণ, যে-কোনো সুষ্ঠু চিন্তা তাতে সহজেই প্রকাশ করা যায়। কবি বলেছেন : "জাপানী ভাষায় ধারণাশক্তি আমাদের চেয়ে বেশী নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার-প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে, এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ কেবল লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল : য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা, তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ।" "শুধু কি আমাদেরই মুক্তি নেই? বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হলে শুধু যে ছাত্রসম্প্রদায়েরই উপকার হবে তা নয়, সমগ্র দেশেরই তাতে লাভ। কেননা বহু জ্ঞানী ও গুণীর স্নেহদৃষ্টিলাভে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধতর হবে, আর ভাষার উন্নতি যে দেশোন্নতিরই অঙ্গ, এ কথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার, বাংলা ভাষাকে যত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল করা যায়, ততই মঙ্গল। তা না করে অনুস্বার-বিসর্গবর্জিত সংস্কৃত করে তুললে তা-ও বিদেশী ভাষার মতো দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সে-ভাষা হবে কতিপয় সংস্কৃত-জানা লোকের, সমগ্র বাঙালী জাতির নয়।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটা প্রধান গলদ এই যে, তা আইনপ্রধান ও উপকরণবহুল। আইনকে অবজ্ঞা করা কবির উদ্দেশ্য নয়, আর উপকরণের অভাবে যে শিক্ষা সার্থক হতে পারে না, সে-বিষয়েও কবি ওয়াকিফহাল। কিন্তু আইন আর উপকরণকে উপায় না করে লক্ষ্য করে তুললেই যত আপত্তির কারণ। আইনকে অবজ্ঞা করলে কারাবাস এ কথা সত্য কিন্তু শুধু আইনের ভয়েই যারা ভালো মানুষ, তাদেরও তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। ভালোত্ব তখনই সত্যিকার ভালো যখন তা শক্তিরই একটা চমৎকার বিকাশ, শক্তির বিনাশ নয়। "ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" বেঁধে যে ভালোত্বের সৃষ্টি, যা মানুষকে নির্বীর্য ও অশক্ত করে শান্তিকামী ভালোমানুষে পরিণত করে, সে-ভালোত্বের প্রতি জীবনবাদী অন্যান্য চিন্তাশীলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও নাসিকা কুঞ্চিত করেন। জীবনের আসল কথা হচ্ছে প্রকাশ, আত্মশক্তির উদ্বোধন। আত্মাকে বড় করে না দেখে আইনকে বড় করে দেখলে সে-বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে, মানুষ হয়ে পড়ে কলের মতো নির্জীব জড়, অন্যকথায় আত্মার দিক দিয়ে মৃত। সেই কল মাঝে মাঝে ভালো কাজও করতে পারে; কিন্তু সেই কাজের মালিক সে নিজে নয়, সমাজ; সমাজযন্ত্রীর হাতে সে অসহায় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সমাজকর্তাদের এই দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে চান। আইনের প্রাধান্য নয়, শুভবুদ্ধির জাগারণই তাঁর উদ্দেশ্য। চিত্তের সজীবত্ব যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

আইন আর উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে আমরা কি করে ছেলেদের সজীব অন্তরকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে ফেলি, কবির অনুপম রূপক-গল্প "তোতাকাহিনী" তার চমৎকার নিদর্শন। তোতার শিক্ষার জন্য রাজা হুকুম করলেন, আর অমনি কর্মচারীবৃন্দ লেগে গেল তার জন্য উপযুক্ত খাঁচানির্মাণের কাজে। খাঁচা তৈরী হলে দেখা গেল, তোতা গেছে মরে, আর তার পেটের মধ্যে গজ গজ করছে কতগুলি শুকনো পাতা। এই তোতা আর কেউ নয়, আমাদের কোমলপ্রাণ শিশু–পৃথিবী আর আকাশ যার জন্য বিরাট খেলাঘর তৈরী করেছে, আর ভুল করে যাকে আমরা চারদিকে দেয়াল-দেওয়া ঘরে বন্দী করবার চেষ্টা করছি। গল্পটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বিদ্যমান, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই তার লক্ষ্য।

আমাদের মনোভাবের প্রতি দৃকপাত করলে বুঝতে পারা যায়, শিক্ষা-ব্যাপারে

পরিশ্রমটাই আমাদের লক্ষ্য, লাভ নয়। একেবারে 'মাফলেষু কদাচন' গোছের অবস্থা আর কি! শিক্ষকও খাটছে, ছাত্রও খাটছে, অথচ কিসের জন্য এই খাটা কেউ বলতে পারে না। সকলেই রীতি বজায় রাখছে; কেননা তা না করলে শিক্ষকের পক্ষে চাকরি বজায় রাখা মুশকিল, আর ছাত্রের পিঠে পড়ে বেত্রাঘাত। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের চিত্তের যোগ স্থাপিত না হলেও চলে; কিছু চক, কয়েকটি বেত, আর কতকগুলি কথা নষ্ট করে ঘণ্টাবাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশ পরিত্যাগ করতে পারলেই ব্যস! তাই আজকালের শিক্ষকের ছাত্র আছে অনেক, কিন্তু শিষ্য নেই একটিও। সম্বন্ধের নিবিড়ত্বের পরিবর্তে এক অস্বাভাবিক দূরত্ব উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। কবি যে স্কুল ও শিক্ষকের দুটি চিত্র এঁকেছেন, তা বাস্তবিকই উপভোগ্য। স্কুল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তাহার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার মার্কা পড়িয়া যায়।" আর শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁর উক্তি : "আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে–ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যাইতে পারে।" কিন্তু এতে ছাত্রেরও দোষ নেই; শিক্ষকেরও দোষ নেই। হেডমাস্টার তাদের থেকে এই চান, এবং হেডমাস্টার থেকে ইনস্‌পেক্টর, ইনস্‌পেক্টর থেকে ডাইরেক্টর এই কামনা করেন। আসলে সমস্ত দোষ ঐ কল জিনিসটার। কলের নিয়ম আছে, প্রাণ নেই; বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও প্রাণবর্জিত নিয়মপ্রধান। রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন : "সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে। কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না–সজীব মনে তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মনুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।" রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন, আমাদের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধেও তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

প্রতিকারস্বরূপ কবি উপকরণের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। সেখানে বৃক্ষলতা, মুক্ত বায়ু, স্বচ্ছ আকাশ, নির্মল জলাশয় প্রভৃতির উদার স্পর্শ মানবমনের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শের অনুসারী। তবে প্রাচীন ভারতের বলেই নয়, সত্য বলেই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। কবি বলেছেন : "মন যখন বাড়ীতে থাকে তখন চারদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশাল ভাবে, বিচিত্র ভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, ঘণ্টা দিয়া তাড়া দিয়া কখনই মানবজীবনের আরম্ভে একি নিরানন্দের সৃষ্টি হইয়াছে।" ফুলের বিকাশের পক্ষে যেমন আলো-হাওয়ার প্রয়োজন, মানবমনের বিকাশের জন্যও তেমনি প্রকৃতির উদার স্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু বিষয়ী অভিভাবক হয়তো এ কথা কবির খেয়াল বলে উড়িয়ে দেবেন, তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেবেন না। তাই তিনি তাঁদের সম্বোধন করে বলেছেন : "হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব হৃদয়কে

যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে ইহার কোনো আবশ্যক নাই–তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলাপর্ব অনুভব করিতে দাও–তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশী কাজ করে, তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে উপেক্ষা করিয়ো না।"

কবির বিশ্বাস, উন্মুক্ত প্রকৃতিতে লব্ধ শিক্ষা মানবচিত্তকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলবে, আর এই শিক্ষাই হবে সত্যিকার স্বাভাবিক শিক্ষা। অতিরিক্ত বুদ্ধির চর্চা মানুষের চিত্তকে নিরসও করে তুলতে পারে; তাই প্রকৃতির উদার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য কবির সাগ্রহ উপদেশ।

শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, সকল দেশেই আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা এই। আমরা তো সকল বিষয়ে য়ুরোপের নকল করি, কিন্তু সেখানকার বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলিও যে জনবহুল স্থানে অবস্থিত নয়, সে-কথা আমাদের কজনের জানা আছে ? আর জানা থাকলেও এই আদর্শ কার্যে পরিণত করতে চেয়েছি কজন ? নির্জনতাই তপস্যার উপযুক্ত স্থান, আর শিক্ষা যে তপস্যারই অন্তর্গত, এ কথা নতুন করে প্রচার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শুধু মুক্ত প্রকৃতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা সর্বাঙ্গীন হবে না, তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যও আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য কৃচ্ছ্রসাধন বা দেহের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা নয়, চিত্তবৃত্তিকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা মাত্র। সংসারে নানাবিধ তরঙ্গ আমাদের অন্তরকে নিয়ত অস্থির করে তোলে; এই অস্থিরতা অন্তর-বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্যে ব্রহ্মচর্যপালন দ্বারা এই বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। কবির শান্তিনিকেতনে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্যের পরিবর্তে আজকাল নীতিশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। কিন্তু তাতে ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে মনে হয় না। ব্রহ্মচর্য মানবাত্মাকে ভিতর থেকে গড়ে তোলে, আর নীতিশিক্ষা মানুষকে কোনো প্রকারে ভালো রাখবার চেষ্টা করে মাত্র। এ যেন চোখে দেখে পথচলা নয়, লাঠি দিয়ে হাতড়িয়ে পথচলা।

৩

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক আরেকটা লক্ষ্যযোগ্য বিষয় : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মিলন–অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানসাধনার সমন্বয়। অন্তরাত্মার সাধনা প্রাচ্যের একচেটে বস্তু কি-না, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে; কিন্তু প্রতীচী যে আজ জড়জগতের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে, সে-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। জড়দৈত্যকে হাত করেছে বলে পশ্চিম আজ সমস্ত বিশ্বকে তার ভোগের বস্তু করে তুলেছে, অথচ আমাদের ভাগ্যে সামান্য শাকান্নও জুটছে না। সেজন্য আমাদের হা-হুতাশের অন্ত নেই, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ চিত্ত পশ্চিমের পানে চেয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অনর্থক শক্তির অপচয় করছে। কোনোপ্রকারে দল বেঁধে জব্দ করতে চাইলেই যে তারা জব্দ হবে, তা নয়। যে-বিদ্যার জোরে আজ তারা শক্তিশালী, তা আয়ত্ত করতে না পারলে দলবদ্ধতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কবি একটি সুন্দর উপমার দ্বারা কথাটা বলেছেন : "ড্রাইভারের মাথায় বাড়ি দিলেই যে ইঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা ইঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব, শুধু আমার রাগের আগুনে ইঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই–তা হলেই সত্যের বর পাব।" তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বিজ্ঞানসাধনা ছাড়া আমাদের নিস্তার নেই। "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের

নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করে আমরা প্রত্যেকে যে-কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতেই না।–এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সরল স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।"

কিন্তু যে-বিজ্ঞানসাধনার কথা বলা হল, তাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার অন্যদিকও আছে এবং তাতেই তার পরম কল্যাণ নিহিত। তা অন্তরাত্মার সাধনা। এই সাধনার দিকে লক্ষ্য না রেখে বিজ্ঞানকেই একমাত্র সাধনার বস্তু করে তুললে, মানুষের হাতে কল না ঘুরে কলের হাতে মানুষ ঘুরলে যে অবস্থা হয়, সভ্যতারও সে-অবস্থা হবে। আর অনেকটা হয়েছেও তাই। পশ্চিমের সভ্যতা আজ নিজের বেগ সামলাতে না পেরে যেন পদে পদে হোঁচট খেয়ে পড়ছে; তার পায়ের তলার মাটি স্থির নেই বলে সে যেন ঠিক মতো নাচতে পারছে না। তবু তার পক্ষে বাহাদুরির কথা এই যে, সে মাটিতে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে না, পড়তে পড়তে নিজেকে সামলিয়ে নিচ্ছে।

আমরা প্রাচ্য দেশীয় লোকেরা য়ুরোপের এই দশা দেখে বিজ্ঞের হাসি হাসছি, এবং মনে মনে বলছি : এবার মজাটা দেখ, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কিন্তু য়ুরোপের দশা দেখে আমাদের হাসবার অধিকার আছে কি-না ভেবে দেখবার বিষয়। য়ুরোপের তো রাজসিকতা আছে, আমাদের তো তা-ও নেই। আধ্যাত্মিকতার নামে আমরা যা চালাতে চাচ্ছি, তা তো আসলে তামসিকতারই রকমফের। জড়জগতে অবনতিশীল হলেও আত্মার জগতে যে আমরা দিন দিন ঊর্ধ্বগতি লাভ করছি, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং য়ুরোপের যদি করতে হয় অন্তরাত্মার সাধনা, আমাদের করতে হবে অন্তর এবং বাহির উভয়েরই। কেননা, য়ুরোপ যা-হোক একটা কিছুর সাধনা করেছে, কিন্তু আমরা করেছি সাধনার ভান। রবীন্দ্রনাথ তাই য়ুরোপকে শুনিয়েছেন আত্মার কথা, আর আমাদের আত্মা ও বস্তু উভয়ের। আমাদের বস্তুহীনতা যে আত্মাহীনতা অর্থাৎ জড়ত্বেরই লক্ষণ, এ-তত্ত্ব তাঁর নানা প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু জুগিয়েছে।

৪

এভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিই সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বস্তুত আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতটা ভেবেছেন, কোনো শিক্ষাতত্ত্ববিদ ততটা ভেবেছেন কি-না সন্দেহ। শিক্ষাতত্ত্ববিধ বড় করে দেখেছেন শিক্ষামন্ত্র, আর রবীন্দ্রনাথ বড় করে দেখেছেন শিক্ষার্থীর অন্তর। জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ, আর কোনো বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ততা সৃষ্টি করা শিক্ষাতত্ত্ববিদ ও অন্যান্য অভিভাবকগণের লক্ষ্য। ছেলে মানুষ হোক, এটাই বড় কথা নয়; কোন পথ অবলম্বন করলে সে সহজে টাকা উপার্জন করে সমাজে বরেণ্য হতে পারে, সেটাই বড় কথা। এ ভাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা শিশুর অন্তরবিকাশের পথরোধ করে দাঁড়ায়; নিজের অন্তরের পরিচয় লাভ করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা যে আজকাল "শিক্ষা শিক্ষা" করে চীৎকার করছি, তাও আমাদের সাংসারিক গরজে, শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ এ-ধরনের শিক্ষার বিরোধী, কারণ তা মানুষের চিত্তবিকাশের পরিপন্থী। চিত্তের বিকাশ ফুলের বিকাশের মতো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র,– পরাধীন ও পরতন্ত্র নয়। ফুলের প্রতি জবরদস্তি করে শিলাবৃষ্টি,-আলো হাওয়া তাকে প্রস্ফুটিত করেই তোলে। আমাদেরও আলো-

হাওয়ার কাজ করা উচিত, শিলাবৃষ্টির নয়। ব্যক্তিগত বাসনার চাপে শিশুর অন্তরের স্বাভাবিক শক্তি যেন নষ্ট না হয়ে যায়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলও এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন : "রাজার প্রদত্ত শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, স্কুলের শিক্ষা বা পিতামাতার শিক্ষা, ইহার কোনোটারই উপর ছেলের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, কেননা প্রত্যেকটাই কোনো-না-কোনো একটা লক্ষ্যের সাধনের জন্য ছেলেদের তৈয়ারী করে, কিন্তু ছেলেদের নিজেদের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করে না। রাজা চান ছেলেরা জাতীয় ধনবৃদ্ধির সাহায্য করুক এবং বর্তমান শাসনবিধির পোষণ করুক। যাজক চান ছেলেরা পৌরোহিত্যের শক্তি বর্ধিত করুক। স্কুলমাষ্টার চান ছেলে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করুক। পিতামাতা চান ছেলেরা বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। নিজেই নিজের লক্ষ্যের পরিপোষক হইয়া স্বতন্ত্র মানুষরূপে নিজের সুখ ও হিতের দাবী করিয়া বালক গড়িয়া উঠুক, ইহা এই সব বাহিরের শিক্ষাব্যবস্থা করে না, করিলেও তাহা যৎসামান্যই। বালকের দুর্ভাগ্য এই যে, সে নিজের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা বর্জিত এবং সেই জন্যই বাহিরের জোরজুলুম তাহাকে পাইয়া বসে। –ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানবের আত্মা আছে এবং তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করা উচিত, ইহা ধর্মের কথা। এ দৃষ্টিতে শিক্ষার কর্তৃপক্ষগণ ছেলেমেয়েদের দেখেন না। তাঁরা ছেলেদের দেখেন সমাজকার্যের উপাদানরূপে, কলকারখানার ভবিষ্যৎ কর্তারূপে, বা যুদ্ধের সঙ্গীনরূপে। যতক্ষণ না শিক্ষক মনে করেন প্রত্যেক ছাত্রই নিজে নিজের লক্ষ্যসাধক, তাহার নিজের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, কেবল সে সৈন্যদলের একজন নয়, ততক্ষণ শিক্ষক শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নন। প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ে জ্ঞানের আরম্ভ হইতেছে মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা। শিক্ষা বিষয়ে ইহাই আবার মুখ্য।"[১] রাসেলের এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। উভয়েই আত্মাকে বড় করে দেখেন।

৫

বলা হয়েছে, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্যসাধনই বর্তমানে আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা সাধন করতে পারে একমাত্র বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্য যে শুধু এই জন্যই প্রয়োজনীয় তা নয় ; শিক্ষার অবাস্তবতা দূর করবার জন্যও তার যথেষ্ট প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে যে বাঙালী জীবনের পরিচয় পাই, তা যত সহজে আমরা আপনার করে নিতে পারি, ইংরেজী সাহিত্যের চিত্রগুলি তত সহজে আপনার করা যায় না। বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশের সঙ্গে মানসিক আত্মীয়তা স্থাপিত ক'রে আমাদের শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত বাস্তব করে তুলতে পারে। তাই যত শীঘ্র ছেলেদের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা যায় ততই মঙ্গল। তবে পুঁথিগত বিদ্যা কখনো শিক্ষাকে বাস্তব করে তুলতে পারে না। সেজন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে পুঁথি নয়, পুঁথি যার প্রতিবিম্ব সেই জাগ্রত সমাজকে পাঠ্য করে তোলা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের কাছে পুঁথি এত বড় হয়ে আছে যে, সমাজের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের হয় না। অর্থাৎ প্রতিবিম্বই তারা পেয়ে থাকে, তাও প্রায় সব সময় আমাদের নিজের সমাজের নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের–ভিন্ন পরিবেষ্টনে বর্ধিত মানব সম্প্রদায়ের। সুতরাং অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা ধারণা সম্বল করে আমরা দারোগা হতে পারি, কেরাণী হতে পারি, কিন্তু পূর্ণ বিকশিত মানুষ

১. প্রবাসী, মাঘ–১৩০১ বাং

হতে পারিনে। প্রত্যক্ষ বস্তুর সংশ্রব ব্যতীত শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। কবি বলেছেন: "প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে। অতএব, আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।" অন্যত্র তিনি বলেছেন: "আমরা নৃতত্ত্ব বা Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশের যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত পোত বাগদী রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে–পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।" বাস্তবিক দেশে বাস করলেই দেশকে জানা হয় না, সেজন্য গভীর মনোনিবেশ, নানা জাতি উপজাতির চারিত্রিক বিবরণ সংগ্রহ, এসব সেই তপস্যার অন্তর্গত। "Sympathy is limited by comprehension"–সহানুভূতির মাত্রা জানার উপর নির্ভরশীল। দেশকে জানিনে বলেই দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের স্বদেশপ্রেম আসলে বিলেত থেকে ধারকরা জিনিস, দেশের মাটিতে তার শিকড় নেই। সেই অবাস্তব জিনিস আমাদিগকে কতটুকু ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করতে পারে? যতটুকু করি তাও ইংরাজের উপর রাগ আছে বলেই, দেশকে ভালোবাসি বলে নয়। সুতরাং দেশকে শুধু পুঁথির মধ্যে জানলে চলবে না, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তাকে আয়ত্ত করা চাই। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানই হবে আমাদের সত্যিকার শিক্ষা— নব নব দানে যা দেশকে সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখবে। সন্ধানের আলো ফেলে যখন অনাবিষ্কৃতকে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করা যায়, তখনই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। বই-এর জ্ঞান তো চর্বিত-চর্বণ ; অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই সত্যিকার নিজস্ব জ্ঞান।

৬

রাশিয়া পর্যটনের ফলে কবির মনে জনশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়েছে। জনশিক্ষা ব্যতীত যে দেশের মুক্তি নেই, এ কথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। রাশিয়ার চিঠির প্রায় জায়গাতেই এই শিক্ষার জন্য বেদনা সুস্পষ্ট–"রাশিয়ার চিঠি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র।"–শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি যথার্থই সত্য। রাশিয়াতে জনশিক্ষার জন্য যে-উদ্যম ও চেষ্টা চলছে, তা দেখে কবি বিস্মিত–আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাবের কথা স্মরণ করে মর্মাহত। বিদেশে থেকেও স্বদেশের জন্য এই মর্মপীড়া কবির সত্যিকার স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। তিনি বলেছেন : "আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত–ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে, এজন্য কী এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষাবিস্তার করে চলেছে– সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অন্ত নেই।–কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল–এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে তাদের অবস্থা বদলে গেছে, আমরা পড়ে আছি জড়তার

পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। চেষ্টাবলে কতদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, আর চেষ্টাহীনতার জন্য কত পিছিয়ে থাকতে হয়–যথাক্রমে বর্তমান রাশিয়া ও বর্তমান ভারতবর্ষ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সাধারণ নিম্নস্তরের মানুষ–কবি যাদের "সভ্যতার পিলসুজ" বলেছেন– তাদেরও যে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা যায়, এ কথা পূর্বে কবির বিশ্বাস হত না। কিন্তু রাশিয়া পর্যটনের ফলে তাঁর এ-ভ্রম দূর হয়েছে; তিনি বুঝতে পেরেছেন, ঐকান্তিক এবং আপ্রাণ চেষ্টার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়– সমস্ত বাধাবিপত্তিই তার কাছে মাথা নত করে।

শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, সে-সম্বন্ধে অলোচনা করা গেল, এবং দেখা গেল যে, শিক্ষার অস্বাভাবিকতা, আনন্দহীনতা, অবাস্তবতা ও জনশিক্ষার অভাব আমাদের জাতির প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে আছে। এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত না হলে শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না এবং জাতীয় জীবনে দুঃখরজনীর অবসানে ঊষার স্বর্ণালোক সম্ভোগ করবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা শিক্ষার সমস্ত গলদ তন্নতন্ন করে দেখালেন। এখন সে-সব দূর করবার ভার আমাদের সকলের উপর। আমরা যেন আমাদের সকল সামর্থ দিয়ে কবির অন্তরের বাসনাকে সফল করে তুলি।*

* সাহিত্য-পরিষদ – ত্রিপুরা শাখায় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস

১

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-বিলাসিতার চির-বিরোধী। তাঁর সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান দেখতে পাওয়া যায় যা বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই জরায়-মরা দেশে যেখানে জন্ম লাভ করা মাত্র "ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা" "দুনিয়া কিছু নয় সব ফাঁকি" এ-প্রকারের নানা বৈরাগ্যসূচক বচন শুনতে হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে জীবনের গান গেয়ে এসেছেন। অবশ্য তার আগেও কেউ যে এ-ধরনের গান গান নি, তা নয়। তবে যাঁরা গেয়েছেন, তাদের ভিতর মৌলিকতা জিনিসটা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা অনুবাদ করে গেছেন, আর কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ Longfellow-র Pslam of Life-এর অনুবাদ-কর্তা হেম বাবুর নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর তাঁর নিজস্ব, তাঁর অন্তরের স্বতঃউৎসারিত সুর। এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী ধরণী তাঁর নিকট মিথ্যা বলে মনে হয় নি। এই মুক্ত-নীল আকাশের তলে শ্যামল দূর্বাদলের উপরে বসে কি এক অনির্বচনীয় রসে তাঁর অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে উঠেছে। তাঁর অনন্ত-রূপ পিয়াসী মন এই অপরূপ রূপসী পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার কান্না-হাসি, আলো-ছায়ার খেলার মাঝে বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক এই স্বাভাবিক বাঁচবার সাধটি মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা ঢেকে রেখে বিশ্বের প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশের দ্বারা নিজের বুজরগী জাহির করতে চেষ্টা করে,–মনে করে, দুনিয়াকে অবহেলা করলেই বুঝি মস্ত বড় একটা কাজ করা গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ভান করেন নি। তিনি তাঁর মনের কথাটি চাপা না দিয়ে বলে ফেলেছেন–

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়,–
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা' যদি না' পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল

নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল তার পরে, হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

বাংলা সাহিত্যে এ একেবারে অপূর্ব। ধরণীর প্রতি এমন প্রাণের টান এদেশে আর কোনো কবির কাব্যেই দেখা যায় না। আশ্চর্য এই যে, যে দেশে কি দর্শনে কি কাব্যে জগৎ ও জীবনকে "কিছু না" বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে" ধরনের গানই চির-পরিচিত ও চির-আদৃত, সে-দেশের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে–

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক দুঃখে সুখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা– অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

কী নিবিড় ধরণী-প্রীতি ফুটে উঠেছে এ কটি লাইনে! আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নিকট এ বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ আমরা দেখছি সব মানুষই মরছে, কেউই অমর হয়ে থাকছে না; এবং এই দেখে ঠিক করে নিয়েছি যে মরণটাই মানুষের জন্য সত্য, জীবনটা মিথ্যা। কিন্তু এটুকু ভেবে দেখছিনে যে, যত দিন বেঁচে আছি ততদিন এই জীবনটারও একটা মূল্য আছে, এবং সে-মূল্য একটা বড় রকমের মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবনের সত্যতা আলোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি জানেন, মরণটা যেমন সত্য জীবনটাও তেমনি সত্য। তাঁর মতে জীবনটাকে এড়িয়ে চলে খুব বড় একটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং হীন-দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হয়। জগৎ জীবন ও মরণকে তিনি কি ভাবে দেখেছেন "বলাকার" একটি কবিতায় তা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন-কি ভাবে তিনি এক জগতকে ভালোবেসেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন এই জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। প্রভাত-সন্ধ্যার আলো-অন্ধকার তাঁর চেতনায় ভেসে গেছে। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন যে, একদিন তাঁকে এই জগৎ হতে বিদায় নিতে হবে– একদিন তাঁর বাণী আর এ-বাতাসে ফুটবে না, তাঁর আঁখি আর এ আলোকে লুটবে না;–একদিন তাঁকে তাঁর শেষ দৃষ্টি, শেষ কথা, শেষ করে যেতে হবে। কিন্তু এ চিন্তার দ্বারা আমাদের মতো তাঁর চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয় নি, তাঁর অন্তরের আনন্দ উড়ে যায় নি। কেননা তিনি জানেন–

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত–
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ'দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্প সম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো।

এই তাঁর বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসই তাঁর অন্তরকে বলীয়ান ও উৎসাহপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিশ্বাস আছে বলেই তিনি এক "জগতের পাকে পাকে ফেরে ফেরে" ভালোবাসতে শিখেছেন। তাঁর জগতকে ভালোবাসার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর অন্তরের কবিজন-সুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতি। এই সৌন্দর্যানুভূতিই তাঁকে চালিত করে নিয়েছে রূপের পথ দিয়ে, ভোগের পথ দিয়ে, এবং শেষে অরূপ রাজার দুয়ারে এনে হাজির করেছে। অন্য কথায়, সৌন্দর্যানুভূতি শেষে সর্বানুভূতিতে পরিণত হয়েছে।

২

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা উচিত মনে করি। প্রথমে "কড়ি ও কোমলে"র সনেটগুলিতেই তাঁর সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলিকে অনেকে ভোগের কবিতা বলে উল্লেখ করে থাকেন, এবং এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেকের নিকট খোঁচাও খেতে হয়েছে। আমরাও এগুলো ভোগের কবিতাই বলি; কিন্তু ভোগের কবিতা বলে এ উপেক্ষার বস্তু মনে করিনে। ভোগের যে একটা সত্য আনন্দ আছে তা-ই এই কবিতাগুলোয় ফুটে উঠেছে। এই সম্বন্ধে "রবীন্দ্রকাব্যপাঠে"র লেখক অধ্যাপক ওদুদ সাহেবের উক্তি তুলে দিচ্ছি।

"এই সব সনেটের কতকগুলোর ভিতর যে ভোগের সুর বাজছে, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্ধ-সত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট বলেই একটুখানি সংস্কারবিমুক্ত হয়ে কাব্যের সৌন্দর্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের ভিতরে এমন ব্যাহত। কাব্যে আত্মারই এক প্রকাশ; কাজেই এ সৌন্দর্যও "ন বলহীনেন লভ্য"।

"এই ভোগের 'কুসুমের কারাগার' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তা সত্য নয়। অনেক বড় কবির ভিতরে এ বিদ্রোহ জাগে নি। তাই বলে তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়।...

"তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতর দুর্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে বলে যে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জেগেছে তা সত্য নয়। 'কুসুমের' কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেমনি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে– তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগ্রত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে।" ওদুদ সাহেবের সঙ্গে আমরাও একমত। কবিগুরুর নিকট চিরদিনই নতুনের ডাক আসছে, আর তারই উত্তরে তিনি পুরাতনের "জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে" সাড়া দিয়ে উঠছেন।

"কড়ি ও কোমলে"র সনেটগুলি ক্ষুদ্র হলেও এক একটি সৌন্দর্যের আকর। "যৌবন স্বপ্ন" কবিতায় তিনি বলেছেন–

"আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায় নিশ্বাস ?
বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত ?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের সরমে বিব্রত!

প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিতে স্বপনের মত জাগরণে পলায় সলাজে ;
যেন কার আঁচলের বায় ঊষায় পরশি যায় দেহ ;
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে ;
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফোটে ফোটে বকুল মুকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল–শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে
যেন কোন উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।"

"কড়ি ও কোমল" রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। সুতরাং এর কবিতাগুলিতেও যৌবনসুলভ ভোগানুরাগ বর্তমান। জগতের সকল বৈচিত্র্যই এখন তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নারীসৌন্দর্য যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ততটা আর কিছুই পারে নি। "যৌবন স্বপ্ন" কবিতাটিতে কবি যৌবনের চিরন্তন রূপটিকে কি অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিরদিনই এটি যুবকদের জন্য নতুন আনন্দ বহন করে আনবে। এ কবিতাটি শুধু কবির নিজের মনের কল্পনা নয়, সমগ্র যুবকসম্প্রদায়েরই মনের কথা। দুর্ভাগা আমরা যে প্রকাশ করতে পারছিনে–অথচ প্রাণের ভিতর আকুলি বিকুলি করছে, যে ভাবটা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ধরা না দিয়ে "আধেক ধরা পড়েছে গো আধেক আছে বাকি" অবস্থায় আছে, সেই কথাটা এবং ভাবটাই রবীন্দ্রনাথের কলমের একটু আঁচড়ে ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে।

"চুম্বন" নামক কবিতাটিও একটি ভোগের কবিতা :

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান ক'রে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধরসঙ্গমে।
* * *
দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন-
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে!
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।"

আমরা এ কবিতাকে আর ভেঙেচুরে দেখাবার চেষ্টা করলাম না, কেননা, তাতে সৌন্দর্যহানি হবার আশঙ্কা আছে। সৌন্দর্য মানুষের চেহারাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ফেড়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হয় না। কারণ, তা করলে যা বের হয় তা হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেগুলি যে কত সুন্দর তা সকলেরই জানা আছে।

"বাহু" "অঞ্চলের বাতাস" "দেহের মিলন" "তনু" "হৃদয়ের আসন" "কল্পনার সাথী" "হাসি" প্রভৃতি এবং আরো কতকগুলি কবিতাও ভোগের কবিতা। এগুলির সৌন্দর্য এক তাঁরাই নিবিড়ভাবে অনুভব করবেন যাঁরা একটি রঙ্গীন মন, তথা, কবিতার রস গ্রহণ করবার একটি স্বাভাবিক শক্তি নিয়ে এসেছেন। আর যাঁরা প্রথমেই কবিতা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন সেই হতভাগ্য অরসিকদের

পক্ষে এগুলির রস আস্বাদন করবার পথ একেবারে বন্ধ। কারণ, আমাদের মনে হয়, "ফাল্গুনীর" "কবিশেখর" যে বলেছেন, 'আমার কবিতা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য' এ কথাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা।

জীবনকে ভালোবেসেছেন বলে জীবনের একটা দিক ভোগকেও তিনি অবহেলা করেন নি। অবহেলা করলে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজই করতেন ; কেননা, তা হলে তিনি নিন্দা হতে মুক্তি পেতেন ; কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দেওয়া হত।

নারী-সৌন্দর্যকে আমরা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, কিন্তু এই নারী-সৌন্দর্য যে কী ভাবে আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে সে-দিকে আমরা মোটেই দৃকপাত করিনে। যখন যৌবন আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয় তখন রমণীর রূপ-লীলা আমাদের নিকট কতই না মহান হয়ে দেখা দেয়।–মনে হয়, তার চলার ভঙ্গী, চোখের চাউনি, কণ্ঠের সুর, মুখের হাসি, সমস্তই আমাদের হৃদয়ের সুরের সঙ্গে বাঁধা ; –মনে হয়, আমাদেরই মনের স্বপ্নময়ী রঙ্গীন ইচ্ছাখানি তরুণী-আকারে, তন্বী-আকারে, মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য-প্রিয় কবির নিকট সে যে আরো সুন্দর হয়ে দেখা দেবে তা বলা বাহুল্য। সে তাঁর "কল্পনার সাথী", "হৃদয়ের ধন", আরো কত কি!

যে দেশে "নারী নরকস্য দ্বারী", "নারীই মানুষের সর্বপ্রকার পতনের মূল" এই প্রকারের নানা কথা প্রচলিত আছে সে-দেশের কবিরই নারীর প্রতি এহেন অনুরাগ সাধারণের চোখে আশ্চর্য ঠেকবে বই কি। সাধারণে নারীজাতিকে মুক্তির অন্তরায় বলে মনে করে থাকে, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে মুক্তির সহায়স্বরূপ মনে করেন। নারীর সঙ্গ ব্যতীত পুরুষের কোমল বৃত্তিগুলোর বিকাশ হয় না। পুরুষের অন্তরে অর্ধ-চেতন অবস্থায় যে স্বপ্নলোক পড়ে আছে নারী-সৌন্দর্যস্বরূপ সোনার কাঠির স্পর্শ ব্যতীত তা জাগ্রত হতে পারে না। সৌন্দর্য-প্রিয় কবির নিকট তাই নারীর এত সমাদর।

"কড়ি ও কোমলে" কবির প্রাণ বেশী কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু "সোনার তরীতে" দেখতে পাই তিনি কল্পনা থেকে বাস্তবতার দিকে আকাশ থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যেও তিনি অনন্ত আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। "আকাশের চাঁদ" কবিতাটিতে যেন সেই আনন্দই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সেখানে এক খেয়ালী বিশ্ববিমুখ মানুষ জগতের সুখ-আনন্দ শোভা-সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে আকাশের চাঁদ হাতে পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে চলেছিল। পথে তাকে কত পথিক কত কি জিজ্ঞেস করল ; কিন্তু সবার উত্তরে তার একই কথা– "আকাশের চাঁদ চাই।"

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
কাঁদে সে দু'হাত তুলি।

কিন্তু যেতে যেতে যখন তার চোখ পড়ল মানুষের দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার উপর তখন তার অন্তর কি এক অনন্ত রস-পুলকে ভরে উঠল। তখন তার কাছে মানুষের ছোটো ছোটো কাজ-কারবারও আর তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।

"এমন সময়ে সহসা কি ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে

দেখিল রজনী যেতেছে বহিয়া
সুনীল সিন্ধু তীরে।
* *
দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির কল্লোলময়।
স্নেহ-সুধালয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর
প্রতি দিবসের কাজে।
সকাল বিকাল দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মত,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।"

এমনি করে অবাক নয়নে সে চেয়ে রইল আর স্বভাব-সুন্দরী তার নয়নে এক অপরূপ রূপের অঞ্জন বুলিয়ে দিল। এমনি করে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত জিনিসের পানে চেয়েও তার অন্তর-আত্মা পুলকে ভরে উঠল। তাই–

"যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহেনি কখনো ফিরে
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।"

"বসুন্ধরা" কবিতায় কবিগুরু "বসন্তের আনন্দের মত" দিগবিদিকে "আপনারে বিস্তারিয়া" দিবার আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছেন। বিশ্ব-চেতনা আর বিশ্বানন্দের সঙ্গে নিজের অন্তরের যোগ সাধন করবার এই যে চেষ্টা, এ-ই রবিবাবুর কাব্যকে এতটা মোহন ও বরণীয় করে তুলেছে। এত সুখ, এত বৈচিত্র্য ও এত আনন্দ, তবু কবির স্বদেশবাসীরা বিশ্বের প্রতি এতটা বিমুখ ;– এই ভাবটাই এখন তাঁকে মস্ত বড় পীড়া দিচ্ছে। তাই তিনি বলেছেন,–

"হারে নিরানন্দ দেশ পরি জীর্ণ জরা
বহি বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রি দিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা
গ্রহ-তারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরি পশু-পক্ষী প্রাণী

অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতের মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুতেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।"

প্রেম পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান, এই সব দেবতাদেরই জন্য মানুষের জন্য নয়, এই ভাবটিরও প্রতিবাদ তিনি করেছেন–তাঁর বিখ্যাত কবিতা "বৈষ্ণবকবিতায়"।–

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা–এই প্রণয়স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, একি শুধু দেবতার !
* *
আমাদেরই কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন–তরে,
তাহে তাঁর নাহি অসন্তোষ।
* *
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে–আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বিশ্বের মাঝে ভগবানের লীলা চলছে। জাগতিক হর্ষ-বিষাদ-স্নেহ-প্রেমের মধ্যে তাঁরই আমরা অনুভূতি লাভ করি। বস্তুতঃ যা পাই এবং দিই, একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাব, তা ভগবানের নিকট হতেই পাই এবং তাঁকেই দিই। সুতরাং তাঁকে নিয়েই আমাদের দেওয়া-নেওয়া, হর্ষ-বিষাদের খেলা চলছে ;— লীলাবাদের এই মর্মোক্তিটিই এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৩

সংসারের সুখ-দুঃখের দিকে দৃষ্টি দিলেও "সোনার তরীর" লেখাগুলিও কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু "নৈবেদ্যে"র আমলে তিনি এমন একটি উচ্চস্তরে পা দিয়েছেন যেখান থেকে আরম্ভ হলো তাঁর সাধক জীবন। আগেকার কবিতার মতো এ-কবিতাগুলিতে কল্পনাবিলাস ও চঞ্চলতা নেই। এগুলি ঋষি-দৃষ্ট বাণীর মতোই বীর্যবন্ত এবং গম্ভীর। সাধকজীবনের লেখা হলেও এ কবিতাগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক কবিতার মতো নয়।

বিশ্বপিতার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তিনি জগতকে ভুলে যান নি। কারণ তিনি জানেন ভগবান কোনো বিশেষ আকার ধারণ করে কোনো বিশেষ স্থানে বসে নেই। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, সর্বত্রই তিনি নিবিড়ভাবে মিশে আছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়ে তাঁরই লীলা চলছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের মধ্য দিয়ে তিনি এই লীলাকেই চির-প্রবহমান রেখেছেন। "আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি," রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই মন্ত্রটির উপাসক। তাই তিনি জগৎ হতে বৈচিত্র্যকে উচ্ছেদ করে দিয়ে একের ধ্যানে নিমগ্ন হন নি। বরং বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই অরূপ একের সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছেন। আকার যে নিরাকারেরই আকার এবং রূপ যে অরূপেরই রূপ এই ধারণা তাঁর অন্তরে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। "আকার এঁকে এঁকে চলছে নিরাকার" এবং "রূপের মাঝে অরূপ বীণা লুকিয়ে বাজে," এই দুটি লাইনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বের সাথে যে ভগবানের যোগ আছে এবং বিশ্ব-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই যে ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায় "নৈবেদ্যের" নিম্নলিখিত কবিতা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে–

নির্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা; হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে–

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্ম-ভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।

'দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।'

নানা রূপ, নানা আকার, নানা দুঃখ-সুখের অনুভূতির ভিতর দিয়েই ভগবান মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তিনি আনন্দরূপে নিজেকে সতত প্রকাশিত করে রেখেছেন; একবার হৃদয় খুলে বরণ করে নিলেই হল। "ধর্মের আনন্দরূপ" নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন,–

"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনিও লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধারা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে ফুরায় না।

* * *

ধন্য হইলাম—আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম–পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে, তৃণের সঙ্গে, কীট-পতঙ্গের সঙ্গে, গ্রহ তারা সূর্য্য চন্দ্রের সঙ্গে, আমরা ধন্য হইলাম।"

উপরের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আলোছায়া, সন্ধ্যা-প্রভাত এবং ঋতু-পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ভগবানের আগমনবার্তা শুনতে পেয়ে তিনি পুলকিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর গানে ও কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

গাছের পাতায় আলো নাচতে দেখে তিনি বলেছেন,

"এই-যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।"

ভোরের বেলায় তিনি ব'লেছেন,

"ভোরের বেলা কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে।"

সন্ধ্যায় ব'লেছেন,–

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।

ফাল্গুনে ব'লেছেন,

"বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।"

ঝড়ের রাতে ব'লেছেন,

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"

শরতে গেয়েছেন,

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দগান গা রে।"

এমনি করে খুব কম কবিই বিশ্বের সকল কিছুতে ভগবৎসত্তার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন। বিশ্ব-প্রীতি তাঁর অন্তরে এক মহান পুলকের সঞ্চার করে তাঁকে বৈরাগ্য-বিরোধী করে তুলেছে। তাই "নৈবেদ্যে" দেখতে পাই—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ (দঃ) ব্যতীত পূর্বে আর কারো মুখ দিয়ে এহেন মহাবাণী প্রকাশ পায় নি। ইসলামের এই দিকটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবিক, শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে জপ তপ ধ্যান ধারণা করলেই যে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, এ-ধারণা মানুষের জীবনে এক মহা অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। ভগবৎ-লাভ এত সোজা ব্যাপার নয়। কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হবে। ভগবান যে উদ্দেশ্যে আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। জগতেরও আমাদের নিকট কিছু পাওনা আছে, সে পাওনা হতে রেহাই পেতে হবে। নইলে মুক্তি নেই। "প্রকৃতির প্রতিশোধে" সন্ন্যাসীর জীবনে তা-ই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। মুক্তি কখনো ক্লীবতা ও নির্জীবতার দ্বারা আসতে পারে না। সে জন্য জাগ্রত সাধনা চাই। মানবকল্যাণে ও বিশ্বহিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করা চাই। কর্ম মুক্তির অন্তরায় নয় বরং সহায়স্বরূপ।

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ
খাট্‌চে বার মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার পরে।
মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌বে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলা বালি,
কর্মযোগে তাঁ'র সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কর্মকুণ্ঠ বাঙালীর জাতীয় জাগরণী-গান হওয়া উচিত এটি।

নির্জীব আলস্যপরায়ণ বাঙালী জাতির অন্তরে কর্ম ও জীবনের সাড়া আনবার জন্যও তিনি অনেক গেয়েছেন। বাঙালী-জীবনে বৈচিত্র্যহীনতা দেখে তিনি দুঃখিত। তাই এই জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি বঙ্গমাতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন;–

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি–তব গৃহক্রোড়ে

চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার সেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো-ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ কর নি।"

দেশবাসীকে এমনি জীবনের বেগে চঞ্চল করে তুলতে চেয়েছেন। বাংলাদেশব্যাপী এই বহুভঙ্গিম জাগরণের সাড়া যে কতকটা রবীন্দ্র-কাব্য-প্রেরণারই ফল, তা বলা বাহুল্য।

এই বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের সত্তাকে বেমালুম বিস্তৃত ক'রে দেবার ইচ্ছাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য যা অন্য কবি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে। বহু কবিতায়, তিনি নানা দেশ নানা কাল ও নানা ধর্মের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়রূপে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

"বিশ্বনৃত্য" কবিতায় তাঁর এই ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠেছে, তাতে বিশ্বমানবের সাথে মিলনের সাধটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে;

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল প'ড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কেগো দিবে এই তৃষিতে।"

"গীতাঞ্জলিতে"ও এর সমভাবের একটি গান আছে,

"আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে সবার সাথে
মিলন হবে।
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারব কবে।"

এমনি গভীর প্রাণের টান নিয়েই তিনি বিশ্বলীলায় যোগ দিয়েছেন এবং শেষে এই বিশ্বলীলার ভিতরেই ভগবানের সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন একখানি সুগীত সঙ্গীতের মতো। ওস্তাদ যেমন তা-না-না থেকে আরম্ভ করে মাঝখানে গমক গিটকারী এবং মীড়ের ছড়াছড়ি করে সমে এসে পৌছোন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ছেলেবেলার খেলাধুলা আরম্ভ করে কৈশোর ও যৌবনের ভোগ-বিলাসিতার ভিতর দিয়ে এমনি একটি স্থানে এসে পৌচেছেন যেখান থেকে তাঁর বীণায় বেজে উঠেছে বিরাট একের সুর। কৈশোর ও যৌবনের দাবিগুলি পূর্ণ না করলে তাঁর জীবনে এ ধরনের সম্পূর্ণতা আসত কি-না সন্দেহ। কবিগুরুর জীবনে এক অপূর্ব ক্রমোন্নতি দেখতে পাওয়া যায় যা অন্যান্য কবির জীবনে খুব বিরল;– তিনি যেন ক্রমশঃই প্রাণ থেকে মন এবং মন থেকে আত্মার উন্নতি লাভ করেছেন। তাই তাঁর কাব্য এতটা সম্পূর্ণ, এত সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যকে জীবনে কিরূপ স্থান দেন, এ প্রবন্ধে আমরা তাই আলোচনা করবার প্রচেষ্টা করেছি, এবং দেখেছি যে তিনি কখনো বৈরাগ্যের ভক্ত নন। তিনি সৌন্দর্য ও আনন্দ-বাদী সাধক। সৌন্দর্য ও আনন্দ সংযম ছাড়া লাভ করা যায় না। কিন্তু এ সংযম সর্ব-ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা নয়, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত করা মাত্র। তাই তাঁর জীবনে সাধারণ-সংসার-বিরাগী-সুলভ ক্লীবতা ও নির্জীবতা না দেখে অনেকে তাঁর সৌন্দর্য-রসাত্মক আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রায়ই বিদ্রূপোক্তি প্রকাশ করে থাকে। তারই প্রত্যুত্তরে যেন "যৌবন বেদনারসে-উচ্ছল আমার দিনগুলি" কবিতায় তিনি বলেছেন–

"তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী ;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি ॥
* * *
আমায় চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খল খল উঠে অট্টহাসি,
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধু মাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি নিয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে ॥"

বাস্তবিক পৃথিবীব্যাপী যে চির-বিবাহ-উৎসব, যে চিরন্তন মিলন-মেলা চলেছে সেখানেই ত' কবির আসন–সেখানেই ত' তিনি পরম বিলাসে "পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি আকাশ ভালে" ফুটিয়ে তুলবেন। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-বিরোধী, কিন্তু তাই বলে তিনি অতিরিক্ত

সাংসারিক নন। অতিরিক্ত সাংসারিকতা, যা দেখে Wordsworth বলেছেন, "The world is too much with us," তা যে আধ্যাত্মিকতার পথে বিঘ্নস্বরূপ এ কথা তিনিও বিশ্বাস করেন। তাঁর জীবনে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয় হয়েছে। এই সমন্বয়ের ফলেই তিনি এই জগতকে স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত দেখেছেন। তাই 'বলাকায়' তিনি বলেছেন–

'স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে তার খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে।"

উপসংহারে বলতে চাই, যদিও তিনি এই দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-সুখময় বিচিত্র ভোগের মধ্য থেকে রস সংগ্রহ করে মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করেছেন, তথাপি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে ঊর্ধ্বে–অতি ঊর্ধ্বে–এক অচিন্তনীয় অতীন্দ্রিয় চিন্ময় জগতের দিকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য বস্তুর মধ্যে অনন্তের কম্পন অনুভব করে তাঁর অন্তর-আত্মা অসীমের পানে অভিসারী হয়েছে। তাই Wordsworth-এর ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে ইচ্ছা করছে–

"Type of the wise that soar but never roam,
True to the kindred points of heaven and home."

বাংলা কাব্যে দুঃখবাদ

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলা দেশেই বোধ হয় ইউরোপীয় প্রভাব সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়েছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্য তার সাক্ষী। ইউরোপীয় দুঃখবাদী ও উন্নাসিক ভাবধারার সাক্ষাৎ বাংলা কাব্য-সাহিত্যেও পড়েছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার দুঃখবাদী দর্শনকে আঘাত করতে গিয়ে তার কিছুটা রূপায়নও করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'পন্থা' কবিতায়। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি সব কিছুর মূলে কুঠারাঘাত করেছেন বলে তিনি এই কবিতায় দুঃখবাদী দর্শনের পুরোহিত 'শপেনহর'-কে 'স্বপ্নহর' বলে সম্বোধন করেছেন।

উন্নাসিক মনোবৃত্তি তথা পৃথিবী-ঘৃণার চূড়ান্ত পরিচয় বহন করেছে কবি বুদ্ধদেব বসুর 'কোনো বন্ধুপ্রীতি' কবিতাটি। প্রথমেই বলা দরকার, কবিতাটি রচনা হিসেবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর— বাংলা সাহিত্যে তুলনাবিহীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই কবিতায় পৃথিবীর দীনতা আর কবির মানসিক সমৃদ্ধি পাশাপাশি রেখে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে কবির উপভোগ্য কিছুই নেই। কবি বলেন :

"এই বসুন্ধরা
আমাদের যোগ্য নহে। পদতলে দরিদ্রা পৃথিবী
চিরদিন করুক মিনতি; মোরা তা'রে চাহিব না।
মোদেরে করিবে লুব্ধ– কী তাহার আছে বা এমন?"

পৃথিবী নৈবেদ্য-স্বরূপ তার সমস্ত ঐশ্বর্য এনে কবির সামনে উপস্থিত করলে কবি নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন : 'আর কিছু নাই?'

ধরণী বললে :

> আর কিছু নাই মোর; এই সব। এই উপহারে সর্বকালে, সর্বলোকে রাজাদের সন্তোষ-সঞ্চার করিয়াছি।

কবি বললেন :

> মোরা কবি, আমাদের সম্ভোগ-পিপাসা তুমি পারিবে না মিটাইতে। আমরা করিব পান লবণাক্ত, স্বেদসিক্ত, অন্তহীন দুঃখের আকাশ। সঞ্চয় মোদের নহে ; কৃপণের মোহান্ধ গৃধ্নুতা মোরা ঘৃণা করি। ঘৃণা করি সুমসৃণ আরামের তৈলাক্ত, বিক্লব তৃপ্তি। ... এ নিখিলে আমাদের উপভোগ্য কিছু নাই, কিছু নাই আর–শুধু আছে স্নেহহীন, অন্তহীন দুঃখের আকাশ।

রাজাদের বেলা :

ভূমি আর নারী-মাংস জীবনের সংগ্রহ তাঁদের –
গৌরব, আশ্রয়-স্থল।
কিন্তু কবি আর তাঁর বন্ধুর বেলা? না, এ পন্থা তাঁদের নয়।
তুমি আর আমি
বিধাতার নির্বাচিত, দেবকুলবংশোদ্ভূত মোরা–এ-পন্থা মোদের নহে।

ভূমি তো তাঁরা চানই না, নারীও না। নারী সম্বন্ধে কবির উক্তি :

> আর নারী ? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী আছে কি মরতে? অমিতর লাবণ্য কি স্পর্শ করে ধরণীর ধূলি কভু? সুচরিতা কভু জন্ম নেয় মর-রমণীর গর্ভে ? দেখিতে কি আশা করো, সখা, পরিষ্কার সূর্যালোকে গড়ুইন্-দুহিতারে কভু? অথবা বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন মধ্যযুগ হ'য়ে উঠে' এসে কখনো কি দাঁড়াইবে সম্মুখে তোমার আবেলার্ত-প্রিয়? ব্যারেট্ কখনো এসে ভালোবেসে আঙুল বুলিয়ে দিবে তব রুক্ষ কেশগুচ্ছ মাঝে? প্রতীক্ষা করিবে কার? কাহারে করিব ধন্য মোরা প্রেম দিয়ে? নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংস-স্তূপ, শরীরসর্বস্ব মূঢ়।

আমরা দেখেছি প্রেমের জন্য ক্রুচ্ সাহেব তাকিয়েছেন ভিক্টোরীয় যুগের দিকে, বর্তমানে তাঁর তৃপ্তি নেই। আমাদের কবিকেও বর্তমান তৃপ্তি করতে পারছে না। তাঁর দৃষ্টি অতীত আর বর্তমানের উপন্যাসের পাতায়। স্বভাবতঃই। Distance lends enchantment– নিকটে তরঙ্গরাশি, দূরে রজতরেখা। অতীত আর ভবিষ্যতই তো সুন্দর, বর্তমান তো রুক্ষ, রূঢ়। কেননা তা বাস্তব, আর বাস্তব নিয়ে কল্পনা চলে না।

তা হলে কবি কি করবেন? কেন, অগ্নিকল্পা কবিতাকল্পনার ধ্যান করবেন।

অদেহিনী, প্রাণ-উদ্বোধিনী
আমাদের প্রিয়তমা অগ্নিকল্পা কবিতাকল্পনা,–
যা'রে করেছিল চুরি স্বর্গ হ'তে রাজদ্রোহী কবি,
দুঃখের আকাশ মোরা পান করি যা'র প্রেরণায়।

সৌভাগ্যবশতঃ বুদ্ধদেব যে উঁচু নাকের পরিচয় দিয়েছেন, তা শেষের দিকে নেতিবাচক না হ'য়ে ইতিবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষের দিকে পৃথিবীতে নবজন্ম দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।–

পৃথিবী গিয়েছে ম'রে মোরা তারে বাঁচাইব ফিরে'।
মোদের নয়নে আছে যে-বিরল আলোক ভাণ্ডার,
সে-ই মৃতসঞ্জীবিনী, তা'রি স্পর্শে বাঁচিবে ধরণী।

দেখা গেল তাঁর নৈরাশ্যবাদ আসলে নৈরাশ্যবাদ নয়, ভূমা-প্রীতিরই রকমফের। ভূমার স্পর্শ থেকে পৃথিবী বঞ্চিত। তারই স্পর্শে কবি পৃথিবীকে 'চির-অজানা' করে গড়ে

তুলবেন, এই তাঁর সংকল্প। তাঁর সাধনা 'নবরে নব, নিতুই নব'র সাধনা। তাই তাঁর গান হচ্ছে:

কোরো না মানা–
দুরাশা আমার বুকে দিতেছে হানা।
কবিরা করেছে শোক অশ্রু-ভারে,
ছোঁয়ায়ে আমার চোখ বাঁচাবো তা'রে
পৃথিবী উঠিবে জেগে চির-অজানা।

তার ঘৃণা দীন ও ধ্বংসাত্মক নয়, ঐশ্বর্যশালী ও সৃষ্টিধর্মী।

এখানে বলা দরকার, এই কবিতায় যেমন কবির নারীঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাঁর অপর কবিতায় নারীবন্দনা রয়েছে। 'পৃথিবীর পথে' নামক গ্রন্থে তেমনি একটি প্রতিবাদী কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। কবিদের পক্ষে সুবিধা এই যে, তাঁরা মুক্ত স্বভাবের লোক–কোনো প্রকার আইডিয়ার বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ। এমন কি নিজের আইডিয়ার কারাগারে বন্দী হয়ে থাকাও তাঁদের বিবেচনায় মূঢ়তা। Every idea is a prison, every heaven is a prison.– এই উক্তির তাৎপর্য কবিরাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তাই তাঁরা অবলীলাক্রমে বিপরীত কথাও বলতে পারেন। আমি এই মুহূর্তে এই ভাবের সম্মোহনে মুগ্ধ হয়েছি বলে যে চিরটাকালই আমাকে এই ভাবের গোলামী করে চলতে হবে, এমন কথা তো হতে পারে না। তাই কবিদের রচনায় বিচিত্র আইডিয়ার, বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মুশকিলে পড়তে হয় পাঠকদের, বিশেষ করে ভক্ত পাঠকদের নিয়ে। তাঁদের কাছে অনেক সময় কবিবাক্য বেদবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। কবিদের তারা দেখতে চায় এক-একটা ভাবের প্রতিনিধি হিসেবে, আর তা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন অনমনীয়তার পরিচয় দেয় যে, নিজেকে আর সহজে বদলাতে পারে না। তাই বলতে চাচ্ছি : কবিরা মুক্ত, পাঠকরা, বিশেষ করে ভক্ত পাঠকরা বন্দী। বন্দী বলে তাদের উপর এ-ধরনের কবিতার প্রভাব মন্দ হওয়া অসম্ভব নয়। তারা কবিতাকে দেখে কবিতা হিসেবে নয়, ফিলজফি হিসেবে। সেটা কিন্তু ভুল। কবিত্ব হচ্ছে বৈচিত্র্যের পূজা, আর ফিলজফি একত্বের। কবিতাকে ফিলজফি হিসেবে দেখলে একপ্রকার একত্ববাদের জন্ম হয়, আর একত্ববাদ থেকে জন্মে গোঁড়ামি। নমনীয়তাকে ধ্বংস করে দেয় বলে গোঁড়ামি জীবনের স্বাদ পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যে প্রকারেই হোক, নমনীয়তাকে বজায় রেখে চলতে হবে। নইলে জীবন উপভোগ সম্ভব হবে না, আর জীবন উপভোগ সম্ভব না হলে সংস্কৃতিও পর থেকে যাবে। কেননা, সংস্কৃতি আসলে জীবন উপভোগেরই দান। হিন্দু যদি মুসলমানের বাড়িতে এসে হিন্দুয়ানিই খোঁজে তো তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। তাকে আসতে হবে খোলা মন নিয়ে। তা হলেই মন নতুন কিছু দেখার সার্থকতায় ভরে উঠবে। অমনি করে বিভিন্নকে দেখার, বিপরীতকে দেখার ক্ষমতা চাই। নইলে জীবনের দৈন্য ঘুচবে না, গোঁড়ামির সাধনা দীনতার সাধনা, এ-কথাটা মনে রাখা দরকার।

আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী

সমাজ মাত্রেই সাধারণতঃ দু'প্রকার মানুষের বাস দেখতে পাওয়া যায়। একপ্রকার আদেশপন্থী, আরেক প্রকার অনুপ্রেরণাপন্থী। আদেশপন্থী যারা তাদের জন্য দরকার একটা ধরাবাঁধা পথ। অন্তরের সহজ উপলব্ধি বিসর্জন দিয়ে তারা একান্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে সংস্কার অথবা শাস্ত্রের আদেশকে। আর অনুপ্রেরণাপন্থী হচ্ছে সেই দলের লোক অন্তরের গভীরতম লোকে যারা অনুভব করে একটা স্পন্দন, যা ইঙ্গিতে তাদেরকে জানিয়ে দেয় কি তাদের করণীয়, কিইবা তাদের করণীয় নয়। আদেশপন্থী ভাবে–মানুষ রক্তমাংসের জীব, অপৌরুষের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ছাড়া অন্য পথে চলা তার পক্ষে মারাত্মক। অনুপ্রেরণাপন্থী উপলব্ধি করে মানুষ অনুভূতিহীন অনাধ্যাত্মিক জীব নয়; দেহ প্রাণের ঊর্ধ্বে তার আত্মা–জীবনের সর্বময় প্রভু; ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এই আত্মার আদেশই তার মান্য, অন্য আদেশ মৃত্যুর কারণ।

এই আন্তরিক পার্থক্যের দরুন উপরোক্ত দু'ধরনের মানুষের কার্যকলাপেও বিস্তর প্রভেদ। অনুপ্রেরণাপন্থী চলে চক্ষুষ্মান মানুষের মতো সজীবত্বের আনন্দে আপনার পথ আপনি নির্বাচন করে; সন্ধানী সে; 'know thyself' নিজেকে জান–এই হলো তার মন্ত্র। সুতরাং সুপ্তভাবে নয়, জাগ্রত ভাবে আত্মার চৈতন্য-সুধা পান করতে করতে নিজের ও জগতের পরিচয় লাভ করা হলো তার ধর্ম। আদেশপন্থী কিন্তু চলে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে আদেশের যষ্টি হাতে করে। কোনো প্রকারে সংসার-পথ চলা তার হয় বটে, কিন্তু সে চলায় না আছে চক্ষু খুলে নিজের ইচ্ছা মতো এগিয়ে চলার আনন্দ, না আছে জগতের ও জীবনের অনির্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি। কোনো প্রকারে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে কাল কাটানোই তো জীবন নয়; জীবন মানে অনন্ত সম্ভাবনা-পূর্ণ আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি, আর নানা ভাবে সে-অস্তিত্বের বিকাশ–অন্ততঃ বিকাশের অকপট চেষ্টা। এই অস্তিত্বের বিকাশের পথেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি যা জগৎকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে মানুষের জ্ঞান ও প্রেমের পথ সুগম করে দেয়। মানুষের অন্তরে যে অনুভূতির প্রেরণা নানা ভাবের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাই নিজেকে সার্থক করে চলে। স্থাণুত্ব নয়, গতিশীলতাই তার প্রাণ, প্রকাশই তার মূল মন্ত্র। অন্তরে যা উপলব্ধি, বাইরে প্রকাশিত হয়ে তাই সৃষ্টির নামে অভিহিত। সুতরাং এক হিসেবে কমবেশী সমস্ত মানুষই স্রষ্টা–সৃজনেচ্ছাই তাদেরকে পশু থেকে পৃথক করেছে।

কিন্তু আদেশপন্থী মানুষেরা এই সৃজনেচ্ছাকে টুটি চেপে মারবার জন্য প্রস্তুত। কেননা, আদেশপন্থী অনুকারক, আর অনুকারক নিজে যেমন সৃষ্টি করতে পারে না, অন্যের সৃজন ক্ষমতায়ও সে তেমনি আস্থাবান নয়। বাইরের অনুজ্ঞার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে করতে অন্তরের সহজ উপলব্ধি হারিয়ে বসেছে বলেই আদেশপন্থী সৃজনশক্তিহীন, আর অন্তরের স্বাভাবিক অনুভূতি হারায় নি বলেই অনুপ্রেরণাপন্থী স্রষ্টা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। –বাবর, আকবর, শা'জাহাঁ, হারুন-অল্-রশিদ ও আল্‌মামুন প্রভৃতি বাদশা, আর হাফেজ, সাদী, ইব্‌নে রোশদ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি কবি-দার্শনিক শুধু মুসলিম ইতিহাসে নয় জগতের ইতিহাসে গৌরবান্বিত স্রষ্টার পদের অধিকারী। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে এসব মহারথীগণও আদেশপন্থী নন অনুপ্রেরণাপন্থী–জীবনের সর্বত্র না হলেও যেখানে তাঁরা স্রষ্টা সেখানে। ধরুন তাজস্রষ্টা শা'জাহাঁর কথা। যেখানে শরীয়তের আদেশ নিষেধ তিনি মেনে চলেছেন সেখানে তাঁর সৃষ্টির পরিচয় নেই, আছে সেখানেই যেখানে শাস্ত্রকে ডিঙ্গিয়ে অন্তরের ইঙ্গিতকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। মর্মর-স্বপ্ন তাজমহলের পানে তাকিয়ে এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। তাজ-সৃষ্টির পিছনে যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি বিদ্যমান, সৌন্দর্যপ্রেমিক শা'জাহাঁ যদি শাস্ত্রের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি খুঁজতে যেতেন তা হলে 'কালের কপোল তলে', 'শুভ্র সমুজ্জ্বল,' এ তাজমহল দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হত কি না সন্দেহ।

প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের পানে তাকালেও ঠিক এই এক সত্যই উপলব্ধি করা যায়–অনুপ্রেরণাপন্থীই সৃজনধর্মী, আদেশপন্থী নয়। মহাত্মা রামমোহন রায়ের পূর্বের শাস্ত্রসর্বস্ব বাংলা আর বর্তমান যুগের অনেকটা শাস্ত্রশাসনমুক্ত বাংলার তুলনামূলক সমালোচনা করলেই কথাটির সত্যতা সহজবোধ্য হবে। আদেশপন্থী পোপদের রাজত্বে জগৎ কি মহান সৃষ্টির অধিকারী হয়েছে অতীতের কুষ্টি ঘেটে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তা জানতে হয়। কিন্তু Renaissance-এর আমল থেকে আজ পর্যন্ত যেসব দানে জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে নিতান্ত অনৈতিহাসিকের কাছেও তা অবিদিত নেই।

আদেশপন্থা একটি জাতিকে কী ভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় বাংলার মুসলমান সমাজের পানে তাকালেই তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের সমাজ যে সব দিক দিয়ে দরিদ্র, কোনোরকমের নব-সৃষ্টির কাজেই যে তারা হাত দিতে পারছে না, মনে হয়, সমাজে আদেশপন্থী মানুষের প্রাচুর্য ও প্রাধান্যই তার কারণ। অন্তরের আদেশ মেনে চলা তো দূরের কথা, অন্তরের আদেশ বলে যে একটা আদেশ আছে,–ঐ কথাটাই সমাজের শতকরা নিরানব্বই জনের কাছে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। সত্য বলতে কি, শাস্ত্রের প্রাধান্য আমাদিগকে মন ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন করে রেখেছে। অন্তরের শুভ বুদ্ধিকে নয়, শাস্ত্রকেই আমরা কল্যাণ-পথের একমাত্র দিশারিরূপে গ্রহণ করেছি। এটাও একপ্রকার দাসমনোভাব, আর এই দাসমনোভাবই চিৎ-শক্তিতে জড়ত্ব আনয়ন করে আমাদের স্বাভাবিক ধর্মবোধটির বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। এই জন্যই আদেশ-প্রধান ধর্মকে বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম বলতে চাই। চিৎ-শক্তি নষ্ট ক'রে যা জড়ত্ব আনয়ন করে তাকে বস্তু-তান্ত্রিক ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।

'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ'। কিন্তু এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের উপর মানুষ আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে কই? আত্মা যে তার পঙ্গু, আদেশ ছাড়া এক পা নড়াও তার পক্ষে অসম্ভব। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অন্তরে সহজ উপলব্ধি হারিয়ে সে পেয়েছে কতকগুলি বাইরের শুকনো-নীতি, যার উদ্দেশ্য হলো কোনোপ্রকারে মানুষকে সৎপথে রাখা। কিন্তু বাইরের নীতির দ্বারা মানুষকে সৎপথে রাখবার চেষ্টা বোতল বোতল কডলিভার অয়েল খাইয়ে দুর্বল শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টার মতোই দুরূহ। কডলিভার অয়েলে যার স্বাস্থ্য ফেরে, জানতে হবে, তার শরীরে এমন কোনো স্বাভাবিক উপাদান বিদ্যমান কডলিভারের সহয়াতায় যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে মাত্র। বাইরের আদেশের

দ্বারা শাসিত হয়ে শ্রেয় পথ চলা অনেকটা নাক-চোখ টিপে কুনাইন গেলার মতোই কষ্টদায়ক। জোরজবরদস্তির কাজে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যের অভাব, নীতিশীলদের জীবনে তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। তাই শ্রেয়ান্বেষণকে স্বভাবে পরিণত করা, অথবা শ্রেয়কে প্রেয়ে পরিণত করাই আমাদের কর্তব্য।

'পরাণ যা চায় তাইতো পরম
সহজ ফেলে কোথায় ধরম।'

প্রাণের এই অবস্থা-প্রাপ্তির জন্যই তো মানুষের যতো তপস্যা, সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষা।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হচ্ছে 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।' দেখা যাচ্ছে এই প্রার্থনাই আমাদের জন্য হারাম, নিষিদ্ধ। অন্তরকে বিকশিত না করে চেপে মারবার জন্যই আমরা বেশী প্রস্তুত। একটা সম্প্রদায়ের পক্ষে এ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যবস্থা। তবে প্রশ্ন হতে পারে–মানুষের অন্তর কি ভুল করে না, আর শাস্ত্রের আদেশের পেছনে কি কোনো শুভ-ইচ্ছা নেই? –উত্তরে বলতে চাই,–অন্তরের পক্ষে ভুল করা অসম্ভব নয়, আর শাস্ত্রের পেছনেও শুভ-বুদ্ধি বর্তমান। কিন্তু তাতে আসে যায় কি। অন্তর ভুল করলেও তাই মানুষের জন্য সত্য। হোঁচট খেতে খেতেই শিশু হাঁটতে শেখে আর ভুল করতে করতেই মানুষ সত্যে পৌছে। অবশ্য সত্যে পৌছবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ভুল করাই তার সার হয়, সত্যে পৌছা আর হয়ে ওঠে না। গ্যাটে বলেছেন—All your ideals shall not prevent me from being genuine and good and bad like nature–দার্শনিক কবির এই বীর্যবন্ত বাণী অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য; অকুতোভয় সন্ধানী মানুষের এই চরম আদর্শ।

শাস্ত্রের পেছনে যে শুভ-বুদ্ধি বর্তমান তা অস্বীকার্য নয়। মানব-মঙ্গল ও লোকস্থিতির দ্যোতনায়ই শাস্ত্রের সৃষ্টি। কিন্তু অন্তরকে প্রাধান্য না দিয়ে শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছি বলে এই শুভবুদ্ধিটুকুও আমাদের অনুভবে আসে না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের কথা না হয় বাদই দিলাম, সাধারণ জাগতিক ব্যাপারগুলিও শাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে না। সঙ্গীত-চর্চা করতে চাও, খোঁজ শাস্ত্রের আদেশ; ছবি আঁকবে, দেখ শরীয়ত কি বলে; অনেকের দৃষ্টি আবার এমনি আচ্ছন্ন যে, গল্প-কবিতা লেখা সম্বন্ধেও তারা শাস্ত্রের অভিমত প্রয়োজনীয় মনে করে। কেননা তাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। স্বীকার করি স্থূলবুদ্ধি–সাধারণ মানুষের জন্য আদেশের দরকার আছে। সাধারণ মানুষ তো সব সময়ই পৌত্তলিক; শাস্ত্র অথবা মূর্তির সামনে অবনত মস্তক হওয়া তার স্বভাব। সহজ পথের যাত্রী সে। আত্মনির্ভরতার দুরূহ ভার মাথা পেতে নেওয়া তার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তাই নির্ঝঞ্ঝাটে সহজ জীবন যাপনের জন্য শাস্ত্রকে সে একান্তরূপে গ্রহণ করে; ভাবে শাস্ত্রকে জীবন-তরীর কর্ণধার করে দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভবনদীর পরপারে পৌছবে। কিন্তু জানে না যে, জীবন-তরীর কর্ণধার তো মানুষ নিজেই, যাত্রীও সে নিজে; ঘুম নয় জাগরণই তার ললাটের লিপি।

না হয় ধরে নিলাম উপলব্ধিহীন সাধারণ মানুষের অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, উপলব্ধি যেখানে সজীব সেখানেও চলে সমাজের শাসন এই সজীবত্ব নষ্ট করবার জন্য। বার্ক বলেছেন : The days of dragooning and inquisition are gone,–কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী আত্মা হয়তো স্বর্গ হতে দেখতে পাচ্ছে, তাঁর মতো ভ্রান্ত, ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ধরনে বাংলার সমাজবিশেষে তারা এখনো বিরাজিত। মনে হয় এই অতিরিক্ত শাস্ত্রানুগত্যই মুসলমানসমাজের অবনতির প্রধান

কারণ। একটা জাতি গৌরবান্বিতভাবে বাঁচবার জন্য বৃহৎ-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের দরকার। শাস্ত্রানুগত্য এ ধরনের মানুষ সৃষ্টির পরিপন্থী। বৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ গতানুগতিক পথের যাত্রী নন–নিত্য নতুনের অভিসারে তাঁর যাত্রা। কিন্তু শাস্ত্র গতানুগতিক পথেরই জয় ঘোষণা করে। গতানুগতিক-পন্থী বলেই আজ আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হচ্ছে না।

বিজ্ঞান তর্কবুদ্ধির পরিণতি, আর সাহিত্য প্রেরণার। বিজ্ঞানের কথা বলবার অধিকারী আমি নই। সাহিত্যের কথাই বলছি। জগতের সম্পর্কে এসে অন্তরে যে-সব অনুভূতির সঞ্চার হয়, দরদ ও কল্পনার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে তাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবি বিশ্বচিত্তের দূত, আর সাহিত্যিক অর্থাৎ গল্পকার ঔপন্যাসিক প্রভৃতি মানবমনের রহস্যের সন্ধানী। এঁদেরকে একটা বিশেষ মতের, বিশেষ আদর্শের প্রচারক হতে বললে আত্মহত্যা করতেই বলা হয়। একটা মুক্ত পরিবেশের মধ্যেই এঁদের প্রতিভা স্ফূর্তি পায় ভালো। শাস্ত্রের সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্বন্ধ কি–সেক্সপিয়র, কালিদাস, হাফেজ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিক শাস্ত্রকে কি নজরে দেখেছেন, তা জানলেই বুঝা যাবে। যতদূর মনে হয়, আত্মার স্বাভাবিক রসবোধকে প্রাধান্য দিয়ে শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রের যেটুকু তত্ত্ব সেটুকুই তাঁদের গ্রাহ্য, বাকীটুকু বর্জনীয়। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কি, বিশ্বপতির সাযুজ্য ও সারূপ্য লাভের উপায় কি, এ-সব অন্তরোত্থিত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মাননীয় পূর্বপুরুষগণ যে-সব মীমাংসা রেখে গেছেন, জীবনপথের মহোপকারী পাথেয়রূপে তাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্র যেখানে বিশ্ব-সত্যের প্রকাশক সেখানে তাঁরা নতমস্তক, আর যেখানে শুদ্ধ আচার-পদ্ধতির স্রষ্টা সেখানে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতেও কুণ্ঠিত নন। বস্তুতঃ শাস্ত্র নয়, হৃদয়বৃত্তিই সাহিত্যের উপজীব্য। একজন কবির উক্তিই বলছি–

"কাব্য-কোকিল ডাক্‌লে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠ্‌বে,
তালি দেওয়া কাঁথার কদর ফাগুন এলেই টুট্‌বে।
কবি হয়ে জন্মেছে যে হৃদয়-রীতির ভক্ত,
শাস্ত্র মানা কানার মত একটুকু তার শক্ত।
সত্যিকারের কবি কবে শাস্ত্র মেনে চলছে,
'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম' শাস্ত্রই এ বলছে।
শাস্ত্র বাঁচুক কিংবা পচুক ভাবনা কিছুই নাইকো,
মানুষ বাঁচুক, বাঁচুক হৃদয়, আমরা ইহাই চাই গো।"

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

সমগ্র সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের মর্মোক্তিটিই ব্যক্ত হয়েছে এ কটি লাইনে। ইরানের বুলবুল হাফিজের মধ্যে এ ধরনের লাইনের প্রাচুর্য্য....নয়।

"খামখা তুমি মরছ কাজী ব্যর্থ তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদ্‌খোরের এই আলকিমিরার পাত্র চেটে।"

–এতো তাঁর নিজের অথবা তাঁর দলের লোকেরই কথা।

আদেশ-পন্থা ও অনুপ্রেরণা-পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর এক প্রকার লোক আছে যাদের নাম দেওয়া যেতে পারে যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থী। এরা

শাস্ত্রের একটি বিশেষ মতকে মেনে নিয়ে সেই মেনে নেওয়া মতটিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক মতের পক্ষেই কিছু না কিছু বলা যায়। যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থীও তার স্বমতের পক্ষে অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, যুক্তির চাইতে গোঁজামিলই দেয় তারা বেশী। শাস্ত্রের মধ্যে বর্তমানে যে সব মত দেখতে পাওয়া যায়, যদি তাদের ঠিক উল্টা মতও থাকতো তা হলে সেগুলি সম্বন্ধেও যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে তারা কুণ্ঠিত হতো না। আগে যুক্তি পরে মেনে নেওয়া নয়, আগে মেনে নেওয়া পরে যুক্তি করাই তাদের স্বভাব। সত্যে পৌছবার পথে এ কিন্তু মস্ত অন্তরায়। এর দ্বারা শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থী মুক্তি চায় না,–চায় বন্ধন-পাশ একটু শ্লথ করতে। এ কিন্তু আরো মারাত্মক; কেননা এ বন্ধন-বোধ নষ্ট করে দেয়। বন্ধন আছে অথচ বোধ নেই, একি ভয়ঙ্কর অবস্থা নয়? যুক্তিবাদী শাস্ত্রপন্থীরাও আদেশভক্ত, তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু যুগোপযোগী concession-এর অভিলাষী। জীবনকে নয়, শাস্ত্রকেই এরা বড় করে দেখে। এদের বুঝা উচিত, জীবনরাজের দরবারে শাস্ত্র আসতে পারে শুধু মন্ত্রী হিসেবে। মন্ত্রণা দেবার অধিকার তার আছে, কিন্তু শোনা না শোনা রাজার খুশী। রাজার নিজের বিবেচনাই প্রধান, মন্ত্রীর মন্ত্রণা সেই বিবেচনা গঠনে কিছু সহায়তা করে মাত্র। এখানে বাংলার এক চিন্তাশীল লেখকের একটি উক্তি মনে পড়ছে। উক্তিটি এই : 'কোরাণ ও হজরত মোহাম্মদকে শুধু ভালবাসলেই কাজ হয় না, জীবন-রহস্যের সমাধানের দিক থেকে যদি এই ভালবাসার উদ্ভব হয় তবেই কোরাণ ও মোহাম্মদ-প্রীতি থেকে সত্যিকার কল্যাণ সম্ভবপর। অন্য কথায় জীবন-রহস্যের বোধই আমাদের ভিতর প্রবল ভাবে চাই, তারই আনুসঙ্গিকভাবে আসবে কোরাণ, রসুল, সুফিসাধনা।' যথেষ্ট প্রণিধান করে দেখবার মতো কথা এটি। বাস্তবিক, শাস্ত্রের প্রাধান্য হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করে না, ঘনীভূতই করে। এ স্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন–'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়। .....যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতে পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুলছে। –অন্যান্য বিষয়ের মতো ধর্ম ব্যাপারেও মৌলিক হতে না পারলে বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। সত্যকার ধার্মিকের ধর্ম বাইরের থেকে পাওয়া নয়, সে তাঁর নিজেরই এক সৃষ্টি–তাঁর কল্পনা, তপস্যা, মহৎ ও সুন্দর হবার বাসনা, কাজ করছে এর পেছনে। সে এক সজীব জিনিস।'

যাক্, এখন উপসংহার করছি। দুঃখরজনীর অবসানে একটি নব-জীবনের রাঙা প্রভাত দেখবার জন্য আমরা সকলেই উদগ্রীব। চারদিকে আমাদের নব-জীবনের চাঞ্চল্য, চারদিকে সমাজের উন্নতির জন্য শতমুখী আলোচনা। কিন্তু অন্তরের শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতকে সফল করবার চেষ্টা না করে শাস্ত্রকেই একান্ত করে গ্রহণ করলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'আকল্‌মন্‌দ্ বা ইশারা বস্ আস্‌ত্,–অন্তরের ইশারাকে যেন আমরা জীবনে ব্যর্থ করে না দিই। আমাদের নতুন করে ভাবা উচিত–মানুষ একটি

মাংস-পিণ্ড নয়; তার আত্মা আছে, মন আছে, নিজের পথ নিজে বেছে নেবার শক্তি আছে, ভিতরকার আদেশই তার জন্য সত্য, বাইরের আদেশ তাকে মরণ পথেই টেনে নেয়, সমাজের সামনে আদর্শরূপে স্থাপনযোগ্য এর চাইতে বড় কথা কি হতে পারে আমাদের জানা নেই।

আরেকটা কথা। ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্যেও অন্তরের আদেশের দিকে আমাদের বেশী নজর দেওয়া দরকার। এক শাস্ত্রের আদেশের সঙ্গে অন্য শাস্ত্রের আদেশের প্রভেদ কম নয়, আর এই প্রভেদের দরুনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানলে পৃথিবীর শান্তি বিপর্যস্ত। আত্মার স্বধর্মে মানুষ মানুষের আত্মীয়। সুতরাং শাস্ত্রানুগত্য নয়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মোপলব্ধিই পৃথিবীকে সাম্য-মৈত্রীর পুণ্য মন্দিরে পরিণত করতে পারে। সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দরতর করবার এই-ই সহজতম পন্থা।[১]

১. ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

মধ্যশিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা

দিব্যি আরামে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাল কাটাইবার দিন আর নাই। এখন আমরা প্রায় সকলেই কম-বেশী আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছি। এই আত্মসচেতনতার পেছনে রহিয়াছে আমাদের শিক্ষা। শিক্ষা আর যাই না করুক, জীবনযাত্রার আদর্শ সম্বন্ধে যে আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া দিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। এখন আমরা কেহই আর জীবনকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই না, সকলেই বাঁচিতে চাই–জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করিতে চাই।

কিন্তু বাঁচিতে চাহিলেই তো বাঁচা সম্ভব হয় না, পথে বিস্তর বাধা। সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নির্ঝরিণীর মতো নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া ছুটিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের চেহারায় অতৃপ্তির আভাস সুপরিস্ফুট–কেমন এক বিতৃষ্ণায় আমাদের ললাট ও নাসিকা কুঞ্চিত। আমরা সকলেই মুখে, না হউক, অন্তত চেহারা দিয়া যেন বলিতেছি–না মশাই, কিছুই ভালো লাগিতেছে না, যেমনটি হইতে চাহিয়াছিলাম তেমনটি আর হইতে পারিলাম কই? এই দুঃখ আবার তাহারই বেশী যে, হতভাগা শিক্ষাকে শুধু মস্তিষ্কে গ্রহণ না করিয়া জীবনে প্রয়োগ করিতে উৎসুক। জ্ঞানবৃক্ষের ফল গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে বেচারী চিরদিনের জন্য শান্তিস্বর্গ হইতে বিচ্যুত।

এই অতৃপ্তি ন্যায় কি অন্যায়, ভালো কি মন্দ সেই বিষয়ে বিশেষ যুক্তি-তর্ক খরচ না করিয়া শুধু এই মাত্র বলিতে চাই যে, অতৃপ্তি থেকেই যখন নবসৃষ্টির সম্ভাবনা; তখন যতই তিক্ত হউক না কেন, তাহাকে জীবনে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

অতৃপ্তির বিশেষত্ব এই যে, তাহা প্রশ্নকারী ও বিশ্লেষক। সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি সমস্ত কিছুকেই তাহা ভাঙ্গিয়াচুরিয়া তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতে চায়, কোনো কিছুকেই অমনি বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিতে চায় না। সুতরাং এতদিন শিক্ষালাভের পরেও যখন আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখা দিল না, তখন আমাদের অতৃপ্ত চিত্তের দৃষ্টি যে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। শিক্ষা জীবনের গোড়ার কথা; সুতরাং আগায় জল না দিয়া যে আমরা গোড়ায় জল দিতে চাহিতেছি তাহাতে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হইতেছে। বস্তুতঃ আমাদের জীবনের বিফলতার জন্য শিক্ষা যতটা দায়ী আর কিছুই ততটা নয়। শিক্ষা আমাদিগকে দস্তুর মতো প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি কত। প্রথমেই মনে হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মননশক্তি ও বিচারবোধের উন্মেষসাধক, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। অন্ধতা, কুসংস্কার, দলীয় মনোভাব (herd-instinct) ইত্যাদি অশিক্ষিতজনোচিত মানসিকতার প্রভাব আমাদের জীবনে এখনো পুরামাত্রায় বিদ্যমান। সত্য বলিতে কি, শিক্ষা আমাদিগকে পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হয় নাই, যাহা ছিলাম তাহারই উপর কিছুটা রঙ ফলাইয়াছে মাত্র। কিছু ইংরাজি বলা ও একটু চটপটে হইয়া চলা, এই যেন আমরা মনে করিতেছি শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কিন্তু অতৃপ্তিবাণবিদ্ধ হইয়া আমরা এতটা ছটফট করিতেছি যে, আমাদের দৃষ্টি যেখানে পড়া উচিত সেখানে পড়িতে না দিয়া অন্যত্র পড়িতে দিতেছি। শিক্ষার এতসব প্রধান প্রধান ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টি পড়িল কিনা তাহার আহার-সংস্থানের অক্ষমতার উপর। আমাদের ভাবখানা এই রকম যে, শিক্ষা হইতে মনের আহার যাহা লাভ করিবার তাহা আমরা করিয়াছি, এখন পেটের আহার হইলেই ব্যস। (এই মনোভাব নিন্দনীয় নয়; বরং এক হিসেবে প্রশংসনীয়। কারণ তাহা আমাদিগকে এক বিরাট কপটতা ও মিথ্যাচার হইতে মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছে। বড় বড় আধ্যাত্মিক কথার আড়ালে আমরা যে-সাধারণ বুভুক্ষু মানুষটিকে লুকাইয়া রাখি তাহা এই মনোভাবের মধ্য দিয়াই প্রথম সুস্পষ্ট আলোকে মুখ বাহির করিল। আর আমরাও নিজদিগকে সত্য ভাবে চিনিবার সুযোগ লাভ করিলাম।) সুতরাং রব উঠিয়াছে, শিক্ষাকে অর্থকরী করিয়া তোল–বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বৈশ্য-বিদ্যালয়ে পরিণত না করিলে আর আমাদের নিষ্কৃতি নাই। শুধু কলমবাজ হইলে চলিবে না, দস্তুরমতো তুরপুর ও মাকু-চালনাতে দক্ষ হওয়া চাই।

কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মতো। এই বৈশ্যযুগে সকলকেই কিছুটা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যুগের ছাপ যাঁহার গায়ে না লাগে তিনি হয়তো মহাপুরুষ, কিন্তু শিক্ষার্থী মাত্রকেই যে অসাধারণ মহাপুরুষ হইতে হইবে তাহার কোনো হেতু নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আমরা যে-পথে চলিতে চাই–সেপথ আমাদিগকে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে কিনা।

বলাবাহুল্য, পেটের আহার আমরা চাই। তাহা ছাড়া আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের কিছু মিস্ত্রিবিদ্যা, বয়নবিদ্যা শিক্ষা নিলেই যে দৈন্যদুর্দশা দূরীভূত হইয়া আমরা রাতারাতি ফাঁপিয়া উঠিব এমন তো মনে হয় না। আমাদের দেশের তাঁতি, সুতার ও অন্যান্য কুটিরশিল্পীগণ যখন অর্ধাহারে ও অনাহারে কালাতিপাত করিতেছে তখন উক্ত পন্থাকে কিছুতেই সুচিন্তিত পন্থা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বরং মনে হয়, তাহাতে বেকার সমস্যা আরো ঘোরতর রূপ ধারণ করিবে। কারণ তাহাতে শিল্পীর সংখ্যা কর্মের অনুপাতে অনেক বাড়িয়া যাইবে বলিয়া তাহাদের প্রাপ্তি অনেক কমিয়া যাইবে; এবং অনেকের ভাগ্যে কাজ না জোটার দরুন প্রাপ্তির ঘরে শূন্য থাকিবে। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী হইলে যে-অবস্থা হয় তাহাই হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি :– আমরা বর্তমানে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছি। কিন্তু ভুলিয়া যাইতেছি যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও এক সময়ে বৃত্তিসূচক* শিক্ষার অনুরূপই ছিল–তখন কেরানি-সৃষ্টি করাই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়া যাওয়ার দরুন এখন তাহার 'ভোকেশনালত্ব' দূরীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শিক্ষিত হইলেই এখন আর কেরানিগিরি সহজলভ্য হয় না। টেকনিক্যালবিদ্যা-জানা লোকদের বেলাও অনুরূপ ব্যাপার ঘটা অসম্ভব নয়। অতএব শিল্পী-সৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর না দিয়া শিল্পকার-সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়াই বর্তমানে আমাদের কর্তব্য। দেশের বুকে শত শত কলকারখানা স্থাপনের ভিতর দিয়া যাহাতে অসংখ্য কর্মের সৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই যেন আমাদের সকল ইচ্ছা ও উদ্যম ধাবিত হয়। কর্মের সৃষ্টি হইলে কর্মী আপনা হইতেই দেখা দিবে, কর্মীর সৃষ্টি হইলে কর্ম নাও দেখা দিতে পারে। য়ুরোপে টেকনিক্যাল স্কুলের ছড়াছড়ি তাহারও হেতু এইখানে যে, সেখানে অসংখ্য কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে।

---

* Vocational education–এর বাংলা সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা করা হয়। কিন্তু তাহা ভুল। কারণ বৃত্তি শিক্ষার মূলে থাকে না, বরং শিক্ষা বৃত্তির সূচনা করে।

সেগুলির পেট পুরাইবার জন্যই ঐ টেকনিক্যাল বিদ্যালয়গুলি প্রতি বৎসর অজস্র কর্মী সৃষ্টি করিতেছে। কলকারাখানা বা ফ্যাক্টরী স্থাপনের কোনো রাষ্ট্রিক অসুবিধা আছে কি না জানি না। থাকিলে তাহা দূরীভূত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কৃপা ব্যতীত কখনো আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যে-প্রকারেই হোক, রাষ্ট্রের কৃপাদৃষ্টি আমাদের লাভ করতেই হইবে। নইলে মুশকিল আসান অসম্ভব।

তবে বিদ্যালয়ে যে টেকনিক্যাল এডুকেশনের কোনো প্রয়োজন নাই তাহা নয়। মানস গঠনের জন্য তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন। বুদ্ধিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য কেজো জ্ঞানের নিতান্ত আবশ্যক। পৃথিবীর নবতীর্থস্থান রাশিয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রবর্তিত হইয়াছে–শিক্ষার্থীকে সুপটু ব্যবসায়ী করিয়া তুলিবার জন্য নয়। নানারূপ যন্ত্রপাতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিক্ষার্থী নিজের সৃজনীশক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে এবং বুদ্ধিকে নানাদিক দিয়া খেলাইয়া তুলিতে পারে। তাহাতে অভিজ্ঞতার আনন্দময় উপলব্ধির ভিতর দিয়া সে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। শুধু পুঁথির বিদ্যায় তাহা অসম্ভব। পুঁথির বিদ্যা আমাদিগকে শুধু বাহিরের জ্ঞান দিতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতার আনন্দময় উপলব্ধি নয়। তাই শিশুর চিত্ত যন্ত্রপাতির প্রতি যতটা ধাবিত হয় পুঁথির প্রতি ততটা হয় না। বুদ্ধিকে সক্রিয় রাখিবার জন্য যন্ত্রপাতির সত্যই এক কল্যাণকর অবদান।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মনীষী রাসেল বলিয়াছেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে শিক্ষার্থীর মধ্যে Vitality, courage, intelligence ও sensitiveness এই চারটি গুণ সৃষ্টি করা হয়। এই চারিটি গুণ সৃষ্টি হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল, কেননা তাহা হইলেই শিক্ষার্থী জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করিবার সামর্থ্য অর্জন করিল। তাহার পর সেই গুণরাজি সম্বল করিয়া সে যাহাই করুক না কেন, তাহাতে শিক্ষকের বা শিক্ষাপদ্ধতির কিছুই আসিয়া যায় না। তাহার পর হইতেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শুরু হইল। রাষ্ট্রকে সহায় করিয়া সে জীবনে সার্থক হইল তো ভালোই, না হইলে শিক্ষার ত্রুটি ধরিতে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে successful করিয়া তোলা নয়, মানুষ করিয়া তোলা–অন্য কথায়, বুদ্ধি, বিচারবোধ ও কল্যাণানুরাগে শিক্ষার্থীর চিত্ত ঐশ্বর্যশালী করিয়া তোলা।* একথা অস্বীকার করিয়া success-কেই বড় করিয়া দেখিলে শিক্ষার্থীকে নীতির দিক দিয়া অনেকখানি নীচে নামিয়া যাইতে হয়। কারণ তাহা হইলে তাহাকে এমন কতগুলি জঘন্য মনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় যাহা ব্যতীত সংসারে কৃতকার্যতা লাভ করা অসম্ভব। তোষামোদ, আত্মপ্রচার, গায়ে-পড়া ভাব, বেহায়াপনা, চালিয়াতি ইত্যাদি ব্যতীত যে আজিকার দিনে কৃতকার্যতার মুখ দেখা মুশকিল, দৃষ্টিমান মাত্রই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। অথচ আত্মার অকল্যাণ সাধনের শক্তিতে ইহারা প্রবল–মানুষকে দিন দিন নীচে নামাইয়া অনুভূতিহীন পশুতে

* পৃথিবী যে দিন দিন বিশ্রী হইয়া যাইতেছে তাহার হেতুও এইখানে যে, এই সত্যযুগের মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। মানসিক সৌন্দর্যের সঙ্গে যেখানে গৌরব মিশ্রিত, সেখানেই আমাদের নজর, অন্যত্র নয়। এইজন্য নামের লোভে অনেক সময় আমরা আত্মহত্যা করিয়া বসি। নামের নেশায় মশগুল হইয়া এমনভাবে কাজে লাগিয়া যাই যে, পরিণামে বড় কাজ করিতে সক্ষম হইলেও মনের সূক্ষ্ম ও সুন্দর বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। বড় বড় কাজের পরিবর্তে, আত্মসৃষ্টিকে বড় করিয়া দেখিলে আমরা এই দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। এ সম্পর্কে A.C. Benson-এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :–

পরিণত করিতে ইহাদের মতো দ্বিতীয়টি আর নাই। এই সব জানিয়া শুনিয়াও যদি success-এর bitch goddess-কেই আমরা আরাধ্য করিয়া তুলি, তবে আধ্যাত্মিকতা, নীতি, চরিত্র ইত্যাদি বড় বড় কথাগুলি পাঠ্যপুস্তক হইতে সরাইয়া দিয়া তাহাদের স্থানে উপযুক্ত মনোবৃত্তিগুলির জয় ঘোষণা করাই বাঞ্ছনীয় ; অথবা বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ঐসব বিষয়ের শিক্ষার জন্যও ট্রেনিং ক্লাস খুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে, আর যাই না হোক, দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে। দুই বিপরীত ধরনের শিক্ষা দুই দিকে থাকিয়া একে অন্যকে ঠাট্টা করিতে থাকিবে। শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ ঝোঁকের বশে তাহাও সমর্থন করিবেন কি-না জানি না।

"Our belief in sheer tangible performance is a rather uncivilized thing ; or rather our disdainful neglect of what is merely beautiful dilightful is a dull and barbarous thing."

প্রাথমিক বাংলা গদ্য ও তাহার স্রষ্টাগণ

বাংলা-গদ্যের শুরু হইয়াছে প্রায় দেড়শ বৎসর। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলা-গদ্য সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্যমের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে এই বিস্ময়ের মাত্রা আরো বাড়িয়া যায়।

বাংলা-গদ্য সৃষ্টির কথা মনে হইলেই শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি সহৃদয় মিশনারীদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তাঁহাদের পূর্বে যে বাংলা গদ্য সৃষ্টির কোনোপ্রকার চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে।

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে পর্তুগীজগণ বাণিজ্য-ব্যাপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে বাংলা ভাষার সহায়তা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁহাদের রচনার নিদর্শন সহজলভ্য না হইলেও নানা চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পর্তুগীজ-লিখিত বাংলা রচনাসমূহের মধ্যে মানোয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁওর রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কীট-দৃষ্ট একখানা পুস্তকের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' ইহা ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। মিশনারি বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে একখানা উল্লেখযোগ্য পুস্তক। আস্‌সুম্পসাঁওর অভিধান ও ব্যাকরণখানা পাওয়া যায় না। অভিধানটিতে বাংলা হইতে পর্তুগীজ, পর্তুগীজ হইতে বাংলা ও প্রথম দিকে বাংলা ব্যাকরণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রিয়ারসন সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তোনীয়োর Catechism বা প্রশ্নোত্তরমালা ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানা একজন পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মের বিচার লইয়া রচিত। বইখানা মুদ্রিত হয় নাই। ইহার মূল পাণ্ডুলিপি পর্তুগালের এভোরা নগরে আছে। বইটি রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ। পর্তুগীজ পাদ্রীরা এইরূপই করিতেন।

এই সকল রচনা ঢাকার অন্তর্গত নাগোরিতে রচিত। তাই ইহাদের মধ্যে উক্ত অঞ্চলের উপ-ভাষার মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। প্রশ্নবোধক 'নি'-এবং সমর্থনসূচক ও নিশ্চয়ার্থক 'হয়'–শব্দের প্রচুর প্রয়োগ তাহার প্রমাণ। পর্তুগীজ পাদ্রীদের রচিত বলিয়া উক্ত রচনাসমূহের ভাষায় পর্তুগীজবাক্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে দেশীয় লেখকগণও একেবারে চুপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, বাংলা-গদ্য তখনই সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পূর্ণাঙ্গপ্রায় গদ্য বৈষ্ণব-ভিক্ষুকদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা সমাজের নজরে পড়ে নাই।

পূর্বোল্লিখিত য়ুরোপীয় লেখকগণ সকলেই ক্যাথলিক। প্রটেস্‌টেন্ট লেখকদের মধ্যে 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'র লেখক বেন্‌টো ডি সিল্‌ভেস্‌টারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে 'প্রশ্নোত্তরমালা' ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আরো পরবর্তী কালের রচনা। কারণ, ইহা নিশ্চিত যে

বেন্‌টো Catechist হওয়ার পরে এই পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার উক্ত পদলাভের তারিখ ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৯-এর মধ্যে। (হাইডের মত ১৭৬৬ আর কেরির মতে ১৭৬৮-৬৯।)

তাঁহার পরেই Nathniel Brassey Halhed-এর নাম করা প্রয়োজন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে হেল্‌হেড্ সিবিলিয়ান হইয়া বাংলাদেশে আগমন করেন। কথিত আছে, তিনি কথ্যভাষা এতটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, গ্রামের ভিতর দিয়া বাঙালীর বেশে ঘুরিয়া আসিলে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিত না। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরাজিতে 'Grammar of Bengali Language' রচনা করেন। বাংলা ভাষার প্রথম বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকানুন বলিয়া এই পুস্তকের বিশেষ মূল্য। প্রসঙ্গত বলা উচিত, এই সময়ে বাংলাদেশের Coxton চার্লস উইলিকিনসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলা-হরফ-যুক্ত মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না হইলে এই পুস্তকের মুদ্রণ সম্ভব হইত না। উইলকিনস বাঙালী কর্মকার পঞ্চাননকে বাংলা-হরফ-নির্মাণ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলেন।

পরবর্তী পুস্তকসমূহের মধ্যে H. P. Forster-এর Vocabulary অন্যতম প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহা বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান। বাংলা গদ্য রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া এ-স্থলে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। Cornwallis Code of 1793 পুস্তকখানিও Forster-এর অনূদিত।

ইহার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মিশনারীদের দ্বারা রীতিমত বাংলা-গদ্যের চর্চার শুরু হয়। এই উপলক্ষে উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ও উইনিয়ন ওয়ার্ডের নাম স্মরণযোগ্য। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কেরি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মালদহের নিকটবর্তী মদনাবতী নামক গ্রামে কোনো নীলকুঠিতে চাকুরি লাভ করিয়া বাইবেল তর্জমার কাজে লাগিয়া যান। বহুদিন পরিশ্রম করার পর উক্ত কার্য সম্পাদিত হয়। তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রভৃতি বিলাত হইতে আগমন করেন। সহানুভূতিহীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ করিতে অসুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা ডেনিশ পতাকার নিচে শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য শুরু করেন। তাঁহাদের প্রচারোদ্যমের ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের চাইতে বাংলা ভাষারই যে অধিকতর লাভ হইয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইবার পর হইতে আরো ব্যাপকভাবে বাংলা-গদ্যের চর্চা শুরু হইল। যদিও দেশী-পোশাকে পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা ও প্রচারের জন্যও ইহা কম চেষ্টা করে নাই। দেশী ভাষা, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে বাংলা-গদ্য এতটা নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হইয়াছিল যে, ইহাদের সম্পাদিত পুস্তক এইসময়ে দেশবাসীর রস-পিপাসা মিটাইবার সামর্থ লাভ করিয়াছিল।

শিল্প-সম্মত উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিবার প্রতিভা না থাকিলেও, জনসাধারণকে শিক্ষাবিষয়ে প্রেরণা দানের ব্যাপারে কেরি অদ্ভুত-ক্ষমতাসম্পন্ন লোক ছিলেন। যে-সকল পণ্ডিতকে তিনি প্রথমে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সেইসব লোককেই অনুশীলন-ব্যাপারে উপদেশ দিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রেরণা ও উপদেশে যাহা রচিত হইয়াছিল তাহা বাদ দিলেও, কেরি নিজে যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহাও নগণ্য নহে। তবে কেরির প্রতিভা ও উদ্যমশীলতা বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ-প্রণয়নে যতটা প্রকাশিত হইয়াছিল, আর কোথাও ততটা প্রকাশিত হয় নাই।

কেরি সর্বপ্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা না গেলেও বাংলা ভাষার চর্চা করিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহায়তা ব্যতীত

চলা অসম্ভব। তাই তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় রত হন এবং কঠোর পরিশ্রমসহকারে অল্পদিনের মধ্যে উক্ত ভাষায় অসাধারণ অধিকার লাভ করেন।

হেল্‌হেডের গ্রামারের ২৫ বৎসর পরে কেরির গ্রামার প্রকাশিত হয়। কেরি হেল্‌হেডের পুস্তক হইতে নানা বিষয়ে সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেরির গ্রামারকে একখানা বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক রচনা বলা যাইতে পারে। তাঁহার গ্রামারে ত্রুটি এত সামান্য যে তাহা লক্ষ্য না করিলেও চলে। Syntax প্রকরণে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হয় নাই, সেই জন্য একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বইখানা যে একখানা মূল্যবান পুস্তক, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

উপরে যে Syntax-এর উদাহরণের অল্পতার কথা বলা হইয়াছে, তাহারই প্রতিকারস্বরূপ যেন তিনি 'কথোপকথন' লেখেন। ইহাতে চলতি বাংলা বুলি (Idiom) ও বাক্যরীতির প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তাহাতে অর্ধনাটকীয় পদ্ধতিতে তৎকালীন সমাজের যে চমৎকার ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহাও উপভোগ্য। সাহেব, জমিদার, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, পুরোহিত–সমাজের সকল স্তরের লোকের ছবি ও কথাবার্তা তাহাতে পাওয়া যায়। কেরি যে গর্ব সহকারে বলিয়াছিলেন : I may say indeed that their manners, customs, habits and sentiments are as obvious to me as if I was myself a native"– 'কথোপকথনে' তাহার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণের চরিত্র ও ভাষাজ্ঞানহেতু তাঁহাকে টেকচাঁদ ও দীনবন্ধু মিত্রের 'spiritual father' বলা হইয়া থাকে।

১৮১২ সালে কেরির 'ইতিহাসমালা', ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে 'A Dictionary of the Bengali Language' প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালার ভাষা সহজ ও বিশুদ্ধ ভাষার নিদর্শন। কথ্য ভাষার মিশ্রণ ইহাতে নাই। ইহার ভাষাকে তৎকালীন Standard Bengali বলা যাইতে পারে। কেরির অভিধানটি সাহিত্য-চর্চার ব্যাপারে অনেককে সহায়তা করিয়াছিল।

কেরি নিজেকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতে 'plodder' বা 'নিত্য-আয়াসশীল' বলিয়াছেন। কিন্তু অনবরত বিভিন্ন দিকে শক্তি চালনা করা যে যথার্থ শক্তিমানের কাজ, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাষাবিদ হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহার কোনো গ্রন্থকে 'প্রতিভার সৃষ্টি' (work of genius) বলা না গেলেও 'কথোপকথনে' তাঁহার যে মৌলিক রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, চেষ্টা করিলে হয়তো তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারিতেন। নাট্যকারের শিল্প-ক্ষমতা না থাকিলেও, objective দৃষ্টিভঙ্গি 'কথোপকথনে' সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই হিসাবে তাঁহাকে নাট্য-সাহিত্যের তথা কথা-সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কেরি আনন্দ অথবা প্রশংসা লাভের আশায় গ্রন্থ রচনা করিতেন না, গ্রন্থ-রচনার দ্বারা জনসাধারণের উপকার করিতে পারিবেন, এই বোধের প্রেরণায়ই করিতেন। অন্য কথায়, গ্রন্থ রচনা, তাঁহার কাছে কোনোপ্রকার খেয়াল বা কল্পনা প্রকাশের উপায় ছিল না, মানবসেবার উপায় মাত্র ছিল। সৃজনী-শক্তির অধিকারী না হইলেও 'জ্ঞানের পুনরুৎপাদক' (reproducer of knowledge) হিসাবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলা-গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন ও অন্যের দ্বারা যাহা করাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। (এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য, কেরি যে শুরু গরজের খাতিরে বাংলা ভাষার চর্চা করাইয়াছিলেন, তাহা নহে। শুরুতে প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলেও পরবর্তীকালে সত্যসত্যই তিনি 'beautiful language of Bengal-এর প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

আর প্রেমই তাঁহার আভ্যন্তরীণ শক্তিকে খেলাইয়া তুলিয়াছিল।

কেরির পরে রাম বসুর নাম করা যায়। তিনি অতি অল্প বয়সে আরবী ও ফার্সী ভাষায় পূর্ণ অধিকার লাভ করেন এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও সাধারণভাবে পরিচিত হন। কেরি তাঁহার সম্বন্ধে বলেন : "A more devout scholar than him I did never see". তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতির জন্য তিনি যে কেবল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, রামমোহনের মতো অসাধারণ ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ও 'লিপিমালা' ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র শুধু বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন নহে, ইতিহাস-রচনারও আদি নিদর্শন। তৎপূর্বে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল– যেমন, "চৈতন্য-চরিতামৃত", "চৈতন্য-ভগবত" ইত্যাদি–সেগুলিকে ইতিহাস বলা যায় না। কারণ ইতিহাস-রচনার মালমসলা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ভিতরে ধর্ম ও কাব্যের সুরটি প্রধানরূপে বাজিয়া উঠিয়াছে।

কাহারো কাহারো মতে আবার রামমোহনের 'হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ' আদি গদ্যগ্রন্থ। ইহার রচনাকাল ১৭৯৬ কি ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু এই পুস্তক বন্ধুজনের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং কখনো মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ্য আলোকে বাহির হয় নাই। তাই রাম বসুকেই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও রাম বসুর রচনারীতির উপর যে রামমোহনের অপ্রকাশিত গ্রন্থের ছাপ পড়িয়াছিল, বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই তাহা স্বীকার করেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো মত : রাম বসু তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র'খানা রামমোহনকে দেখিতে দিয়াছিলেন এবং রামমোহন তাহার উপরে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। উইলিয়ম কেরিও এই মতের অন্যতম সমর্থক।

"প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে" যথেষ্ট আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, এবং ইহার কাব্যরীতি অসরল ও জটিলতাপূর্ণ। এই জন্য জে, লঙ ইহার ভাষাকে kind of mosaic বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Unreadable সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেকালের ফার্সী-প্রাধান্যের কথা মনে রাখিলে, এবং রাম বসু যে তাঁহার পুস্তকখানা পারস্য ভাষায় লিখিত কোনো ঐতিহাসিক রচনার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে, রাম বসুকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ যে শুধু ভাষার উপর জবরদস্তি করিয়াছে তাহা নহে, মাঝে মাঝে ইডিয়মের কাজও করিয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। (আরবী-ফার্সীর প্রয়োগকে যে ইডয়ম বলা হইয়াছে, তাহার হেতু আছে। দেশী-শব্দের প্রতিশব্দ থাকে; কিন্তু বিদেশী শব্দের প্রায়ই থাকে না। নতুবা বিদেশী শব্দগুলি অনর্থক আসিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিত না। যেখানে বিদেশী শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় সেখানেও দস্তুর শব্দটিকে এমন অর্থপূর্ণ করিয়া তুলে যে, তাহা সাধারণ প্রতিশব্দগুলি হইতে বিশেষরূপ ধারণ করে। এই প্রতিশব্দহীনতা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিদেশী শব্দগুলি ইডিয়ম-তুল্য।)

রাম বসুর ভাষা সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমতটি প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন: "এটি স্থির কথা 'বাংলা' গদ্যের প্রাচীনতর নমুনা যতই থাকুক না কেন, রাম বসুই আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ছন্দের গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের' মত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক কেহ লেখেন নাই।

পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের একটা খুঁত ধরিয়াছেন,–রাম বসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট ব্যূহের সৃষ্টি করিয়া অনেক স্থলে তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য ও অনায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন,–সে তুলনায় রাম বসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। বিশেষ তিনি যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন, দরবারের চিত্র দিয়াছেন,–সেখানে মুসলমানী শব্দ তখন চলতি ছিল, তিনি তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে ? এ-কথা নিশ্চয় যে, সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা যে-যুগে বাংলা গদ্যটাকে সংস্কৃতে পরিণত করিবার উদ্ভ্রান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, সে-যুগে মুসলমানী শব্দের উপর একটা বিদ্বেষ খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই ছোঁয়াচে রোগের জন্য রাম বসুর লেখা ততটা আদর সে-সময় পায় নাই।"

'লিপিমালা'য় ফার্সী-মিশ্রণের নিদর্শন অল্প। ইহা নানা বিষয়ে লিখিত লিপির সংগ্রহ। ইহাতে ব্যবসায়, ধর্ম, ইতিহাস, গল্প ইত্যাদি স্থান পাইয়াছে। বুকানন (Buchanan) ইহাকে 'An original composition in Bengali prose in the epistolary form' বলিয়াছেন।

চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণ রায়ের চরিত্র' একই সময়ে (১৮০৫) প্রকাশিত হইলেও, ভাষা, গঠন-পারিপাট্য ও অন্যান্য ব্যাপারে তাহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন। 'তোতা ইতিহাস' 'তোতানামা' নামক ফার্সী-গল্প-গ্রন্থের অনুবাদ। তাহা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি উভয় দিক দিয়া 'তোতা ইতিহাস' 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র' হইতে শ্রেষ্ঠতর। পরবর্তী পুস্তকখানাতে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলেও তাহাতে গল্প-কাহিনীর মাত্রা অত্যধিক।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, তিনি ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুরে (তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন এবং নটোরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শারীরিক ও মানসিক গুণে তাঁহাকে ডাক্তার জনসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বহুদিন পর্যন্ত তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য স্বয়ং কেরির মুন্সী ছিলেন। কেরি তাঁহার নিকট হইতে যে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং এদিকে তাঁহার জুড়ি ছিল না বলিলেই চলে।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন,' 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবল,' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকার' নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইখানা অনুবাদ, পরবর্তী দুইখানা মৌলিক রচনা। 'বত্রিশ সিংহাসন' একখানা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তক। কাহারো কাহারো মতে ইহা কালিদাসের রচনা। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বত্রিশটি মূর্তির মুখ-নিঃসৃত গল্প এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'বত্রিশ সিংহাসনের' ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব যথেষ্ট। রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও কেরির 'কথোপকথনে'র ভাষার সঙ্গে ইহার মিল নাই। ইহার ভাষাকে Classical ভাষা বলা যাইতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ'ও উক্ত নামীয় বিখ্যাত সংস্কৃত গল্প-পুস্তকের অনুবাদ। ইহার অনুবাদ-কার্যই সুষ্ঠু হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন হিসাবে 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র মূল্য অধিক। 'রাজাবলী'র অর্থ রাজাদের ইতিহাস–কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজাদের ইতিহাস ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হইলেও ইহাতে ইতিহাসের চাইতে গল্পের ভাগই বেশী।

'প্রবোধচন্দ্রিকা' একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক। অনেকের মতে ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। নবাগত সিবিলিয়ানদের জন্য রচিত বলিয়া বইটিতে গ্রন্থকার ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন অনেক-কিছু ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনোপ্রকার শিল্প-সৌন্দর্য না থাকায় ইহা পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সংস্কৃতবহুল বলিয়া ইহার ভাষা কটমটে ও দুর্বোধ্য। ভাষা যে ক্রমাগত সংস্কৃতানুগামী হইতেছিল, এই পুস্তক তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় তিনটি রীতি দৃষ্ট হয়–সাধু বা সাহিত্যিক রীতি, সংস্কৃত রীতি ও মৌখিক রীতি। মার্শম্যান ইহার মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন : ইতর শ্রেণীর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে সরসতার সঞ্চার করিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করিতেন।

বাংলা-গদ্য-সাহিত্যে রামমোহনের স্থান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরেই। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'বেদান্ত গ্রন্থ' ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সাহিত্যিক রচনা বিশেষ না থাকিলেও এ কথা বলা চলে যে, তাঁহার হাতে বাংলা-গদ্য কিছু পরিমাণ শক্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রচনা কিছু দুর্বোধ্য ও কঠিন; তবু তাহার ভাষা সেকালের শিক্ষিতজনের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ সংক্ষিপ্ততা। এই সংক্ষিপ্ততাপ্রীতির জন্যই তাঁহার রচনা জটিল হইয়া উঠিত। কাজী আবদুল ওদুদের মতে : "তাঁর (রামমোহনের) ভাষাসঙ্কেতের ভিতরে প্রবেশ করলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট তো বটেই, চিন্তার ঋজুতা সূক্ষ্মতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ও মার্জিতত্বের জন্য স্থানে স্থানে উপভোগ্যও। ...প্রচলিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাংলা-গদ্যের পাশে সংযতবাক, সারবান, ক্ষিপ্রগতি, কিন্তু অদ্ভুত রামমোহনী গদ্য মস্তিষ্কবান সাহিত্যিকদের আদরের সামগ্রী।... রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে রামমোহনের গদ্যের কিছু কিছু মিল আছে মনে হয়েছে। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যঙ্গের সেই তীক্ষ্ণতায় ও মার্জিতত্বে হয়তো রামমোহন রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী।"

রামমোহন এক-একটি বাক্যের পর ছেদচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। এইটি তাঁহার কৃতিত্ব বলা চলে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শব্দের শেষ হরফের সঙ্গে 'ই' এবং 'ও'-অব্যয়ের প্রয়োগ ভাষার জোর ও অর্থপূর্ণতা বাড়াইয়া দিয়াছে।

হরপ্রসাদের 'পুরুষপরীক্ষা' ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে ইহাতে ৫২টি গল্প অনূদিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ ও শিক্ষাদান। পুস্তকখানা মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ-সিংহাসন ও প্রবোধচন্দ্রিকা'র সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কারণ ইহা 'বত্রিশ-সিংহাসনে'র মতো গল্পকাহিনীতে ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র মতো জ্ঞান সম্ভাবে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার মতো সংস্কৃতপ্রধান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

পরবর্তী য়ুরোপীয় লেখকগণের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডা. জশোয়া মার্শম্যানের পুত্র জন কেলার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেলিক্স্ কেরির নাম উল্লেখযোগ্য। কেলার্কের রচনার মধ্যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' 'বাংলার ইতিহাস', 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়,' 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এক সময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ফেলিক্স্ কেরি সংস্কৃত, পালি, বাংলা ও বর্মা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত কতিপয় পুস্তকের নাম করা যাইতেছে : 'বৃটেন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়', 'যাত্রিদের অগ্রসর বিবরণ' ও 'বিদ্যাহারাবলী'। প্রথম পুস্তকখানা গোল্ডস্মিথ-রচিত ইতিহাস-গ্রন্থের অনুবাদ, দ্বিতীয়টি বিখ্যাত Pilgrims' Progress-এর তর্জমা। 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রথম গ্রন্থ 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা', য়ুরোপীয় প্রথায় রচিত বাংলা ভাষার আদি বিজ্ঞান-পুস্তক। ফেলিক্স্ কেরি একখানা বাংলা বিশ্বকোষ রচনা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা

স্বকীয়তাবর্জিত; ভাষায় সাহেবী বাংলার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

জন মেকের 'কিমিয়াবিদ্যার সার' এ-যুগের আরেকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহাতে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কেলার্ক ও ফেলিক্সের ভাষা হইতে মেকের ভাষা প্রাঞ্জল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় লেখকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত-শব্দপ্রীতি। ইহার কারণ রহিয়াছে। ভারতচন্দ্রের পরে তাঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন এমন কোনো লোক না থাকায় বিদেশীয়গণ সংস্কৃত পণ্ডিতগণকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিশারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিত ঘৃণাবশতঃ বাংলা ভাষার চর্চা হইতে বিরত থাকিতেন এবং সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার জ্ঞান রাখিতেন না। তাই ইহাদের সহায়তায় বাংলা-গদ্য দিন দিন সংস্কৃতের রূপ পাইতে লাগিল এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বাভাবিকতা ও সরলতা-বর্জিত হইয়া কৃত্রিম ও রুক্ষ আকার ধারণ করিল।

কিন্তু ইহাদের পক্ষে এই বলিবার আছে যে, ইহারা শুদ্ধ ভাষায় রচনা লিখিতে পারিতেন। Idiom বা ভাষাদস্তুরের অভাব থাকিলেও ইহাদের রচনায় ব্যাকরণঘটিত ত্রুটি কম। ইহাদের ভাষাকে পণ্ডিতী বাংলা বলা হইয়া থাকে। মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি লেখকদের রচনায় পণ্ডিতী বাংলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ইহার বহুকাল পূর্বে আধা-ফার্সী ও আধা বাংলা মিশ্রিত একপ্রকার সঙ্কর ভাষার প্রচলন ছিল। এই ভাষার নাম আদালতী ভাষা। কায়স্থদের দ্বারা লিখিত হইত বলিয়া ইহাকে কায়স্থী ভাষাও বলা হইত। রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাসে' এই ধরনের ভাষার দৃষ্টান্ত মিলে। হ্যালহেড্ সাহেব এই ধরনের ভাষাকে 'Compound idiom' আখ্যা দিয়াছেন।

শিক্ষিতদের সৃষ্ট এই অস্বাভাবিক ভাষাদ্বয় ব্যতীত গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচালিত আরেকটি সজীব ভাষা ছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে চলতি ভাষা। কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালিকারগণ এই ভাষা ব্যবহার করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের রচনায় এই ভাষার শেষরশ্মিপাত দৃষ্ট হয়।

মুসলমানদের অধীনে আসিয়া যেমন বাংলা ভাষা আরবী-ফার্সী শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, য়ুরোপের অধীনে আসিয়াও তেমনি তথাকার নানা ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল; তাই প্রচলিত ভাষায় বহু পর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দের উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারা, জানালা, ফিতা, গির্জা, জোলাপ, আলমারি, বালতি, গামলা, প্রেক, মাইরি, চাবি, বরগা ইত্যাদি পর্তুগীজ শব্দের দৃষ্টান্ত। ইংরেজগণ বেশীদিন রাজত্ব করিবার সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া পর্তুগীজ ভাষার চাইতে ইংরেজী ভাষার প্রভাবও বেশী পড়িয়াছে। ইংরেজ-প্রভাবান্বিত বাংলা ভাষায় তথা সাহেব বা খ্রিষ্টানি বাংলায় চলিত ভাষা ও সংস্কৃতপ্রধান বাংলার অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়াছে। এই ইংরেজী-শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসগত নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহা যে সারল্য স্পষ্টতাগুণে গুণান্বিত, তাহা জোর করিয়া বলা যায়।

এই যুধ্যমান ভাষাচতুষ্টয়ের মধ্যে আদালতে ফার্সী ভাষার প্রাধান্য লোপ পাওয়ায় ফার্সীপ্রধান বাংলা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। চলতি ভাষা কবিওয়ালা, পাঁচালিকার প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া কখনো অগ্রগণ্য হইতে পারে নাই। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পণ্ডিতী ভাষা ও সাহেবী ভাষা, এই দুই ভাষার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। একদিকে সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল অস্বাভাবিক ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছিলেন, অন্যদিকে ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণগণ সাহেবী বাংলার অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত হালকা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছিলেন।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজীয় রীতি পণ্ডিতী রীতির ও আলালী রীতি সাহেবী

রীতির উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন না হওয়া পর্যন্ত এই দুই রীতির মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার স্পর্শে সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য ও আলালী ভাষার সজীবতা, এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে এক তৃতীয় রীতি সৃষ্টি করেন। এই রীতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

এইখানে আসিয়াই যে বাংলা-গদ্যের পরিবর্তন ও প্রগতি থামিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন লেখকের হাতে তাহা বিভিন্ন রূপ লাভ করিতেছে। জীবন্ত ভাষার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। ভাষার এই নমনীয়তাকে অনেকে দুর্বলতা মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে; নমনীয়তাই ভাষার শক্তি। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বাংলা-গদ্যের প্রগতি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

মৃত্যুঞ্জয় হইতে বিদ্যাসাগর* পর্যন্ত 'বঙ্গ'-ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুসারীগণ 'বাঙ্গালা' ভাষায় আর রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী হইতে শুরু করিয়া আধুনিকগণ 'বাংলা' ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপর যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কোনো প্রভাব নাই, তাহা নহে। খুবই আছে। তবে তাঁহার রুচির প্রবণতা 'বাংলা' ভাষারই দিকে।

জীবন্ত ভাষা বলিয়া আধুনিকদের হাতেও এই ভাষা পরিবর্তিত হইতেছে। আধুনিকদের ভাষায় নানা দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষিপ্রতা, তীক্ষ্ণতা ও দীপ্তিতে তাহা যে পূর্ববর্তী ভাষাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই যে, ক্রমবিকাশ, ইহা শুধু প্রতিভার গুণে নয়, ভাষার গুণেও। ভাষার নিজস্ব সামর্থ্য না থাকিলে শুধু প্রতিভা তাহাকে বর্ধিত করিতে পারে না। প্রতিভা দীপ-শলাকা ও ভাষার লুক্কায়িত আগ্নেয় শক্তি, এই দুইয়ের সংযোগ।

বাংলা ভাষা দিন দিন তাহার স্বভাবের দিকে ঝুঁকিতেছে—সংস্কৃতের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে চলা-ফিরা করিয়া স্বাস্থ্য-সমন্বিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাকে শুভ লক্ষণ না বলিয়া উপায় নাই। ভাষাতত্ত্বের সাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন লোকও জানেন, সংস্কৃত হইতেছে inflexional বা প্রত্যয়ী ভাষা, আর বাংলা analytical বা বিশ্লেষণ-মূলক। প্রত্যয়ী ভাষাগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়াই যে বিশ্লেষণ-মূলক ভাষাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্বীকার্য। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। সংস্কৃত ও বাংলা উভয়ের প্রকৃতির দিকে তাকাইলে দেখা যায়, একের মেজাজ অভিজাত, অপরের প্রাকৃত। বাংলা-ভাষা প্রাকৃতের অভিমুখেই চলিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে অবশ্য প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। কেহ কেহ কবিত্বময় গম্ভীর গদ্য লিখিয়া এক প্রকার অভিজাত ভাষা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে এই বলা চলে যে, অভিজাতের মতো শোভন ও গম্ভীর হইলেও অভিজাতের মতোই তাহা রক্তহীন।

[এই প্রবন্ধ রচনায় ডা. সুশীল কুমার দে'র Bengali Literature in the 19th century', ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে।]

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি লেখকের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইল তাহা তাঁহার রচনার সংস্কৃত শব্দ বাহুল্যহেতু। নতুবা অন্যদিক দেখিতে গেলে বিশেষ করিয়া বাক্যগঠনরীতি বিচার করিলে তাঁহাদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত করা অনুচিত। মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি লেখক শুধু সংস্কৃত শব্দ নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতবাক্য-গঠনরীতিও গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু বাংলা-রীতিরই অনুসরণ করিতেন। বাংলা গদ্যের ছন্দ তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহার রচনায় যে কমা ও সেমিকোলনের আধিক্য দৃষ্ট হয় তাহা অর্থগ্রহণের সুবিধার্থে তো বটেই, ছন্দরক্ষার্থেও। পড়িবার সময়ে কমা, সেমিকোলন ঠিক রাখিয়া পড়িলে তাঁহার রচনায় অপূর্ব ছন্দ মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়।

বর্ষা-পঞ্জী

'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।' 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।' যখন বৃষ্টির মৌতাত জমে উঠেছে, যখন অবসর ও বিশ্রম্ভালাপের দাবী জানিয়ে প্রকৃতি মানুষকে একই সঙ্গে অন্তরমুখীন ও প্রকৃতিমুখীন হতে ইঙ্গিত করছে, যখন এই অতিপরিচিতা পৃথিবী অপরিচিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মনে নেশা ধরাবার প্রয়াস পাচ্ছে, তখন সেই বর্ষণমুখর দিনে বৃষ্টি মাথায় করে খুলল আমাদের কলেজ–তথা চট্টগ্রামের সংস্কৃতি কেন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "সেকালে মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল।" কিন্তু এ কালে সে নিয়ম অচল। অবসরভোগী মন আর আমাদের পছন্দ নয়, আমরা আলসেমির প্রশ্রয় দিতে নারাজ। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্ধং কৃষিকর্মনি', এই উচ্চারিত নীতির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অনুচ্চারিত নীতিও বোধ হয় সেকালের মানুষের মনে ছিল, আর সেটি হচ্ছে, 'আলস্যে বসতি সরস্বতী।' কিন্তু এ কালের নীতি হলো 'কর্মনি বসতি প্রগতি।' কর্ম না করলে প্রগতি হবে না, উন্নতি হবে না। অতএব কাজ করো, অনবরত কাজ করে যাও।

এ যুগের প্রধান গসপেল হচ্ছে, 'গসপেল অব ডিউটি।' যুগের গসপেলটিকে মান্য করে চলতে হবে–দরকার হলে আত্মবিসর্জন দিয়েও। নইলে এ যুগে টেকা দায়। হামেশাই তো দেখতে পাওয়া যায় যারা আত্মা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়, শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মবিসর্জন দিতে হয়। অর্থাৎ যারা সব সময় সোল সোল করে তাদের 'সোল গোল' হয়ে দাঁড়ায় না খেয়ে অকালে অক্কা লাভ। তাই এ যুগের মানুষ সর্বদাই আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এই কর্মব্যস্ততার যুগে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা ঠেলাঠেলির দিনে আত্মা এবং তার আহার অনুভূতি কল্পনার চিন্তা না করলেও চলবে, কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার চেষ্টা না করলে তো চলবে না। অতএব 'কাজ করো' এবং জগতের সমস্যা সমাধানে রত হও। বসন্তের মিনতি, বর্ষার নিষেধ কিছুই কানে নিও না। দখিন হাওয়াকে অবজ্ঞা করতে না পারলে, বৃষ্টির নিষেধকে ড্যামকেয়ার করতে না শিখলে, মস্তিষ্কবান হয়ে জন্মগ্রহণ করলে কেন, মস্তিষ্কবিহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই তো পারতো। স্রষ্টা মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন প্রকৃতিকে ডিঙাবার জন্য, তাকে সমীহ করে চলার জন্য নয়। অতএব বৃষ্টির দিনেও কাজ করতে হবে, সৃষ্টির শোভা দেখবার জন্য কলেজ ও অফিস বন্ধ রাখলে চলবে না।

কিন্তু আমরা যেমন একগুঁয়ে, বৃষ্টিও তেমনি নাছোড়বান্দা। সে বলে, শোন, বলছি, ঘর ছেড়ে বাইরে যেও না। কি করে একলা ঘরে চুপ করে বসে থাকতে হয় তার ট্রেনিং নাও, নিজের মনের সঙ্গে বাণী বিনিময় করার কায়দা শেখো। কেননা তাই সংস্কৃতি, তাই সভ্যতা। মেঘের পানে চাও, বৃষ্টিধোয়া শ্যামল দূর্বাদলের শোভা উপলব্ধি করো, পাহাড় থেকে ধেয়ে-নেমে-আসা নৃত্যময়ী জলধারার কলধ্বনিতে কান পাতো। আর যদি সম্ভব হয় বর্ষার কবিতা পড়ো, বর্ষার গান গাও, অথবা শোনো। তোমার মনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা দূর হ'য়ে যাবে। –বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুশীলনজাত মানসিক বিকৃতি থেকে তুমি মুক্তি পাবে।

ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে চেষ্টা করলেই তুমি ক্রিয়েটিভ হবে, তোমার অনুভূতি-কল্পনা সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পাবে বলে। প্রথম প্রথম হয়তো চুপচাপ বসে থাকতে তোমার খারাপ লাগবে, মনে হবে সময়টা একেবারে বরবাদ হল; মন ছট্‌ফট্ করবে, বাইরে যেতে না পেরে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হবে। কারণ, তাই অভ্যাস কি-না।

কিন্তু আমার দৌলতে যখন ঘরে বসে থাক্‌তে বাধ্য হবে যখন বাইরে যাবার কোনো উপায়ই থাক্‌বে না, তখন ঘরে বসেই একটা না একটা কিছু করতে চাইবে। হয়তো একটা কবিতার বই-এর পাতা উল্‌টাবে, এবং তা করতে গিয়ে কোনো কালো চোখে মেঘের নীল ছায়া পড়ার খবর পেয়ে চমকে উঠবে। তখন তুমি তোমার পার্শ্ববর্তিনীর পানে নতুন চোখে তাকাবে, এবং পুরাতন চেনা মানুষটির মধ্যেও অচেনা নতুনের আবির্ভাব দেখে খুশী হবে। আর যদি তোমার সঙ্গিনীটি তোমার পাশে না থাকে তো সে যেখানে আছে সেখানে তোমার কল্পনার মেঘকে দূত করে পাঠাবে। এমনি করে কি করে যে মনের খেলা দেখতে হয় তা শিখবে, আর এই মনের খেলারইতো অপর নাম ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতা।

আমি বর্ষাকাল মনের খেলা শেখাবার জন্যই আসি। ব্যক্তির ভেতরে যে রসের পাত্রটি রয়েছে, সেটির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। আমি ব্যক্তিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নই। তাই বর্ষাকালে, বিশেষ করে নিরন্তন-ধারাবর্ষী শ্রাবণ মাসেও যারা সমাজতান্ত্রিক প্রেরণার পিছু ধাওয়া করে তারা আমার জানের দুশমন। তাদের চেষ্টা পণ্ড করে দেওয়াই আমার কাজ। তার প্রমাণ তো তোমার নিজের জীবনেই রয়েছে। সেদিন কোনো একটা সভাতে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুমি যেতে পেরেছিলে কি? যাত্রাতেই তোমাকে এমন ভাবে ভিজিয়ে দিলাম যে ফিরে আসতে বাধ্য হলে। আর সেদিন বরযাত্রী হয়ে কি ভোগাটাই না ভুগলে। যাবার সময় ভালোয় ভালোয় গেলে বটে, কিন্তু ফেরার পথে ভিজে একেবারে তরবতর। তোমার তো মোটে দুটো প্যান্ট; একটা থাকে ধোপার বাড়িতে, আরেকটা পরনে। না? তাই পরের দিন কি পরে কলেজে যাবে তা নিয়ে তোমাকে বেশ ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। মানুষকে এমনি বিপদে ফেলি আমি ইচ্ছে করেই। কারণ আমি জানি, তা হলেই সে বাধ্য হয়ে কুঁড়েমি করতে শিখবে, এবং কুঁড়েমি করতে করতে একদিন না একদিন হয়তো সরস্বতীর দেখা পেয়ে যাবে। জানোই তো কুঁড়েমি করা মানে কল্পনা ও অনুভূতির অনুশীলন করা, আর তা করলেই সরস্বতীর দেখা পাওয়া যায়–মানুষের মন থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জল-স্থল-আকাশের সর্ব্বত্র ধরা দেন–সৌন্দর্য রূপে, আনন্দ রূপে।

দেখো, আমি বর্ষাকাল 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মন্ত্রের উপাসক। অন্য ঋতুতে তোমার 'আর্ট ফর বেলিস্ সেক্' অথবা 'আর্ট ফর পিপলস্ মুভমেন্টস্ সেক্' মন্ত্রের উপাসনা করো, আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমার রাজত্বে তা মানায় না। এখন বিশ্রম্ভালাপের দিন, আষাঢ়ে গল্পের দিন, মনের গুহায় যে বিরহটি লুকিয়ে আছে তার সঙ্গে মোলাকাতের দিন। সে এত দিন মুক্তির দাবী জানিয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তোমরা তা শুনতে পাও নি। আজ আমি পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তার দাবী, শোনো, লাভ হবে। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়, প্রাণয়িনী দূরে থাকলে তো কথাই নেই, কাছে থাকলেও। এটা বিশ্বহিত অনুশীলনের কাল নয়, বিরহের উপলব্ধিজাত রস উপভোগের কাল। তাকে ব্যর্থ হতে দিও না।

আমি যে আমাকে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মন্ত্রর ভক্ত বলেছি, তাতে তুমি এ কালের সমাজতান্ত্রিক মানুষ আমার উপর নিশ্চয়ই খাপ্পা হয়ে উঠেছ। কিন্তু কি করি, সত্য কথা না বলে তো উপায় নেই। আমার উদ্দেশ্য মানুষকে সমস্যার জগৎ থেকে কল্পনার জগতে, অনুভূতির জগতে নিয়ে আসা। তাই আমি কালিদাসকে দিয়ে মেঘদূত কাব্য লিখিয়েছি। আর মেঘদূত যে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেকে'র চূড়ান্ত তোমাদের রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা স্বীকার

করেছেন। এই কাব্যটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন শোন: সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তা ধর্ম্মের কথা নহে, কর্ম্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থায় প্রলাপ। ..... ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই।.....ইহা একটি মায়াতরী।

শুন্‌লে তো মেঘদূত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন তার মোদ্দা কথা হলো কালীদাস মেঘদূত কাব্যে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মন্ত্রের উপাসক। আমিও তাই। কেননা, আমিই তো তাকে দিয়ে ও কাব্য রচনা করিয়েছি। ওতো আমার হুকুম তামিল করেছে মাত্র। আমি চাই মানুষ কর্মভোলা, উদ্দেশ্যভোলা হয়ে জীবনযাপন করতে শিখুক–প্রগতির বাণীর চেয়ে সভ্যতার বাণীকে, তথা কল্যাণের বাণীর চেয়ে সৌন্দর্য্যের বাণীকে বড় জানুক। কেননা, তাতেই মানুষের মন সুন্দর হয়, মানুষ সভ্য হয়। অপর পাঁচটি ঋতুতেই মানুষ কাজ করে, কাজের কথা ভাবে, সমস্যার সমাধান করতে চায়। তাই এমন একটি ঋতুর দরকার যেখানে কাজ কম, কাজের ভাবনা কম, সমস্যাসমাধানের প্রয়াস কম–যেটা বস্তুভারহীন আষাঢ়ে গল্পের ঋতু। রবীন্দ্রনাথ যে আমাকে 'নিষ্প্রয়োজনের ঋতু' বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। তুমি সমস্যাসঙ্কুল যুগের মানুষ; ও কথাটায় সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না; 'নিষ্প্রয়োজন' কথাটা শুনলেই আঁতকে উঠবে। বলবে; একি, যখন খেতে-পরতে না পেয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে, যখন শুধু বেঁচে থাকাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন নিষ্প্রয়োজনের কথা। কিন্তু একটা কথা তোমার কানে কানে বলি : সমস্যাবিরল যুগে যে জিনিসটা মানুষের মন ভরিয়ে তোলে সমস্যাসঙ্কুল যুগেও সে-জিনিসটা মাঝে মাঝে মনের সামনে তুলে ধরা ভালো নয় কি? নইলে বিকৃতি যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। স্বাস্থ্যের আনন্দের প্রতি যার অহেতুক টান নেই, রোগমুক্তি নয়, রোগপ্রীতিই হয় তার ললাটলিপি। চিরদিন নিজেকে ভাবতে সে ভালোবাসবে। তেমনি সমস্যার মেঘহীন স্বচ্ছ জীবনাকাশের ধ্যান যার নেই, সমস্যার মেঘে মেঘে জীবনকে পূর্ণ করে তোলা হবে তার কাজ; সূর্য্যের অকারণ উচ্ছ্বাসকে সে ফাজিল মনে করবে, যেমন ফাজিল মনে করে অফুরান স্বাস্থ্যের প্রতীক অকারণ-চঞ্চল কিশোরকে রোগী, অথবা তারি মতো জীবনবোধহীন ও নিষ্প্রাণ নীতিবিদ। সমস্যার চেয়ে জীবনকে, জীবনের অকারণ উল্লাসকে বড় না জানলে সমস্যা থেকে কখনো মুক্তি পাওয়া যায় না। একটার পর একটা সমস্যা এসে জীবনকে বিব্রত করে তোলে। তাই সমস্যাচেতনতা যাতে একটা 'ম্যানিয়া' না হয়ে দাঁড়ায় সে-দিকে নজর রাখা দরকার। আর তার উপায় হচ্ছে সমস্যাসম্বন্ধে মাঝে মাঝে বেখেয়াল হওয়া।

বর্ষাঋতু ছুটির ঋতু। বাস্তবে তা সত্য না হলেও, মনের দিকে তাকালে তা সত্য। বর্ষাকালে মনের মধ্যে মন-কেমনের হাওয়া বয়। তখন হাজার চেষ্টা করেও তুমি তোমার মনকে বশে রাখতে পারো না। তাই মাঝে মাঝে কাজে ভুল হয়, এবং সেজন্য তুমি নিজের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠো, ভাবো মনের কি একটা রোগ হয়েছে, মনো-বিশ্লেষকের সহায়তা ছাড়া যার থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। বর্ষাকালে তোমার অবস্থাটাই স্বাভাবিক অবস্থা, তার উল্টোটাই বরং অস্বাভাবিক। তুমি যে বেঁচে আছ এবং ভালো আছ। তোমার যে অনুভূতি কল্পনা লোপ পায় নি, তোমার কাজের ভুলই তার প্রমাণ। বর্ষাকালে যার কাজের ভুল হয় না, যে আনমনা হয় না তারি বরং মনোসমীক্ষকের বাড়ি ছোটা উচিত। তোমার নয়। আরেকটা কথা বলছি মনে রেখো : বর্ষাকালে যে আনমনা হয় না তার সম্বন্ধে সাবধান। অনুভূতির ও কল্পনার ধার ধারে না বলে তার দ্বারা যে কোনো নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে।

জুলাই মাসে বর্ষানিকেতন চট্টগ্রামে সামাজিক কর্মতৎপরতার অভাব কেন, বর্ষাসুন্দরীর সঙ্গে সংলাপের ফলে তা সহৃদয়ঙ্গম হ'ল। বুঝতে পারা গেল চাটগাঁর লোকেরা বৃষ্টির বারণ মেনে নিয়েছিল, গোঁয়ারের মতো তাকে উপক্ষো করে চলতে চায় নি। তাতে করে সংস্কৃতি-বোধেরই পরিচয় দেওয়া আছে। কেননা, বর্ষার আহ্বান সংস্কৃতির আহ্বান–কল্পনা ও অনুভূতির আহ্বান, রসবোধের আহ্বান, সামাজিক কর্মতৎপরতার আহ্বান নয়। তবে সামাজিক অনুষ্ঠান যে একেবারেই হয় নি তাও নয়। কয়েকটি পার্টি ও কয়েকটি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। তা ছাড়া যে-সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, তাদেরও তো সামাজিক কর্মতৎপরতা বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, সামাজিক কাজটা সাংস্কৃতিক কাজ না হলেও, সাংস্কৃতিক কাজটা তো সামাজিক কাজ বটেই–তা সমাজ মনেরই উচ্চতর কামনার প্রকাশ বলে।

জুলাই মাসে চট্টগ্রামে কয়েকটি নাটকের অভিনয় ও গানের জলশা হয়। স্থানে স্থানে নজরুল জয়ন্তীও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজের অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের যে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি, সেদিনের অনুষ্ঠানটিতে তা টের পাওয়া যায়। এসব অনুষ্ঠান সংস্কৃতি-জগৎ চট্টগ্রামের প্রাগ্রসরতার প্রমাণ। কিন্তু সব চাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে রাস্তার পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা বর্ষাসঙ্গীতের সুর। পথ চলতে চলতে আপনি শুনতে পান : মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে তমাল ছায়ে-ছায়ে–তখন আপনার হৃদয়বনে একটি চঞ্চল হরিণীর পদপাতে আপনি চমকে উঠেন না কি? সূক্ষ্ম অনুভূতিমূলক গান সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হচ্ছে, এ কথা ভেবে আপনি খুশী না হয়ে পারেন না। তাই বলছি পথ চলতে চলতে যখন এই ধরনের বর্ষাসঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া যায়; অথবা শুনতে পাওয়া যায় কোনো ছেলে বা মেয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে : মেঘলা রাত আজ দাঁড় ফেলে যায় আঁধারে ঝুপ ঝুপ–তখন সংস্কৃতিক্ষেত্রে চট্টগ্রামের অগ্রগামিতা সম্বন্ধে সত্যই নিঃসন্দেহ হতে পারা যায়। সমাজসচেতন কবিতার পরিবর্তে অনুভূতি-গভীর কবিতার এই যে কদর, এতেই বর্ষার দাবীকে ভালো করে মানা হয়েছে, আর এই মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রুচিবোধ ও সংস্কৃতিবোধের পরিচয়। ঢাউস গানের জলসা অথবা মহতী সংস্কৃতি সভা থেকে নয়, এই ধরনের ছোটখাটো ব্যাপারের প্রাচুর্য থেকেই সাংস্কৃতিক তরক্কীর পরিমাণ নির্ধারণ সহজ হয়। কেননা সংস্কৃতি-প্রয়াস যে সার্থক হয়েছে এ সব তারই প্রমাণ।

চট্টগ্রামের বর্ষাকালীন সংস্কৃতিসংবাদ পরিবেশন করা হ'ল। কিন্তু সব চাইতে সেরা সংস্কৃতিসংবাদ হচ্ছে আমার সঙ্গে বর্ষাসুন্দরীর যে আলাপটি হ'ল সেটি। তাই সে সম্বন্ধে অধিক বলা হ'ল। এমনি আলাপ যে শুধু আমারি সঙ্গে হয়েছে তা নয়। আরো অনেকের সঙ্গে হয়তো হয়েছে। আমি শুধু প্রতিনিধিত্ব করলুম।

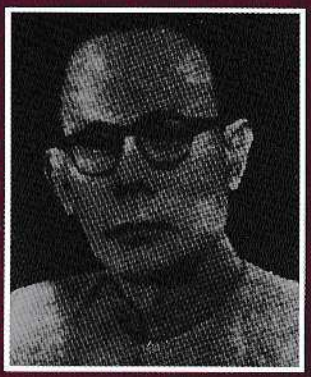

সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো আনুকূল্য না পেয়েও মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) জীবদ্দশায় পরিচিত মণ্ডলে এবং সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। যদি নূন্যতম আনুকূল্য পেতেন তা হলে জীবনকালেই তাঁর দু'চারটি বই প্রকাশিত হতো। মৃত্যুকালে তাঁর কোনো প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল না। সাহিত্যজীবনের নানা পর্যায়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরী একাধিক নামে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, যেমন– মোতাহের হোসেন বি.এ, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি.এ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী এম.এ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি। শেষ জীবনে শুধু মোতাহের হোসেন চৌধুরীই লিখতেন। চাকরি-বাকরিসংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে তিনি তাঁর পিতৃদত্ত নাম সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখতেন।

তাঁর পৈত্রিক বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে। পিতা সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী ছিলেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। খ্রিষ্টীয়-ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে এটি ছিল সম্মানজনক চাকরি। তাঁদের পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে শাহ সৈয়দ আহমদ তনুরী ওরফে শাহ মিরান নামে একজন সুফি সাধক ইরাক থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই উপমহাদেশে আসেন।

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

দশম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়